ফাঁসির সেল থেকে দেখা বাংলাদেশ

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

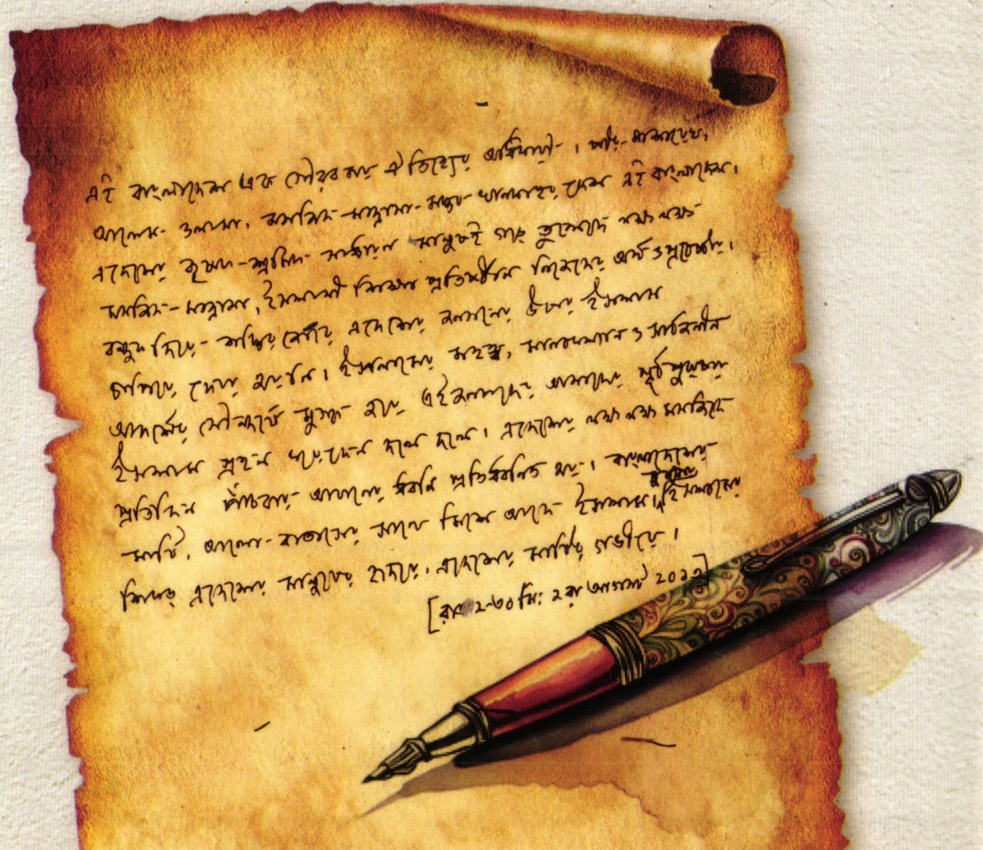

ফাঁসির সেল থেকে দেখা বাংলাদেশ

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

www.pathagar.org

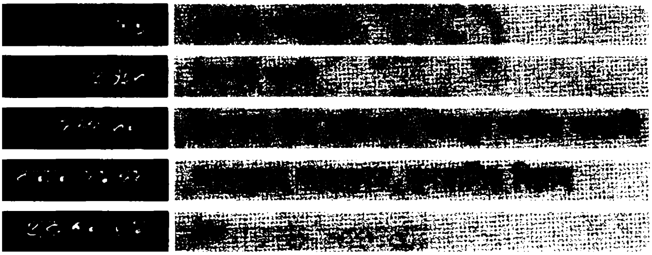

www.pathagar.org

ফাঁসির সেল থেকে দেখা বাংলাদেশ

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

প্রচ্ছদ
প্রকাশন

www.pathagar.org

ফাঁসির সেল থেকে দেখা বাংলাদেশ

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

প্রচ্ছদ প্রকাশন

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা)

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৩১৫-৩৭৩০২৫, ০১৭২৪-৫৩৮৫৯০

www.prossodprokashon.com

১ম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০২৪

২য় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০২৫

মূল্য : ৪৬০/- (চারশত ষাট টাকা)

FASHIR CELL THEKE DEKHA BANGLADESH
by Muhammad Qamaruzzaman
Published by Prossod Prokashon
ISBN: 978-984-99232-7-5

www.pathagar.org

কামারুজ্জামান শহীদ ও তাঁর বই 'ফাঁসির সেল থেকে দেখা বাংলাদেশ'

এক.

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান রাজনীতিবিদ, সংগঠক ও সাংবাদিক। প্রথমে তিনি জাতীয় রাজনীতির পাদপ্রদীপে আসেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে। পরে জামায়াতে ইসলামীতে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতা ও কূটনৈতিক যোগাযোগের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখেন। জামায়াতের জ্যেষ্ঠ সহকারী সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব পালনকালে শহীদ হন।

কামারুজ্জামানের জন্ম ১৯৫২ সালের ৪ জুলাই। শেরপুর সদরের বাজিতখিলা ইউনিয়নের মুদিপাড়া গ্রামে তার পৈত্রিক নিবাস। নিজ এলাকা শেরপুর থেকে সম্পন্ন করেন প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের পাঠ। ১৯৭২ সালে এইচএসসি পাশ করেন মোমেনশাহী নাসিরাবাদ কলেজ থেকে। ঢাকা আইডিয়াল কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। ১৯৭৬ সালে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে।

মাধ্যমিকে পড়াকালেই কামারুজ্জামান সক্রিয় হন ছাত্ররাজনীতিতে। ১৯৭৭ সালে ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠাকালে তিনি ঢাকা মহানগরী সভাপতি মনোনীত হন। একই বছরের শেষ দিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন শিবিরের সেক্রেটারি জেনারেলের। ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ সালে পরপর দুই সেশন শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। তার সভাপতিত্বকালে ছাত্রশিবির সারা দেশে ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করে। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে শিবিরের বিজয় এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও বড়ো কলেজগুলোতে শিবিরের বিস্তার লাভ তখন জাতীয় রাজনীতিতে হইচই ফেলে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে রাজনীতির পাদপ্রদীপে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন কামারুজ্জামান।

www.pathagar.org

শিবির থেকে বিদায় নেওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যে কামারুজ্জামান জামায়াতের প্রচার সম্পাদক মনোনীত হন। এ সময়ে তিনি পেশাগত অঙ্গনেও রাখেন দক্ষতার স্বাক্ষর। *ঢাকা ডাইজেস্ট*-এর নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে তিনি শুরু করেন পেশাগত জীবন। পরে *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*-র সম্পাদক নিযুক্ত হন। *দৈনিক সংগ্রাম*-এর নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্বও সুচারুরূপে পালন করেন। জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য, বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্য ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাচিত সদস্য হিসেবেও এ সময় ছিলেন সক্রিয়। আশির দশকের পুরো সময়টাতে তিনি একজন প্রতিশ্রুতিশীল সাংবাদিক ও সম্পাদক হিসেবে কর্মমুখর ছিলেন।

যোগদানের মাত্র এক যুগের ব্যবধানে ১৯৯২ সালে কামারুজ্জামান জামায়াতের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি পদে উন্নীত হন। জামায়াতের তখনকার রাজনৈতিক কাঠামোতে কামারুজ্জামানের এ পদপ্রাপ্তি বেশ দ্রুততর বলেই মনে হয়। কামারুজ্জামানের পেশাগত যোগ্যতা, বুদ্ধিবৃত্তিক ভূমিকা ও কূটনীতিক মহলে যোগাযোগদক্ষতা এক্ষেত্রে নিয়ামক হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির দায়িত্ব পালনকালে কামারুজ্জামানকে আমরা প্রধানত কূটনীতিক যোগাযোগ, রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে লিয়াজোঁ, বুদ্ধিবৃত্তিক নীতিনির্ধারণ প্রভৃতিতেই বেশি সরব দেখি।

কামারুজ্জামানের এ বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাশীল ভূমিকার একটি দুর্বলতর দিকও আছে। দেখা যায়, বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, সেখানে চিন্তাশীল ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব সাধারণত জননেতা হয়ে উঠতে পারেন না। আরও খোলাসা করে বললে, এ দেশের গণরাজনীতির যে চরিত্র বা সংস্কৃতি দাঁড়িয়েছে, সেখানে কোনো চিন্তাশীল ও বুদ্ধিবৃত্তিক মননসমৃদ্ধ মানুষ নিজেকে খুব একটা খাপ খাওয়াতে পারেন না। এ তিক্ত সত্যটি আমরা কামারুজ্জামানের গণরাজনীতির ময়দানের ভূমিকায় লক্ষ করি। তিনি জনদরদি নেতা ছিলেন এবং জনকল্যাণ ও সমাজকল্যাণমূলক ব্যাপক কাজ করেছেন বটে; কিন্তু ভোটের রাজনীতিতে বিজয়ী হতে পারেননি। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে, তিনি ক্রমেই এ দুর্বলতা কাটিয়ে গণরাজনীতির মাঠেও পোক্ত হয়ে উঠেছিলেন। ২০০১ সালের নির্বাচনে তিনি সমানে সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। আর ২০০৮ সালের নির্বাচনে তো তিনি বিজয়ীই ছিলেন, কিন্তু অপকৌশলে তার এ বিজয় ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তিনি এ নির্বাচনে ১,১০,০৭০

www.pathagar.org

ভোট পান। এ বিশালসংখ্যক ভোটপ্রাপ্তিকে কিন্তু জনগণের নিরেট ভালোবাসা ও আস্থার ভোটই বলতে হবে। কেননা, ভোটের রাজনীতিতে পেশিশক্তির ব্যবহার বা বিত্তের ব্যবহারের যে অপসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, এর কোনোটাই তিনি করতে পারেননি।

দুই.

কামারুজ্জামান ছাত্রজীবন থেকেই লিখেছেন। তবে সংখ্যার দিক দিয়ে তার রচনা বা বইয়ের সংখ্যা খুব বেশি বলা যাবে না; অবশ্য খুব কমও নয়। তার রচনায় আমরা লক্ষ করি, তিনি ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের প্রতি প্রতিভা বিকাশ ও দক্ষতা বৃদ্ধির আবেদন করেছেন। সদ্‌গুণাবলির অনুশীলন ও মেধার স্ফুরণের আকুতি জানিয়েছেন। আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যোগ্য হয়ে ওঠার প্রস্তাব করেছেন। *আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম*, *আধুনিক যুগে ইসলামী বিপ্লব*, *ইসলামী নেতৃত্ব* বইগুলোতে আমরা এ আকুতি ও আকাঙ্ক্ষার ছাপ দেখতে পাই।

কামারুজ্জামানের রচনা ও চিন্তাধারার আরেকটি দিক হচ্ছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সার্বক্ষণিক দৃষ্টিপাত। বৈশ্বিক পরিমণ্ডল সবসময় তার সামনে খোলা খাতার মতো থাকত। তিনি ইসলামী আন্দোলনকে কেবল একটি স্থানীয় জাগরণ হিসেবে না দেখে বৈশ্বিক জাগরণ হিসেবে দেখতেন। ফলে তার আলোচনায়, লেখায় বা দৃষ্টিভঙ্গিতে উম্মাহ চেতনা বা আন্তর্জাতিক মানস পরিস্ফুটিত হতো। তার রচিত *আধুনিক বিশ্বে ইসলাম*, *বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী এবং তুরস্ক*, *আধুনিক বিশ্বে ইসলামী জাগরণ ও মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারার প্রভাব* ইত্যাদি বই তারই প্রমাণ।

মৌলিক লেখালিখির পাশাপাশি মুহাম্মদ কামারুজ্জামান অনুবাদক হিসেবেও ছিলেন দক্ষ। খুররম মুরাদের বিখ্যাত বই *কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা* তার অনুবাদকর্মের সৃষ্টিশীল উদাহরণ। তার এই কর্মটি নিছক ভাষান্তর না হয়ে একটি নতুন সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। এ ছাড়াও *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*-র সম্পাদকীয় এবং বিশ্লেষণাত্মক লেখাগুলো একজন প্রাজ্ঞ সম্পাদক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মর্যাদাও তার জন্য অপরিহার্য করে তোলে।

www.pathagar.org

তিন.

ফাঁসির সেল থেকে দেখা বাংলাদেশ কামারুজ্জামানের শেষ রচনা। কারাপ্রকোষ্ঠের নিঃসঙ্গ ও নিরানন্দ সময়গুলোতে তিনি এমন একটি দীর্ঘ লেখার প্রেরণা ও মানসিক স্থিরতা কীভাবে পেলেন, তা বিস্ময়করই বটে। লেখাটি শুরু হয়েছে পলাশির যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মাধ্যমে বাংলা অঞ্চলের পরাধীনতার সূচনাকালের বিবরণ দিয়ে। তারপর তিনি সংক্ষেপে ধারাবাহিকভাবে বিবরণী টেনেছেন ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলমানদের স্বাধিকার আন্দোলনগুলোর। এরপর ব্রিটিশ শাসনামলের শেষদিক থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত মোটামুটি কোথাও সংক্ষিপ্ত কোথাও বিস্তৃতভাবে জাতীয় রাজনীতির একটি স্কেচ এঁকেছেন।

বইটির সবচেয়ে প্রাণবন্ত অংশের বর্ণনা শুরু হয়েছে একাত্তর-পরবর্তী সময় থেকে। কেননা, এর আগপর্যন্ত যে বয়ান তিনি দিয়ে আসছিলেন, সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে নিছক একজন ইতিহাসপাঠকের পাঠের নির্যাস। কিন্তু একাত্তর-পরবর্তী সময় থেকে যে বর্ণনা শুরু হয়েছে, সেখানে লেখক কেবল একজন পাঠক বা গবেষক নন; বরং তিনি নিজেই সেই ইতিহাসের প্রত্যক্ষদর্শী এবং নিজেই একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারও বটে। একজন মেধাবী ছাত্রনেতা থেকে একজন প্রাজ্ঞ জাতীয় নেতার বিবরণীতে আমরা সত্তর, আশি, নব্বইয়ের দশক এবং এ শতাব্দীর শূন্য দশকের বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির বয়ান শুনতে পাই। এমন অনেক ঘটনার নেপথ্য বিষয়াদি এ অংশে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়, আমরা এতদিন নিছক যার বাইরের আবরণ সম্পর্কে জানতাম। উল্লিখিত চার দশকের জাতীয় রাজনীতি ও জামায়াতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির একটি সামগ্রিক ধারণা আমরা এখানে পেয়ে যাই, যা ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য দলিল ও প্রাইমারি সোর্স হওয়ার উপযুক্ত।

চার.

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বইটি লিখেছেন তার বড়ো ছেলে ওয়ামীর উদ্দেশ্যে লেখা চিঠির আদলে। 'প্রিয় ওয়ামী' বলে সম্বোধন করে তিনি লেখার প্রতিটি পর্ব শুরু করেছেন এবং শেষ করেছেন রচনার সময় ও তারিখ উল্লেখ করে।

www.pathagar.org

সম্ভবত কারাবিধির বাধ্যবাধকতার কারণে তিনি এভাবে চিঠিরূপে লিখেছেন। সংগত কারণেই সম্বোধনের এ অংশগুলো সম্পাদনাকালে বাদ দেওয়া হয়েছে, তবে কিছু কিছু পর্বে এ সম্বোধনটা বিভিন্ন কারণে প্রাসঙ্গিক ছিল, তাই কয়েকটি পর্বে সেই সম্বোধন অংশটা রেখে দেওয়া হয়েছে।

কামারুজ্জামান এ সম্বোধন অংশে বারবার আক্ষেপ করেছেন তার হাতের কাছে রেফারেন্স বইপত্র না থাকার। তিনি লিখেছেন, রেফারেন্স বইপত্র হাতের কাছে থাকলে তিনি বইটিকে একটি তথ্যসমৃদ্ধ বইয়ে রূপান্তর করতে পারতেন। তিনি পুরো বইটিই লিখেছেন স্মৃতির ওপর নির্ভর করে। তবে তার এ লেখাটি পড়ে যারপরনাই বিস্মিতই হতে হয়, তার স্মৃতিশক্তির প্রখরতা দেখে। তিনি ইতিহাসের সন-তারিখ, সংবিধানের বিভিন্ন ধারা-উপধারা, বিভিন্ন বইয়ের নানা অংশের মূলভাব ও লেখকের নাম এত চমৎকার ও নিখুঁতভাবে এনেছেন, যেন তার মানসপটে সেই ঘটনাবলি পুনরায় সবাক ও সচিত্র হয়ে উঠেছিল।

পাশাপাশি রেফারেন্সসমৃদ্ধ বই না হওয়ার কারণে আমাদের জন্য একধরনের উপকারও হয়েছে বটে, বইটি তথ্যের ভারে নীরস হয়ে ওঠেনি; বরং ঝরঝরে গদ্যের একটি অকৃত্রিম সুখপাঠ্য বই হয়ে উঠেছে। তথ্যসমৃদ্ধ বই হলে হয়তো এই সুখপাঠ্যতার বৈশিষ্ট্য থেকে বইটি বঞ্চিতই হতো। ফলে এটি একজন গবেষকের গবেষণাপ্রবন্ধ ধরনের রচনা হয়ে না উঠে একজন রাজনীতিবিদের আলাপি বয়ান হয়ে উঠেছে, যে আলাপ শীতের রোদে পিঠ লাগিয়ে ধূমায়িত চা পান করতে করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাগ্রহে শোনা যায়।

পাঁচ.

ফাঁসির সেল থেকে দেখা বাংলাদেশ রাজনীতিবিদ ও লেখক কামারুজ্জামানের আরও কিছু স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য ও চিন্তাধারা আমাদের সামনে স্পষ্ট করে তোলে। সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে, গুণের কদর ও দোষের সমালোচনার অকৃত্রিম হিম্মত ছিল তার। তিনি এ বইয়ে তার রাজনৈতিক ও আদর্শিক শত্রুদের সদ্‌গুণাবলিরও স্বীকৃতি দিয়েছেন আবার নিজের কিংবা নিজের দলের ভুল ও দুর্বলতাও অকপটে স্বীকার করেছেন। সামনের পথ নির্ধারণে অতীত পর্যালোচনায় জোর দিয়েছেন।

www.pathagar.org

আরেকটি দিক আমরা দেখতে পাই তার চরিত্রে। আর তা হলো, ইসলামী আন্দোলনের প্রতি সুদৃঢ় কমিটমেন্ট। সংগঠনের অভ্যন্তরে তার বেশ কিছু নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, বিষয়গুলো এভাবে হোক। কখনও তার মত গ্রহণীয় হয়েছে, আবার কখনও-বা অগ্রহণীয় হয়েছে। কিন্তু তার দ্বিমতের জায়গাগুলোতেও তিনি সামগ্রিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সবসময় তৎপর ছিলেন। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক একেবারে তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের প্রারম্ভিকায় প্রলুব্ধকর প্রস্তাব পেয়েও তিনি তা এড়িয়েছেন আদর্শিক দায়বদ্ধতা ও দরদের জায়গা থেকে।

ছয়.

ঠিক আত্মজীবনী না হলেও *ফাঁসির সেল থেকে দেখা বাংলাদেশ* আত্মজীবনীর যে রস, রূপ, গন্ধ; তার কিছু কিছু আমাদের পাইয়ে দেয়। আবার আত্মজীবনীর যে আত্মবয়ান কিংবা বারবার 'আমি' শব্দ উচ্চারণের শ্রুতিকটুতা, তা থেকেও বইটি অনেকাংশে মুক্ত। সবমিলিয়ে এটি একাধারে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির ইতিহাস পাঠ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থ ও আত্মজীবনীমূলক বইয়ের স্বাদ পাইয়ে দেবে পাঠককে।

বইটি শেষ করতে গিয়ে একধরনের আক্ষেপ পাঠকের মনে দানা বেঁধে উঠতে পারে যে, ২০০৮ সালের নির্বাচনের সাথে সাথে বইটি তার বয়ান বন্ধ করে ফেলেছে একেবারে হুট করে; সমাপ্তির কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই। এটা কেন হয়েছে, তা আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। কেননা, স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশিত ছিল, ২০০৮ সালের নির্বাচনের পরে যে সময়কালটা তিনি মুক্ত ছিলেন, সে সময়কার বর্ণনা, জামায়াত নেতৃবৃন্দ ও তার গ্রেফতারি এবং বিচারের নামে তাদের ওপর যে অবিচার করা হয়েছে, তার বিবরণ তিনি দেবেন। কিন্তু তা না দিয়ে হঠাৎ করেই লেখাটি শেষ হয়ে গেছে। আর প্রতিটি পর্বে তিনি লেখার তারিখ উল্লেখ করলেও শেষ পর্বটির শেষে তারিখ উল্লেখ নেই। আগের পর্বের তারিখ লেখা ১৫ এপ্রিল, ২০১৪। তাহলে কি শেষের অংশটি কারাগার থেকে মিসিং? নাকি তিনি এর পরে লেখার মতো সুযোগ পাননি? মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে করা তার আপিল আবেদন ২০১৪ সালের ৬ এপ্রিল খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। আপিল খারিজ হওয়ার কারণে তাঁর শাহাদাত

www.pathagar.org

অনেকটা সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। প্রায় নিশ্চিত শাহাদাতের সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ এক বছর তিনি প্রতিটি দিন ও রাত অনিশ্চয়তার মধ্যে ফাঁসির সেলে কাটান। তখন কি তিনি লেখার পরিবর্তে তার রবের সাক্ষাৎলাভের আকাঙ্ক্ষায় ইবাদতে অধিক মনোযোগী হয়েছিলেন?

এর সবই আমাদের অনুমান। এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিতভাবে কিছুই জানি না। শুধু এটাই জানি, এই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে টানা এক বছর অপেক্ষমাণ থাকার পর ফাঁসির দণ্ড কার্যকরের দিন বিকেলে তাকে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার অপশন দেওয়া হয়; জবাবে তিনি বলেন—"প্রাণের মালিক আল্লাহ। রাষ্ট্রপতি জীবন দেওয়ারও মালিক নন এবং নেওয়ারও মালিক নন যে, তার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইব।"

২০১৫ সালের ১১ এপ্রিল রাত সাড়ে দশটায় ফাঁসির মঞ্চে মুহাম্মদ কামারুজ্জামান শাহাদাতবরণ করেন। আর শাহাদাত তো এমন এক জীবনের সমাপ্তি, যা অগণন মানুষের প্রাণে প্রাণে সঞ্চার করে দেয় নতুন জীবন, নতুন হিম্মত, নতুন উদ্দীপনা। এ যেন জীবনের শেষ নয়; বরং অগণন জীবনের সূচনা।

মুহাম্মদ আবু সুফিয়ান
১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

www.pathagar.org

সূচিপত্র

ইসলামী আন্দোলন আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় ১৯
যুবসমাজের মধ্যে ইসলামী জাগরণ :
ইসলামী আন্দোলনের বড়ো অবদান ২০
ইসলামের শিক্ষা বাংলাদেশের মাটির গভীরে ২১
পলাশির প্রান্তরে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হলো ২২
১৯০ বছরের ব্রিটিশ দখলদারত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ২৩
১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের অন্তরালে ২৫
তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ২৬
বালাকোটের শহীদদের কথা ২৭
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ২৮
বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী পরিস্থিতি ২৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ৩১
১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব ৩১
দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতেই শেষ পর্যন্ত ভারত বিভাগ ৩২
এক হাজার মাইল ব্যবধানের দুই খণ্ড ভূমির রাষ্ট্র পাকিস্তান ৩৪
পাকিস্তান আন্দোলন ও ইসলামী রাষ্ট্রধারণা ৩৫
ভাষা আন্দোলন ৩৬
হিন্দু শাসনকালে বাংলা ভাষা নিষিদ্ধ করে ফরমান জারি করা হয় ৩৮
ব্রিটিশ শাসনকালেই শুরু হয় রাষ্ট্রভাষা বিতর্ক ৪০

www.pathagar.org

মুসলমান শাসকরাই বাংলার প্রথম পৃষ্ঠপোষক ৪১
বাংলা ভাষা বিকৃতির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে ৪২
বাঙালি ও বাংলাদেশি বিতর্ক ৪২
বাঙালি সংস্কৃতিচর্চার নামে যা হচ্ছে ৪৩
কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে কিছু কথা ৪৬
ছাত্র আন্দোলন : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ৫৩
মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ কৃষক সন্তানদের ভূমিকা ছিল প্রধান ৬৮
শেখ মুজিবের সতর্কতা ও ভারতের সৈন্য প্রত্যাহার ৭১
স্বাধীন দেশ পরিচালনায় আওয়ামী লীগের পরিকল্পনাহীনতা ৭৪
জাতীয় ঐক্যের কোনো চিন্তাই করা হলো না ৭৭
মুক্তিযুদ্ধে কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের অবদান এবং
বুদ্ধিজীবী হত্যা প্রসঙ্গ ৭৯
আদর্শিক বিভ্রান্তি ৮১
প্রশাসনিক ব্যর্থতা :
দলীয় লোকদের বেপরোয়া ও নিয়ন্ত্রণহীন লুটপাট ৮৪
দালাল আইন, সাধারণ ক্ষমা ও
১৯৫ যুদ্ধাপরাধীর বিচারে ১৯৭৩-এর আইন ৮৭
রক্ষীবাহিনী গঠন ছিল একটি ভুল পদক্ষেপ ৯২
১৯৭৩ সালের নির্বাচন : কারচুপি করার কি আদৌ প্রয়োজন ছিল ৯৩
সংবিধানের ২য় সংশোধনীর মাধ্যমে জরুরি আইন জারির বিধান ৯৩
প্রবাসী সরকার ও তাজউদ্দীন আহমদের প্রতি আচরণ ৯৫
ভারতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও লাহোরে ওআইসি সম্মেলনে যোগদান ৯৭
জুলফিকার আলী ভুট্টোর বাংলাদেশ সফর ৯৮
এত দ্রুততম সময়ে কেন ভারতবিরোধী সেন্টিমেন্ট সৃষ্টি হলো ৯৯
পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকট ১০২

www.pathagar.org

সংবাদপত্রের প্রতি আওয়ামী লীগের বৈরিতা ও অসহিষ্ণুতা ১০৪
সিরাজ শিকদার ও চল্লিশ হাজার রাজনৈতিক নেতাকর্মী হত্যা ১০৬
একদলীয় বাকশালী শাসন : শেখ মুজিবের সবচেয়ে বড়ো ভুল ১০৭
১৫ আগস্ট ট্র্যাজেডি ১১০
৭ নভেম্বরের গণ-অভ্যুত্থান ১১৫
১৫ আগস্ট ট্র্যাজেডির নেপথ্য কারণ ১১৮
শেখ মুজিবের পতনে ক্ষতি হয়েছে বাংলাদেশের ১২৭
মেজর জিয়া থেকে রাষ্ট্রপতি জিয়া ১২৯
রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনলেন জিয়া ১৩১
আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন পুরোনো দল পুনরুজ্জীবিত হলো ১৩৩
স্বনির্ভর ও আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার জিয়া ১৩৬
জিয়ার সমন্বয়ের রাজনীতি ও জাতীয় ঐক্য গড়ার প্রয়াস ১৪০
জিয়ার আবেদনে সাড়া দিতে পারলাম না ১৪১
দিল্লি থেকে ফিরলেন শেখ হাসিনা
আর সে মাসেই নিহত হলেন জিয়া ১৪৫
জিয়ার জানাযা ১৪৮
ক্ষমতাসীনরা যুগে যুগে
ইসলামী আন্দোলনের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে ১৫১
রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি আবদুস সাত্তারের ভূমিকা ১৫৮
দুজন রাষ্ট্রপতি মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের শিকার ১৬০
রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার ও কিছু ঘটনা ১৬৩
জেনারেল থেকে রাষ্ট্রপতি এরশাদ ১৬৬
জামায়াতের সমর্থন লাভের চেষ্টা এরশাদের ১৬৭
শাসনতান্ত্রিক বিতর্ক ও এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সূচনা ১৬৯
জামায়াতের পক্ষ থেকে ব্যাপক রাজনৈতিক যোগাযোগ ১৭০

www.pathagar.org

১৯৮৬ সালের নির্বাচন : দশ হুন্ডা, বিশ গুন্ডা, নির্বাচন ঠান্ডা ১৭৪
জামায়াতের দশ সংসদ সদস্যের পদত্যাগ ১৭৬
হাফেজ্জী হুজুরের রাজনীতিতে যোগদান ১৭৭
আব্বাস আলী খানকে অভিনন্দন জানিয়ে
বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর চিঠি ১৭৯
কেয়ারটেকার সরকারের ফরমুলা এবং এরশাদের পদত্যাগ........... ১৮২
১৯৯১ সালে বাংলাদেশের ইতিহাসে
প্রথম অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ১৮৫
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন :
অধ্যাপক গোলাম আযমের বাসভবনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী........... ১৮৬
জাতীয় সংসদে জামায়াতের মহিলা সংসদ সদস্য ১৮৭
বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা : প্রধানমন্ত্রীর ডিক্টেটরশিপ ১৮৮
অধ্যাপক গোলাম আযমকে জামায়াতের আমীর ঘোষণা :
নির্মূল কমিটি গঠিত ১৯১
অধ্যাপক গোলাম আযমের গ্রেফতার : এক অভূতপূর্ব দৃশ্য........... ১৯৩
নাগরিকত্ব প্রশ্নে হাইকোর্টে বিভক্ত রায় ১৯৬
হাইকোর্টের একক বেঞ্চে নাগরিকত্বের পক্ষে রায়
আপিল বিভাগে বহাল ১৯৭
বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে আয়োজিত সমাবেশে
অধ্যাপক গোলাম আযমের ঐতিহাসিক ভাষণ............................. ২০০
কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নতুন করে শুরু............ ২০৩
মাগুরা উপনির্বাচনের পর
আওয়ামী লীগ, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির যুগপৎ আন্দোলন........ ২০৭
জেনারেল নাসিমের ব্যর্থ অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা............................. ২১২
১৯৯৬ সালের নির্বাচন :
২১ বছর পর ক্ষমতায় ফিরে এলো আওয়ামী লীগ ২১৪

www.pathagar.org

আওয়ামী লীগের সাথে আন্দোলন : কতিপয় ঘটনা ২১৯
১৯৯৬ সালের নির্বাচনের বিপর্যয়
কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা জামায়াতের ২২৩
চারদলীয় জোট গঠন : সরকারবিরোধী আন্দোলনের নতুন মাত্রা ২২৬
চারদলীয় জোটের শীর্ষ নেতাদের জনসভা শুরু পল্টন থেকে......... ২৩০
এরশাদের চারদলীয় জোট ত্যাগ.. ২৩১
সংবিধানবিরোধী পার্বত্য শান্তিচুক্তি : চারদলীয় জোটের লংমার্চ...... ২৩২
চারদলীয় জোটের প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য কমিটি গঠন ২৩৬
নির্বাচনে চারদলীয় জোটের বিপুল বিজয় ২৪২
চারদলীয় জোটের সরকার পরিচালনা ও রাজনীতি ২৪৪
জামায়াতের দুই মন্ত্রীর সততা ও নিষ্ঠা ২৪৬
কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ে মাওলানা নিজামী.............. ২৪৮
জোট সরকারের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে
মহানগর নাট্যমঞ্চের অনুষ্ঠান.. ২৫২
জামায়াতের ইফতার পার্টিতে এরশাদের দাওয়াত প্রসঙ্গ.............. ২৫৪
জামায়াতের দুই মন্ত্রীর সততা সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে ২৫৭
গণমাধ্যম ও জোট সরকার ২৫৯
একটি টিভি চ্যানেলের আত্মকথা ২৫৯
চারদলীয় জোট সরকারে জামায়াতের অর্জন ২৬৫
চারদলীয় জোট সরকারের পারফরম্যান্স ২৬৮
বিএনপি-জামায়াত সম্পর্ক ও খালেদা জিয়া ২৭০
চারদলীয় জোট সরকারের শেষের দিকের কিছু ঘটনা ২৭৪
২৮ অক্টোবর ২০০৬-এর ট্র্যাজেডি :
হাসিনার লগি-বৈঠার তাণ্ডব ও বর্বরতা ২৭৮
জরুরি আইন জারি : বদলে গেল দৃশ্যপট ২৮১

www.pathagar.org

সেনাসমর্থিত সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযান ব্যর্থ হলো ২৮৩
'মাইনাস টু' ফরমুলা ও সংস্কারের রাজনীতি ২৮৩
মতিউর রহমান নিজামী গ্রেফতার : জামায়াতের তীব্র প্রতিক্রিয়া ২৮৫
চারদলীয় জোট চাঙা হলো ২৮৫
জাতীয় প্রেসক্লাবে আমার ওপর আওয়ামী গুন্ডার হামলা.............. ২৮৭
আইডিবি ভবনে একটি সেমিনারের ঘটনা ২৮৮
'মাইনাস টু' ফরমুলা : ডিজিএফআইয়ের কারসাজি.................... ২৯০
তারেক রহমানের ওপর অকথ্য নির্যাতন................................ ২৯১
জামায়াত সেক্রেটারি জেনারেলের মন্তব্য :
যুদ্ধাপরাধী ইস্যু নিয়ে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া ২৯৩
বিএনপি ভাঙার চেষ্টা ডিজিএফআইয়ের :
প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা.. ২৯৬
ড. মুহাম্মদ ইউনুসের রাজনৈতিক দল 'নাগ' প্রসঙ্গ ২৯৮
ফখরুদ্দীন সরকারের ব্যর্থতা ৩০৩
নবম সংসদ নির্বাচনে বিএনপির কৌশলের ত্রুটি........................ ৩১১
নবম সংসদ নির্বাচন ও জামায়াতের ভুল................................ ৩১২

www.pathagar.org

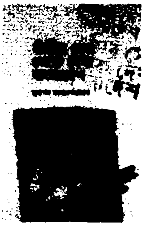

ইসলামী আন্দোলন
আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়

স্কুলে অধ্যয়নকালে ইসলামী আন্দোলনের সাথে আমার পরিচয় ঘটে। আমি আমার শিক্ষক বা পিতা-মাতা থেকেও যে শিক্ষা পাইনি, ইসলামী আন্দোলন আমাকে সেই শিক্ষার সন্ধান দেয়। একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে যে গতিতে পড়ালেখা করে আসছিলাম, এই আন্দোলনের সংস্পর্শে না এলে হয়তো-বা আমার অন্যান্য সহপাঠীদের মতো কোনো চাকরিবাকরি ইত্যাদি করতাম; জীবনটা সম্পূর্ণ ভিন্নখাতেই প্রবাহিত হতো। ইসলামের যে শিক্ষা ইসলামী আন্দোলনের সাহচর্যে পেয়েছি, তাতে আমি সন্তুষ্ট। আল্লাহর সন্তোষ লাভই আমার জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেন আমাকে সেই হিদায়াতের ওপর টিকিয়ে রাখেন, এই আমার প্রার্থনা।

ইসলামী আন্দোলনের বদৌলতে আজ বাংলাদেশের ছাত্র-যুবকদের মধ্যে যে বিরাট কাফেলা গড়ে উঠেছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বড়ো নিয়ামত। একতরফা মিথ্যা প্রচারণা ও বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে এই কাফেলা এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায়, একদিন এরাই বাংলাদেশকে বদলে দেবে, ইনশাআল্লাহ। এই কাফেলায় শরিক থেকে আমি যতটুকু কাজ করতে পেরেছি, তার জন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি।

ইসলামী আন্দোলন থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি, আল্লাহর দাসত্ব ও বন্দেগির মধ্যেই মানবজাতির মুক্তি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

> "হে মানবজাতি, তোমরা সেই আল্লাহর বন্দেগি করো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পারো বা মুক্তি পেতে পারো ।" সূরা বাকারা : ২১

আল্লাহর ইবাদতই মানবজাতির মুক্তির রাজপথ, অন্য কোনো পথে মানবতার মুক্তি নেই।

www.pathagar.org

যুবসমাজের মধ্যে ইসলামী জাগরণ : ইসলামী আন্দোলনের বড়ো অবদান

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল-মাদরাসার ছাত্রসমাজের এক বৃহত্তর অংশ ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষালাভ করেও ইসলামের প্রতি তাদের আন্তরিকতা, দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি তারা উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠন ও ইসলামী আদর্শের অনুশাসনে যেভাবে এগিয়ে এসেছে, তা বাংলাদেশে এক দৃশ্যমান বাস্তবতা। অধার্মিকতা বা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা, ধর্মদ্রোহিতা ও বস্তুবাদী ভোগবাদিতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ইসলামপন্থি ছাত্ররা যেভাবে সংগঠিত হয়েছে, তা ইসলামের দুশমনদের মধ্যে হৃৎকম্পন সৃষ্টি করেছে। সুনির্দিষ্ট গঠনমূলক কর্মসূচি, ইসলামের সর্বজনীন আদর্শের অন্তর্নিহিত শক্তি এবং সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের অনুপম চরিত্র, কথা ও কাজের মিল ইত্যাদি কারণেই ইসলামপন্থি ছাত্ররা একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

যারা ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র অথবা ব্যক্তিতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব করছে, তাদের কোনো ইতিবাচক আদর্শ ও কর্মসূচি নেই। রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি এবং ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবেই কাজ করছে তারা। টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, ক্ষমতা ও অস্ত্রের জোরে দখলদারত্বের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করাই এদের বৈশিষ্ট্য। এদের কর্মকাণ্ডকে স্লোগানসর্বস্ব একধরনের 'রাজনৈতিক টাউটগিরি' ছাড়া অন্য কিছু বলার সুযোগ নেই। এদের নেতৃত্বে মেধাহীন অস্ত্রধারী ক্যাডার ও অছাত্রদেরই প্রাধান্য। টেন্ডার ও চাঁদার ভাগ-বণ্টন এবং প্রভাব বিস্তারের জন্য এরা নিজেরাই সংঘাত ও খুনোখুনিতে জড়িয়ে পড়ে। প্রায়ই দেশের মানুষ সংবাদপত্রে ও টিভি চ্যানেলে এদের রাইফেল, বন্দুক, পিস্তল, রিভলবার, চাপাতি, রামদা হাতে দেখতে পান। ফলে স্বাভাবিকভাবেই শান্তিকামী দেশবাসী তাদের ব্যাপারে হতাশ ও উদ্‌বিগ্ন।

পক্ষান্তরে ইসলামপন্থি ছাত্রদের সুশৃঙ্খল, সুশিক্ষা ও চরিত্র গঠনমূলক কার্যক্রম মানুষের হৃদয় জয় করছে। সাধারণ ছাত্রদের মধ্য থেকেই শক্তি সঞ্চয় করছে ইসলামপন্থি ছাত্রদের এই আন্দোলন। বাংলাদেশের অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রধান কলেজগুলোই এর প্রমাণ। ছাত্রসমাজের মাঝে

www.pathagar.org

ইসলামের পক্ষে যে জাগরণের সূচনা হয়েছে, মেধাহীন ও অছাত্র নেতৃত্ব, অস্ত্রবাজ, টেন্ডারবাজ, চাঁদাবাজ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের স্লোগানধারীদের পক্ষে তা প্রতিহত করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

ইসলামের শিক্ষা বাংলাদেশের মাটির গভীরে

বাংলাদেশের শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ মানুষ মুসলমান। হজরত শাহজালাল, শাহ আমানত, শাহ মাখদুম, খানজাহান আলী, হাজী শরীয়তুল্লাহ রাহি.-এর স্মৃতিবিজড়িত এই বাংলাদেশ এক গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী। পীর-মাশায়েখ, আলেম-উলামা, মসজিদ-মাদরাসা, মক্তব-খানকাহর দেশ এই বাংলাদেশ। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, সাধারণ মানুষই নিজেদের অর্থ ও প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেছে লক্ষ লক্ষ মসজিদ-মাদরাসা ও ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বন্দুক দিয়ে শক্তির জোরে এ দেশের জনগণের ওপর ইসলাম চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। ইসলামের মহত্ত্ব, মানবকল্যাণমুখিতা ও সর্বজনীন আদর্শের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এই জনপদে আমাদের পূর্বপুরুষরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন দলে দলে। এ দেশের লক্ষ লক্ষ মসজিদে প্রতিদিন পাঁচবার আযানের ধ্বনি অনুরণিত হয়। বাংলাদেশের মাটি ও আলো-বাতাসের সাথে মিশে আছে ইসলাম। সুতরাং, ইসলামের শেকড় এ দেশের মানুষের হৃদয়ে, এ দেশের মাটির গভীরে।

(রাত ২:৩০ টা; ২ আগস্ট, ২০১৩)

www.pathagar.org

পলাশির প্রান্তরে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হলো

বদ্বীপ দেশ বাংলাদেশ। পলিমাটির দেশ বাংলাদেশ। খাল-বিল, হাওড়-নদীর দেশ বাংলাদেশ। সেন ও পাল বংশের রাজারা এই দেশ শাসন করেছেন অনেক দিন। ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনের যুগ শুরু হয়। মুসলিম শাসকরা চারশো বছরের বেশি সময় এ দেশ শাসন করেছেন পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় পর্যন্ত। মূলত স্বাধীন সুলতান বা শাসকরাই এ দেশ শাসন করেন।

পলাশিতে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ছিল একটি আঁতাত, ষড়যন্ত্র ও নীলনকশার ফসল। সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে সামান্য এক ইংরেজ বাহিনীর হাতে নবাব সিরাজের পতন হয়। সেই ষড়যন্ত্রে মীর জাফর একা ছিলেন না। তার সাথে ছিলেন উমিচাঁদ, জগৎশেঠ ও ঘসেটি বেগমরা।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন যেদিন লর্ড ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী রাজধানী দখল করে, সেদিন মুর্শিদাবাদের রাজপথের দুই ধারে উৎসাহী জনতা দাঁড়িয়ে তামাশা দেখেছে। একজন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন—'মুর্শিদাবাদের রাস্তার দুই ধারে যে জনতা জমায়েত হয়েছিল, তারা যদি একটি করে পাথরও নিক্ষেপ করত, তাহলে ইংরেজ বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত এবং এভাবে মুর্শিদাবাদের আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্ত যেত না; বরং ভিন্ন ইতিহাস রচিত হতো।' আঁতাতের ফলে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সাহসী ও দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে মর্মান্তিকভাবে জীবন দিতে হতো না, যদি মীর জাফরেরা বিশ্বাসঘাতকতা না করত। দুঃখজনক হলো—কিছু কথিত লেখক ও ঐতিহাসিক দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী, সাহসী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে ইতিহাসকে কালিমালিপ্ত করেছেন। বাংলাদেশেরও কিছু লোক নবাব সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কে ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করে থাকেন।

www.pathagar.org

১৯০ বছরের ব্রিটিশ দখলদারত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর উপমহাদেশে ব্রিটিশরা শক্তভাবে শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করে। হিন্দুদের জন্য এটা ছিল প্রভু বা শাসক বদল; কিন্তু মুসলমানদের জন্য ছিল রাজ্য হারানোর বেদনা।

ভারতবর্ষব্যাপী মোগলরা দীর্ঘদিন দিল্লি থেকে শাসনকাজ চালিয়েছে। এ শাসন ছিল অসাম্প্রদায়িক ও জনহিতকর। এ সময়কালে হিন্দু-মুসলিম সকলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্যে বসবাস করেছে। ইংরেজদের হাতে শাসনক্ষমতা হারানোর কারণে মুসলমানরাই ইংরেজদের প্রতি রুষ্ট ছিল। শুরু থেকেই ইংরেজদের সাথে অসহযোগিতা শুরু করে মুসলমানরা। ওদিকে ইংরেজরা 'ভাগ করো এবং শাসন করো' (Divide and Rule) নীতি অনুসরণ করে এবং হিন্দুদেরকে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য দিতে থাকে।

ব্রিটিশ দখলদাররা উপমহাদেশের জনগণের ওপর সুপরিকল্পিতভাবে তাদের কৃষ্টি-কালচার চাপিয়ে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করে। রাষ্ট্রীয় কাজে ইংরেজি ভাষা চালু করা হয়। এখানকার বিচারব্যবস্থা বিলুপ্ত করে ব্রিটিশ আইন দ্বারা বিচারকাজ শুরু করা হয়। মুসলমানরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হওয়ার কারণে ইংরেজি শিক্ষা থেকে দূরে থাকে। ফলে হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে দ্রুত এগিয়ে যায় এবং সরকারি চাকরিতে তাদেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে ব্রিটিশরা ধর্মীয় শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার নামে দুই ধারার শিক্ষা চালু করে এ দেশের মুসলিম সমাজের মধ্যে একটি বিভাজনের বীজ বপন করে। উচ্চতর সরকারি পদে ইংরেজরাই থাকত এবং নিম্নপর্যায়ে কাজ চালানোর জন্য দেশীয় কেরানি তৈরি করার জন্যই লর্ড ম্যাকলের নেতৃত্বে এই শিক্ষানীতি চালু করা হয়।

ভারতবর্ষ ছিল বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন একটি উপনিবেশ। দখলদার শক্তি হিসেবে ইংরেজরা ভারত শাসন ও শোষণ করে এখানকার সম্পদ পাচার করে ব্রিটেনে পাঠাতে থাকে। বিশেষ করে মুসলমানদের অবস্থা ক্রমান্বয়ে শোচনীয় হতে থাকে। রাজ্য হিসেবে আমাদের এই বাংলাদেশ ছিল সম্পদশালী ও সমৃদ্ধ। উইলিয়াম হান্টার *দি ইন্ডিয়ান মুসলমান* গ্রন্থটিতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন—আগে মুসলমানদের মধ্যে দরিদ্র ও অশিক্ষিত কোনো লোক পাওয়া ছিল কঠিন। কিন্তু ইংরেজ শাসনামলে মুসলমানরা দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.org

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বিশেষ করে বাংলা প্রদেশটি অর্থনৈতিকভাবে অনেক সমৃদ্ধ ছিল। বলা হতো—মাঠভরা ফসল, গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ; এই ছিল বাংলার অবস্থা। ইংরেজদের বিশেষ আনুকূল্যে বাংলায় হিন্দু জমিদারদের দ্বারা মুসলমানরা নিগৃহীত হতে থাকে। ওদিকে ইংরেজরা কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করে জুলুম-নির্যাতন চালায়। ফলে কৃষকদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ইংরেজবিরোধী মনোভাব দৃঢ় হতে থাকে।

বিশেষ করে বাংলা প্রদেশ যে এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল, তার বিস্তৃতি ছিল বার্মার সীমান্ত থেকে আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, উড়িষ্যা-বিহার ও বর্তমান পশ্চিম বাংলাসহ বিশাল এলাকা। এই গোটা এলাকা সিরাজউদ্দৌলার শাসনের অধীনে ছিল। এই অঞ্চলের জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী সংগ্রাম করেই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। তাদেরকে সংগ্রাম করতে হয়েছে আর্য ও উগ্রবাদী ব্রাহ্মণ্যশক্তির বিরুদ্ধে। শক, হুন, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, ফরাসি ও সর্বশেষ ইংরেজ দখলদারের বিরুদ্ধে। এই অঞ্চলের মানুষের আজাদির সংগ্রাম শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত চলে এসেছে। ফকির বিদ্রোহ, সন্ন্যাস বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, ফরায়েজি আন্দোলন ও মুজাহিদ আন্দোলন থেকে নিয়ে পাকিস্তান আন্দোলন পর্যন্ত এ সংগ্রামের পথ ছিল খুবই দীর্ঘ। ইংরেজ শাসনের একশো বছরের মাথায় ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ ছিল ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিমদের সম্মিলিত স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বড়ো মাইলফলক।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সোচ্চার হন উপমহাদেশের সংগ্রামী আলেমসমাজ। মূলত আলেমরাই গ্রামগঞ্জের মানুষদের ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জাগরিত করেন। ফলে ইংরেজরা তাদের গ্রেফতার করতে থাকে। বিপুলসংখ্যক আলেমকে ইংরেজরা বন্দি করে এবং তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে দ্বীপান্তর করে আন্দামানের কারাগারে পাঠানো হয়। তাদের অনেকে সেখানেই শাহাদাতবরণ করেন। আন্দামান পরিদর্শন করতে গিয়ে একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন—'এখানে এত বিপুলসংখ্যক প্রখ্যাত আলেমকে বন্দি করে রাখা হয়, যাদের নামের তালিকা পড়তে পড়তে আপনার চোখ ক্লান্ত হয়ে আসবে।' অথচ দুর্ভাগ্য হলো, ইতিহাসে আলেমদের এসব সংগ্রামী ভূমিকার ঘটনা উল্লেখ করা হয় না।

স্বাধীনতার পথপরিক্রমায় আমাদের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ধারণা লাভ করতে চাইলে মুহাম্মদ আবদুল মান্নান রচিত *মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা* পাঠ করা যেতে পারে।

www.pathagar.org

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের অন্তরালে

ইংরেজরা বন্দুকের টোটায় শূকর ও গরুর চর্বি ব্যবহার শুরু করে, যা সিপাহিদের দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে খুলতে হতো। এ কথা জানাজানি হওয়ার পর প্রথমে মুসলিম সিপাহিরা এই টোটা ব্যবহারে অস্বীকৃতি জানায় এবং পরে হিন্দু সিপাহিরা মুসলিমদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়। এ ব্যাপারে ইংরেজরা সেই টোটা প্রত্যাহারের পরিবর্তে অন্যায়ভাবে চাপ সৃষ্টি করলে পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে বিদ্রোহ শুরু হয়।

বাংলা থেকেই বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে। ইংরেজ অফিসারদের ওপর সিপাহিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেনাছাউনিগুলো সিপাহিরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে থাকে। এরপর তা দ্রুতগতিতে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু-মুসলিম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই বিদ্রোহে শামিল হয়। সব শ্রেণির ভারতবাসীই এই সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে।

ব্রিটিশ দখলদার শাসনের বিরুদ্ধে ভেতরে ভেতরে যে ক্ষোভ জমা হয়েছিল, সিপাহি বিদ্রোহ ছিলই তারই বিস্ফোরণ। যেহেতু এটা তেমন কোনো পরিকল্পিত বিদ্রোহ ছিল না, তাই ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হয়। সিপাহি বিদ্রোহে রাজিয়া সুলতানা, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আমরা ইতিহাসেই পেয়েছি। কিন্তু ইতিহাসে বাংলার যুবক-তরুণদের ভূমিকার কথা খুব কমই স্থান পেয়েছে। অথচ তাদের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল এবং ত্যাগ ছিল বিশাল। সিপাহি বিদ্রোহের পর বিশেষ করে বাংলায় সিপাহিরা পাইকারি হারে চাকরিচ্যুত হয়। ঘটনাক্রমে বাংলার বিপুলসংখ্যক মুসলিম যুবক সিপাহির চাকরি নিয়ে গোটা ভারত ছড়িয়ে ছিল। সিপাহি বিপ্লবের পর চাকরি হারিয়ে তারা যখন ঘরে ফিরে আসে, তখন এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। বেকার সিপাহিদের পরিবারগুলো নিদারুণভাবে আর্থিক অনটনে পড়ে যায়। ফলে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সিপাহি বিদ্রোহের পেছনে মুখ্য কারণ ছিল ধর্মীয়। টোটায় শূকর ও গরুর চর্বি ব্যবহার করার কারণে তা দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ছিঁড়তে হতো বলে ধর্মপ্রাণ সিপাহিরা তা প্রত্যাখ্যান করার ফলেই বিদ্রোহের সূচনা হয়। সামগ্রিকভাবেই ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে ধর্মের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা।

www.pathagar.org

তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা

মীর নিসার আলী তিতুমীর। বাংলার এই দামাল সন্তান নির্যাতিত কৃষকদের সংঘবদ্ধ করে এক অসাধারণ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। যুবক বয়স থেকেই তিনি চাষিদের ওপর ইংরেজদের অত্যাচার লক্ষ করে আসছিলেন। ইংরেজরা চাষিদের নীল চাষ করতে বাধ্য করত এবং জোর করে তাদের সম্পত্তি নীল চাষের জন্য নিয়ে নিত। মুসলিম প্রজাদের দাড়ির ওপর ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছিল। ব্রিটিশদের অনুগত হিন্দু জমিদাররা খাজনার জন্য গরিব-নিরীহ কৃষকদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালাত। তখন কৃষিই ছিল মানুষের প্রধান জীবিকা।

উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের ওপরও ইংরেজরা চরম আঘাত হানে। মসলিন কাপড় ছিল বিশ্ববিখ্যাত। উপমহাদেশের মসলিন শাড়ি ও অন্যান্য কাপড়ের সাথে প্রতিযোগিতায় কেউ পারত না। এই শিল্পের মূলে ছিল কারিগরদের অসাধারণ নৈপুণ্য। মসলিন তাঁতশিল্প ধ্বংস করার জন্য ইংরেজরা উঠেপড়ে লাগে। এমনকি অনেক কারিগরের আঙুল কেটে দেওয়া হয়, যাতে মসলিন কাপড় বুননের কাজ করতে না পারে। মসলিন কাপড়ের কাজ এত নিপুণ ছিল যে, একটি দিয়াশলাই বাক্সে একটি শাড়ি পুরে রাখা যেত। কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত এই মসলিনশিল্প ইংরেজরা ধ্বংস করে দেয়।

আমরা আলোচনা করছিলাম মীর নিসার আলী তিতুমীর সম্পর্কে। যুবক বয়সেই তিনি আরব দেশে যান হজ করতে। সেখানে তার সাক্ষাৎ হয় সৈয়দ আহমদ বেরলভির সাথে। তার কাছে ইসলাম সম্পর্কে কিছুদিন শিক্ষা গ্রহণ করে দেশে ফিরে আসেন তিতুমীর। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর মীর নিসার আলী তিতুমীর ইংরেজদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। তার প্রচেষ্টায় সংগঠিত কৃষকদল বিরাট এক বাঁশের কেল্লা তৈরি করে। ইংরেজরা তার কার্যক্রম থামানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তবে একপর্যায়ে বিশাল ইংরেজ সেনাবাহিনীর সাথে তিতুমীরের যুদ্ধ হয় এবং তিনি শহীদ হন। ইংরেজরা তিতুমীর ও তার অনুসারীদের দুর্ধর্ষ ডাকাত ও সন্ত্রাসী হিসেবে অপপ্রচার চালায়। এখন যেমন পশ্চিমারা মুসলমানদের সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে, কয়েকশো বছর আগের চিত্রও তা-ই ছিল। তবে ইংরেজরা তিতুমীরের সাহসিকতা ও বীরত্বের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

(রাত ১২:৩০ টা; ৩ আগস্ট, ২০১৩)

www.pathagar.org

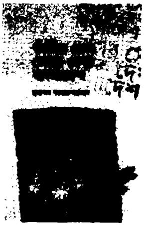

বালাকোটের শহীদদের কথা

মুজাদ্দিদে আলফেসানি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি, সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভি, শাহ ইসমাইল, শাহ আবদুল আজিজ রাহি. প্রমুখ মনীষী ধারাবাহিকভাবে উপমহাদেশে মুসলিম গণজাগরণ আন্দোলন গড়ে তোলেন।

সৈয়দ আহমদ বেরলভি ছিলেন এক অসাধারণ বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি যে মুজাহিদ আন্দোলন গড়ে তোলেন, তা আমাদের বাংলাদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী পুরুষ। তিনি যে এলাকায় সফর করতেন, সেখানে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সর্বশ্রেণির মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হতো। দলে দলে শুধু মুসলিমরাই তার আন্দোলনে শরিক হতেন তা নয়; বরং তার সান্নিধ্যে এসে অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতেন।

সৈয়দ আহমদ বেরলভি হজের উদ্দেশ্যে নিজের গ্রাম থেকে রওনা হলে শত শত লোক তার হজ কাফেলায় শরিক হন। হজ সম্পন্ন করার পর তিনি মক্কা-মদিনায় বড়ো বড়ো ইসলামী আলেম ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। ফিরে আসার পর তার দুই প্রধান সহযোগী শাহ ইসমাইল ও শাহ আবদুল আজিজের সমন্বয়ে ইসলামী সমাজ কায়েমের আন্দোলনের জন্য এক বিশাল বাহিনী গড়ে তোলেন। এই বাহিনী নিয়ে তিনি বর্তমান পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নিকট পার্বত্য উপত্যকায় বালাকোট নামক স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা প্রদান করেন। তার সাথে স্থানীয় পাহাড়ি সর্দারগণও শামিল হন। কিন্তু সেখানকার কিছু লোকের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে একপর্যায়ে সংঘটিত যুদ্ধে তার বাহিনীর কয়েকশো লোক শহীদ হন এবং সৈয়দ সাহেব নিজেও শাহাদাতবরণ করেন। ফলে অঙ্কুরেই সেই ইসলামী রাষ্ট্রের বিপর্যয় ঘটে। সেটা ছিল এক দুর্গম এলাকা। সেখানকার পার্বত্য জনগোষ্ঠীর ইসলামের তেমন শিক্ষা ছিল না। তাদের ওপর আস্থা রেখে

www.pathagar.org

সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করে জিহাদ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নানা মত রয়েছে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভির আন্দোলন উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণে এক বড়ো অবদান রেখেছে।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভির লেখা বই *যব ঈমান জাগগেয়ি* পড়া যেতে পারে; বইটি বাংলায় অনূদিত হয়েছে *ঈমান যখন জাগল* নামে। তা ছাড়া সৈয়দ আহমদ শহীদের জীবনী ও সংগ্রাম সম্পর্কে লেখা আরও বইও আছে, যার সাহায্য নিয়ে বালাকোটের শহীদদের এই মহান আন্দোলন সম্পর্কে জানা যাবে। আজ উপমহাদেশে যেসব ইসলামী আন্দোলন হচ্ছে, তা মূলত মুজাদ্দিদে আলফেসানি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও সৈয়দ আহমদ শহীদ রাহি.-এর আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতা।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ

১৮৭৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ শাসকদের সাথে সহযোগিতা করে কিছু দাবিদাওয়া আদায়ের লক্ষ্য নিয়ে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তী সময়ে ভারতীয় জনগণের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় কংগ্রেস। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে জনগণ কংগ্রেসে যোগদান করতে থাকে। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী ভ্রাতৃদ্বয়, মাওলানা হাসরাত মোহানির মতো মুসলিম নেতারাও কংগ্রেসে যোগদান করেন। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরে কংগ্রেসের সাথেই কাজ শুরু করেন। মতিলাল নেহেরু, সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল, জওহরলাল নেহেরু, সুভাষ চন্দ্র বসু, রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখের নেতৃত্বে কংগ্রেস কার্যত হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠনে পরিণত হয়।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ একজন আধুনিক উদারনৈতিক নেতা হিসেবে কংগ্রেসে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কংগ্রেসের লাখনৌ অধিবেশনে তার বিখ্যাত ১৪ দফা প্রস্তাবের জন্য তাকে হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের নীতির কারণে জিন্নাহ কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

www.pathagar.org

কংগ্রেসের জন্মের ৩০ বছর পর ঢাকার নবাব মুহসিন-উল-মুলক, ভিখারুল মুলক প্রমুখের নেতৃত্বে এক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৬ সালে। এই সম্মেলনে ভারতীয় মুসলমানদের একটি সমিতি বা সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় মুসলিম লীগ নামক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। উপমহাদেশের পরিস্থিতিই এমন ছিল যে, মুসলমানরা যেন তাদের নিজস্ব একটি প্ল্যাটফর্মের জন্য অপেক্ষা করছিল। ফলে মুসলিম লীগের সংগঠন বেশ দ্রুত স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভারতবর্ষের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে পড়ে। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও এ কে ফজলুল হকের মতো নেতারা—যারা ছিলেন সারা ভারতবর্ষব্যাপী পরিচিত—কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করলে ক্রমান্বয়ে মুসলিম লীগ ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠনে পরিণত হয়। তখন থেকেই ভারতবর্ষের রাজনীতিতে দুটি ধারার সৃষ্টি হয়।

বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী পরিস্থিতি

ভারতের ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বাংলাকে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা এই দুই ভাগে বিভক্ত করে। ১৯০৫ সালে পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকা ও পশ্চিম বাংলার রাজধানী করা হয় কলকাতাকে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে পূর্ব বাংলার জনগণ খুশি হয়। কারণ, পূর্ব বাংলাকে হিনটারল্যান্ড হিসেবে ব্যবহার করে কলকাতাকেন্দ্রিক বা পশ্চিম বাংলাকেন্দ্রিক উন্নয়ন করা হতো। ঢাকা পূর্ব বাংলার রাজধানী হওয়ায় পূর্ব বাংলার জনগণ আশান্বিত হয় যে, এবার ঢাকার উন্নয়ন হবে। ঢাকা ও কলকাতার উন্নয়ন-বৈষম্য প্রত্যক্ষ করে প্রখ্যাত রাজনীতিক ও সাহিত্যিক মরহুম আবুল মনসুর আহমদ বলতেন—"আমাদের পূর্ব বাংলা হলো 'খামার বাংলা', আর পশ্চিম বাংলা হলো 'টাওয়ার বাংলা'।" আসলে পূর্ব বাংলাকে শোষণ করেই গড়ে তোলা হয় কলকাতা নগরী এবং দারুণভাবে বঞ্চিত থেকে যায় পূর্ব বাংলা। পূর্ব বাংলায় কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না; সব শিল্পকারখানাও গড়ে ওঠে কলকাতা ও তার আশেপাশে।

পূর্ব বাংলার জনগণ খুশি ও আশান্বিত হলেও এই বঙ্গভঙ্গ বা বঙ্গবিভাগ মেনে নিতে পারেনি কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু অভিজাতশ্রেণি। তারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন শুরু করে। এই বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের প্রথম কাতারে ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেই তিনি তার বিখ্যাত কবিতা লিখলেন—'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'।

www.pathagar.org

রাজনৈতিকভাবে কংগ্রেস নেতারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা কোনো ধরনের সুবিধা লাভ করুক, কলকাতার এলিট শ্রেণি ও হিন্দু নেতারা তা মেনে নিতে পারেননি। হিন্দুদের আন্দোলনের কারণে তাদের খুশি করার জন্য শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরা ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগের আগে যখন ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত হলো, তখন হিন্দু ও কংগ্রেস নেতারা বাংলাকে ভাগ করার পক্ষাবলম্বন করলেন। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকসহ মুসলিম লীগ নেতারা তখন বাংলাকে ভাগ করার পক্ষে ছিলেন না। ১৯০৫ সালে যারা বাংলা ভাগ করার বিরুদ্ধে ছিল, তারা ১৯৪৭ সালে আবার সেই বাংলাকে ভাগ করে ছাড়লেন। বাংলা ভাগ করার বিরুদ্ধে যে কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন, সেই কবিতাটিই ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়ার পর হলো বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। অথচ এটি এতদঞ্চলের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে রচিত হয়েছিল। এটিও ইতিহাসের এক মহাবিস্ময়কর ঘটনা।

(রাত ১১:৩০ টা; ৪ আগস্ট, ২০১৩)

www.pathagar.org

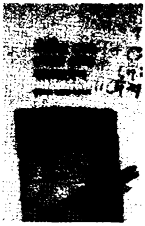

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করায় স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব বাংলার জনগণ ইংরেজ সরকারের ওপর বিক্ষুব্ধ ছিল। তাদের ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত করার জন্যই 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার দাবি মেনে নেয় সরকার। নবাব স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানেও লক্ষণীয় যে, কলকাতাকেন্দ্রিক ভদ্রলোকেরা ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধিতা ও কটাক্ষ শুরু করেন। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কলকাতায় যে শোভাযাত্রা বের করা হয়, তার নেতৃত্বে ছিলেন প্রথম বাঙালি নোবেলবিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'-কে ঠাট্টা করে কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বলতেন।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হলে এই অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়।

১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব

১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে মৌলভি এ কে ফজলুল হক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে এক ঐতিহাসিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ওই অধিবেশনেই এ কে ফজলুল হককে 'শেরেবাংলা' উপাধি দেওয়া হয়। সেই প্রস্তাবে মুসলমানদের নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ যেসব এলাকা রয়েছে, সেখানে আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি করা হয়। লাহোর প্রস্তাবে একাধিক রাষ্ট্র গঠনের কথাও ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দিল্লিতে মুসলিম লীগের একটি সম্মেলনে তা সংশোধন করে States-এর পরিবর্তে State লেখা হয়।

www.pathagar.org

লাহোর প্রস্তাবকে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' বলা হলেও আসলে সেই প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' নামটি উল্লেখ করা ছিল না। তবে বিলাতে অধ্যয়নরত ছাত্র রহমত আলী ইতঃপূর্বে 'PAKISTAN' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন, যা আল্লামা ইকবাল গ্রহণ করেন এবং 'পাকিস্তান' নামে উপমহাদেশে একটি মুসলিম রাষ্ট্র হবে, এ কথা ছড়িয়ে পড়ে ঘরে ঘরে।

যদি লাহোরের মূল প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৪৭ সালে সিদ্ধান্ত হতো, তাহলে উপমহাদেশে দুটির পরিবর্তে কমপক্ষে তিনটি রাষ্ট্র হতো ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে। একটি হলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা এবং অপরটি হলো বর্তমান যে পাকিস্তান তথা পাঞ্জাবকে কেন্দ্র করে। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনে আবেগ এমন কাজ করেছে যে, সারা ভারতের সকল মুসলমানের দাবিতে পরিণত হয় 'পাকিস্তান'। যেসব হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা ছিল, সেখানকার মুসলমানদেরও দাবি ছিল পাকিস্তান। অথচ তারা জানত যে, এই পাকিস্তান হলে তারা নিজ ভিটাবাড়িতে অবস্থান করে সেই দেশের নাগরিক হতে পারবে না। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহও বাংলাকে ভাগ না করে বাংলা আলাদাভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র হোক—এটা চেয়েছিলেন।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতেই শেষ পর্যন্ত ভারত বিভাগ

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের আন্দোলনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সকল পক্ষই কঠিন রাজনৈতিক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। বিশেষ করে বিনা রক্তপাতে ভারতের স্বাধীনতা দিয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ইংরেজরা কীভাবে ভারত ছাড়তে পারবে, এটাই ছিল তাদের বড়ো বিবেচ্য বিষয়। মহাত্মা গান্ধীসহ যারা ভারত ভাগের বিরোধী ছিলেন, তারা কংগ্রেসের অভ্যন্তরে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিলেন। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ নিজেও মনে করতেন যে, পাকিস্তান দাবি ইংরেজ ও কংগ্রেস মেনে নেবে না এবং শেষ পর্যন্ত একটি দুর্বল ফেডারেশনের অধীনে পাকিস্তান হবে। তিনি ভারত ভাগ না করে অন্তত একটি উইক ফেডারেশনই কামনা করেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রে সংখ্যা সাম্যের ভিত্তিতে সরকার গঠন কংগ্রেস কোনোক্রমেই মানতে রাজি না হওয়ায় কংগ্রেসের জওহরলাল নেহেরুসহ অধিকাংশ নেতারই মুসলিমবিদ্বেষী মনোভাব সম্পর্কে বিরক্ত হয়ে আপসহীনভাবে পাকিস্তান দাবির পক্ষ নিলেন জিন্নাহ।

www.pathagar.org

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ছিলেন ইংরেজদের শেষ বড়ো লাট। মেধাবী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই ব্যক্তি যেকোনো মূল্যে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নটি সুরাহা করতে চাইলেন। তখন এটিই ছিল তার লক্ষ্য। দ্বিজাতি তত্ত্বের (অর্থাৎ, ভারতে হিন্দু ও মুসলিমরা আলাদা দুটি জাতি, তাদের জন্য আলাদা দুটি রাষ্ট্র হতে হবে) ভিত্তিতে ভারত ভাগ হোক, এটা তিনিও চাননি। মাউন্টব্যাটেন নিজেও ভারতকে ভাগ না করে কোনো সমাধান বের করা যায় কি না তার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতকে ভাগ করার কঠিন সিদ্ধান্তটিই নেওয়া হলো। ভারতের মানচিত্রের ওপর কাঁচি ও পেন্সিল চালিয়ে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত (আসলে ত্রিখণ্ডিত) করে দেওয়া হলো। কারণ, সময় ছিল খুবই কম। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করার জন্য তাড়া দিচ্ছিল। সবচেয়ে কঠিন ছিল বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ করা। দু দিকেই বিপুল পরিমাণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সহায়সম্পত্তি হারাবে। বাংলাতে ছিল হিন্দু ও মুসলমানের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রশ্ন। আর পাঞ্জাবে শিখ, হিন্দু ও মুসলমানের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ব্যাপার।

ভারত ভাগের সিদ্ধান্তের সাথে সাথে দাঙ্গা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল। এমন নির্মম হত্যাকাণ্ড বোধ হয় পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই হয়েছে। বিশেষ করে লাহোর থেকে অমৃতসর বা অমৃতসর থেকে লাহোরের অভিমুখে যেসব ট্রেন গিয়েছে, প্রতিটিতে ছিল শুধু মানুষের লাশ আর লাশ। লক্ষ লক্ষ মানুষ সহায়সম্পত্তি ছেড়ে যেমন পাকিস্তানে এসে মুহাজির হয়েছিল, তেমনি ভারতেও গিয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। সে সময়ের হিসাবে প্রায় এক কোটি লোক এপার থেকে ওপার এবং ওপার থেকে এপারে এসেছে। নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে নিহত হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার এসব বীভৎস দৃশ্যের বর্ণনা শুনে নেহেরু বা জিন্নাহ কেউই মানসিক স্বস্তি লাভ করতে পারেননি। জিন্নাহ নাকি আফসোস করে বলেছিলেন, 'এ আমরা কী করলাম!'

কমপক্ষে ২৫ লক্ষ মুসলমানকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দিতে হয়েছে। হিন্দু শিখদের সংখ্যা ১০ লক্ষের কম নয়, যারা জীবন দিয়েছেন। নিম্নোক্ত কথাটি একজন ঐতিহাসিকের বিশ্বাস—

> It was not the League but the Congress who chose at the end of the day to run a knife across mother India's body.

www.pathagar.org

এক হাজার মাইল ব্যবধানের দুই খণ্ড ভূমির রাষ্ট্র পাকিস্তান

পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান নিয়ে পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চল; আর সেখান থেকে এক হাজার মাইল দূরে পূর্ব বাংলা। এই দুটি ভূখণ্ড নিয়ে বিশ্বমানচিত্রে এক বিচিত্র দেশ গঠিত হলো—পাকিস্তান। পশ্চিমাঞ্চলটির নাম দেওয়া হলো পশ্চিম পাকিস্তান; পূর্ব বাংলার নামকরণ হলো পূর্ব পাকিস্তান।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পেছনে কারণ ছিল, মুসলিমদের প্রতি বঞ্চনা—যা অর্থনৈতিক কারণ যেমন ছিল, তেমনি রাজনৈতিক-সামাজিক কারণও ছিল। তবে সবকিছুকে অতিক্রম করে গিয়েছিল ধর্মীয় আবেগ ও ধর্মীয় পরিবারের বিষয়টি। শেষ পর্যন্ত ধর্মের ভিত্তিতে নির্ধারিত হলো পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সীমানা। যদিও মুসলিম-অধ্যুষিত এলাকা হায়দারাবাদ, জুনাগড়, কাশ্মীর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ভারতের চাণক্য কূটনীতি, হিন্দু রাজা হরিসিংয়ের বিশ্বাসভঙ্গ, উপরন্তু কাশ্মীর অভিযানে যেসব পাঞ্জাবি সেনাদের পাঠানো হয়েছিল, তারা লুটপাটে জড়িয়ে পড়ার কারণে পাকিস্তানকে কাশ্মীর হারাতে হয়েছে। কাশ্মীরের সে ক্ষতি এখনও মেটেনি। ছয় দশকের বেশি সময় পার হতে চলল, অথচ কাশ্মীর উপত্যকায় মুসলমানদের শান্তি ও নিরাপত্তা নেই। ভারত বিপুল পরিমাণ সৈন্য মোতায়েন করে কাশ্মীর দখলে রেখেছে। জাতিসংঘের ১৯৪৮ সালের গণভোটের প্রস্তাবও ভারত উপেক্ষা করে চলছে। কাশ্মীরের জনগণের জন্য স্বাধীনতা শুধু স্বপ্নই রয়ে গিয়েছে।

এক হাজার মাইল দূরের দুটি এলাকা নিয়ে নেতারা কেন রাষ্ট্রটি গঠন করেছিলেন? এ প্রশ্ন এখন করা যত সহজ, তখন কিন্তু তা মোটেও সহজ ছিল না। কারণ, সবাই ভেসে চলেছিলেন এক দারুণ আবেগে। তখন এমন কোনো প্রশ্ন তোলাই ছিল বিপজ্জনক এবং স্বাধীনতার শত্রু বলে গণ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যোগাযোগের জন্য একটি করিডোর চেয়েছিলেন ভারতের মাঝখান দিয়ে। কিন্তু জওহরলাল নেহেরু তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ছয় মাসের জন্য কলকাতার রাস্তা ব্যবহার করার জন্য অস্থায়ী একটি ব্যবস্থার দাবি করেছিলেন জিন্নাহ। কিন্তু নেহেরু তথা কংগ্রেস সরকার তাতেও রাজি হয়নি। আর ভারত এখন বাংলাদেশের কাছে ট্রানজিট ও বন্দর ব্যবহারের সুবিধা আদায় করে নিয়েছে। বিনিময়ে অবশ্য বাংলাদেশ কিছুই পায়নি।

(বিকেল ৪:৪৫ টা, ৫ আগস্ট, ২০১৩; ২৬ রমজান, ১৪০৪; ২১ শ্রাবণ, ১৪২০)

www.pathagar.org

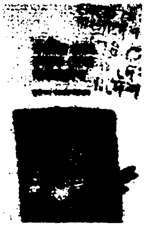

পাকিস্তান আন্দোলন ও ইসলামী রাষ্ট্রধারণা

'পাকিস্তান কা মতলব কিয়া? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (পাকিস্তানের উদ্দেশ্য কী? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) স্লোগান দিয়ে পাকিস্তান আন্দোলন চললেও নেতাদের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো ধারণাই ছিল না।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই পাকিস্তানের নাগরিক; তাদের সকলের সমান অধিকার থাকবে এবং সবার পরিচয় হবে পাকিস্তানি।' অর্থাৎ, জিন্নাহ একটি আধুনিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রই কল্পনা করেছিলেন। যার ফলে পাকিস্তানে সংবিধান রচনাও বিলম্বিত হয়।

আদর্শ প্রস্তাব পাশ করার পরও পাকিস্তানের নেতারা নয় বছরেও একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান উপহার দিতে পারেননি। তা ছাড়া ১৯৪৮ সালে জিন্নাহর মৃত্যু এবং এরপর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পিন্ডির জনসভায় আততায়ীর গুলিতে নিহত হওয়ার কারণে দেশটি শুরুতেই রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতায় পড়ে যায়। পক্ষান্তরে মাত্র নয় মাসের মধ্যেই ভারত একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করতে সক্ষম হয় এবং সেই গণতান্ত্রিক ধারা বিগত ৬৪ বছর যাবৎ অব্যাহত রয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের যে প্রক্রিয়া ভারত শুরু করেছিল, বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে নানা ভাষাভাষী, ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নও নিশ্চিত করেছে দেশটি।

পক্ষান্তরে, রাজনৈতিক নেতাদের ব্যর্থতা ও ক্ষমতালিপ্সার কারণে পাকিস্তান বারবার সামরিক শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কীভাবে দেশ চলবে, তার কোনো কর্মসূচি মুসলিম লীগ প্রণয়ন করেনি।

www.pathagar.org

ভাষা আন্দোলন

ভাষা আন্দোলন এ দেশের ইতিহাসে এক বিরাট অধ্যায়। বাংলা আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা। মাতৃভাষার প্রতি মানুষের টান বা ভালোবাসা সহজাত। আজ প্রায় ৩০ কোটির মতো মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। বাংলা জনসংখ্যার বিবেচনায় বিশ্বের ৭ম ভাষা। বাংলা ভাষাভাষীরা আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে কোটি কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনে জীবনদানের উল্লেখযোগ্য ঘটনা একমাত্র বাংলাদেশেই ঘটেছে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের অপরিণামদর্শী ভূমিকার কারণে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মিছিলে গুলিতে শহীদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর।

পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পরপরই অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র 'তমদ্দুন মজলিস' নামক একটি সংগঠনের নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলন শুরু করেন। পরে অবশ্য অন্যরাও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। প্রথমে ব্যাপকভিত্তিক আন্দোলন হয় ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে এবং ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক ঘটনা।

১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে এলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে যে সংবর্ধনা দেওয়া হয়, সেখানে যে স্মারকলিপি দেওয়া হয়, সেটা পাঠ করেন ডাকসুর তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক গোলাম আযম। সেই স্মারকলিপিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও নৌবাহিনীর সদর দফতর স্থাপনসহ অনেক দাবিদাওয়া স্থান পেয়েছিল। স্মারকলিপিটি রচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আবদুর রহমান চৌধুরী (পরবর্তীকালে বিচারপতি)। রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবি আদায়ের জন্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল। মওলানা ভাসানী, ড. নুরুল হক, কাজী গোলাম মাহবুব, আতাউর রহমান খান বিভিন্ন সময় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তা ছাড়া ভাষা আন্দোলনে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেন অলি আহাদ, আবদুল মতিন, মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখ।

www.pathagar.org

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনার সময় শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ফরিদপুর কারাগারে। ফেব্রুয়ারির আন্দোলনে তার প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা পালনের সুযোগ হয়নি। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির আগেই সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের ব্যাপারে ছাত্রদের মধ্যে ছিল তীব্র উত্তেজনা। আওয়ামী মুসলিম লীগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ১৪৪ ধারা না ভাঙার। ২১ ফেব্রুয়ারির সকালেই আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে গিয়ে ছাত্রনেতাদের জানিয়ে দিয়ে আসেন, আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে নয়। এ সিদ্ধান্তে ছাত্রনেতারা ক্ষুব্ধ হয় এবং অলি আহাদসহ ছাত্রনেতাদের নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সাহসী ও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কমিউনিস্টরা বিশেষ করে সংস্কারপন্থি কমিউনিস্টরা ভাষা আন্দোলনের ধারেকাছে আসেনি। তবে ব্যক্তিগতভাবে আবদুল মতিন ও মোহাম্মদ তোয়াহা ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং আবদুল মতিন ভাষা আন্দোলনের একজন জ্ঞানবান কর্মী ছিলেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন চলাকালে এর সমর্থনে একটি বিবৃতির জন্য তাজউদ্দিন আহমেদ সাইকেল চালিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে গিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলন, তাই কোনো আঞ্চলিক ইস্যুতে বিবৃতি দেবে না—এই যুক্তিতে তারা বিবৃতি দিতে অস্বীকার করেছিল সেদিন। উপমহাদেশের আজাদি আন্দোলনেও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা অস্পষ্টই ছিল। মস্কোর ইশারা ছাড়া তারা কোথাও কোনো ভূমিকা পালন করেনি। অনুশীলন সংঘ তথা সূর্যসেনরা ব্রিটিশবিরোধী যে আন্দোলন করেছিলেন, সেগুলো ছিল স্থানীয় আন্দোলন এবং অনেকটাই বিক্ষিপ্ত ও ব্যক্তি প্রচেষ্টার ফসল। উপমহাদেশের আজাদি যখন দোরগোড়ায় এবং ব্রিটিশ দখলদাররা ভারতের স্বাধীনতা দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বিদায়ের দ্বারপ্রান্তে, তখন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি আজাদি আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তাদের শ্লোগান ছিল—'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়, লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়'।

যে ভাষা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের তেমন কোনো ভূমিকাই ছিল না, বায়ান্নর পর থেকে তারা সেই ভাষা আন্দোলনকে ছিনতাই করে এবং তাবৎ কৃতিত্ব দাবি করতে থাকে। ইসলামপন্থিরাই সে আন্দোলনের সূচনা করেছে এবং নেতৃত্ব দিয়েছে, তারা ইতিহাস থেকে ৬০-এর দশক থেকে একেবারেই ছিটকে পড়ে। কমিউনিস্টরা তাদের লোকদের ভাবমর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য ১৯৫২

www.pathagar.org

সালে হাফপ্যান্ট পরত বা স্কুলে পড়াশোনা করত কিংবা ঘটনাক্রমে ভাষা আন্দোলনের মিছিল দেখতে গিয়েছিল অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে সেদিন ক্যাম্পাসে উপস্থিত ছিল, তাদেরকে পর্যন্ত 'ভাষাসৈনিক', 'শব্দসৈনিক' ইত্যাদি নানা বিশেষণে পরিচিত করেছে নতুন প্রজন্মের সামনে। মফস্বল শহরে ছিল, হয়তো-বা কোনো একটা মিছিলে বুঝে হোক বা না বুঝে হোক উপস্থিত ছিল, এমন লোকও টেলিভিশনে ভাষাসৈনিক হিসেবে সাক্ষাৎকার দেয় এবং কৃতিত্ব নিয়ে থাকে। অথচ যারা ১৯৪৮ সাল থেকে এ আন্দোলন করলেন, এজন্য লেখালিখি করলেন, গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করলেন, তাদের কথা বা তাদের নাম মুখে আনা হয় না।

ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা করার কারণে বিক্ষুব্ধ জনতা দৈনিক সংবাদ পত্রিকার অফিস পুড়িয়ে দিয়েছিল। অথচ এই পত্রিকায় সম্পৃক্তদের কেউ কেউ দাবি করে, তারাই নাকি ভাষা আন্দোলনের আসল দাবিদার! আওয়ামী লীগ ১৯৫২ সালে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল; আর কমিউনিস্ট পার্টি তো একটি বিবৃতি দিতেও রাজি হয়নি। অথচ বড়ো নির্লজ্জের মতো এরা ভাষা আন্দোলনের কৃতিত্ব দাবি করে। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, শেখ মুজিবকেও ভাষা আন্দোলনে টেনে এনে 'তিনিই এ আন্দোলনের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন'—এমনসব নির্জলা মিথ্যা প্রচারণা ইদানীং চলছে এবং কিছু ভাড়াটে লোক চোখ বুজে জাতিকে মিথ্যা শোনাচ্ছে। শেখ মুজিব অনেক বড়ো নেতা। কিন্তু শেখ মুজিবকেও ভাষা আন্দোলনের বীর বানানোর তো কোনো প্রয়োজন নেই বা এর কোনো মানেও হয় না। সে সময় তার তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও ছিল না। তিনি তো এমনিতেই অনেক বড়ো নেতা আছেন; অহেতুক ভাষা আন্দোলনের নামে তার ব্যাপারে মিথ্যা কাহিনি রচনার দরকারটা কী?

হিন্দু শাসনকালে বাংলা ভাষা নিষিদ্ধ করে ফরমান জারি করা হয়

বাংলা ভাষার ব্যাপারে আমরা আরও একটু পেছনে গিয়ে যদি অনুসন্ধান চালাই, তাহলে দেখতে পাই—পাকিস্তান আমলে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে আমাদের কয়েকজন ভাইকে তাদের অমূল্য জীবন দিতে হয়েছে। কিন্তু তারও অনেক আগে বাংলা ভাষার ওপর নেমে এসেছিল ইতিহাসের নিকৃষ্টতম জুলুম ও অত্যাচার। হিন্দু রাজাদের শাসনামলে বাংলা ভাষা সম্পর্কে

www.pathagar.org

বলা হতো—‘ওটা ম্লেচ্ছ যবনদের ভাষা, কাক-পক্ষিদের ভাষা।’ বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে সংস্কৃত পণ্ডিতরা ফতোয়া দেয়—‘বাংলা ভাষায় কথা বললে রৌরব নামক নরকে যেতে হবে।’ বাংলা ভাষা ব্যবহার করা দণ্ডনীয় অপরাধ—রাষ্ট্রীয়ভাবে এমন ডিক্রি জারি করা হয়েছিল। এ সংক্রান্ত রেফারেন্স গ্রন্থ হাতের কাছে না থাকায় বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।

আমি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে ফাঁসির সেল (৪০ সেল, কাশিমপুর ২ কেন্দ্রীয় কারাগার) থেকে লিখছি। এখানে বই পাওয়ার উপায় নেই। জেলার সুভাষ কুমার ঘোষকে শুরু থেকেই দেখেছি বইয়ের ব্যাপারে দারুণ কৃপণ। চার-পাঁচটার বেশি বই রাখা যাবে না। এসব কথা তিনি বলতেন, যখন ডিভিশনে ছিলাম সাজা হওয়ার আগে। আর এখন তো এক মাস পর জানালা দিয়ে পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করতে হয়। আমার বাড়িতে অনেক বইয়ের সংগ্রহ আছে। সেখানে যখন যেমন ইচ্ছা বই হাতের কাছে পাওয়া যায় এবং প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। তাই আমার এ লেখায় অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো ভুল কথা এসে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পুরোপুরি স্মৃতিশক্তির ওপর অবলম্বন করে লেখা। আর এ বয়সে স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায় মানুষের। অনেক নাম ও ঘটনার সময় ও সাল ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

(রাত ১১:০০ টা; ৬ আগস্ট, ২০১৩)

www.pathagar.org

ব্রিটিশ শাসনকালেই শুরু হয় রাষ্ট্রভাষা বিতর্ক

উপমহাদেশের ব্রিটিশ শাসন অবসানের প্রাক্কালেই রাষ্ট্রভাষা নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কের সূত্রপাত হয়। স্বাধীন ভারতে উর্দু রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবি করেন বাবা-ই-উর্দু খ্যাত আবদুল হক প্রমুখ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজিকেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। সেই বিতর্কের মধ্যে বাংলার নন্দিত ভাষাবিশেষজ্ঞ, ২২টি ভাষার ওপর যার দখল ছিল, সেই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে এক সেমিনারে বলিষ্ঠ যুক্তিপূর্ণ নিবন্ধ উপস্থাপন করেন। ১৯২১ সালে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী বাংলাকেই রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন করেন। মওলানা আকরম খাঁ *আজাদ* পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় লিখে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন।

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে উদ্যোগ নিলে পাকিস্তানের ৫৬% মানুষের ভাষা বাংলা ভাষাভাষীদের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়। শেষ পর্যন্ত রক্ত দিয়েই বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়—এ প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখ করেছি।

এখন থেকে দুই-তিনশো বছর আগের বাংলা ভাষা ও বর্তমান বাংলা ভাষার পার্থক্য অনেক। চর্যাপদের যে বাংলা, আজকের বাংলার সাথে তার অনেক পার্থক্য। ভাষা একটি গতিশীল ও চলমান বিষয়। মানুষ তার ভাব প্রকাশের জন্য, যোগাযোগের জন্য ভাষা ব্যবহার করে। ভাষা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দান। পৃথিবীর অনেক প্রাচীন ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বিশ্বে চার হাজারের অধিক ভাষা থাকলেও প্রধান ভাষার সংখ্যা তার চেয়ে অনেক কম। সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষ যেসব ভাষায় কথা বলে, তা হলো চীনা ভাষা বা মান্দারিন ভাষা, ইংরেজি, স্প্যানিশ, আরবি, হিন্দি, বাংলা, ফ্রেঞ্চ, উর্দু ইত্যাদি। এরপর আছে জার্মান ভাষা, রুশ ভাষা, ফারসি ভাষা, জাপানি ভাষা, মালয় ভাষা, তুর্কি

www.pathagar.org

ভাষা ইত্যাদি। প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব ভাষা আছে। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয়, বর্তমানে ইংরেজি ভাষা দেশে দেশে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজির অনেকটা একচেটিয়া প্রভাব চলছে এবং যা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা যেসব কারণে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তার অন্যতম শক্তি বা হাতিয়ার হচ্ছে ইংরেজি ভাষা। বাধ্য হয়ে আমাদেরও ইংরেজি ভাষা চর্চা করতে হচ্ছে।

মুসলমান শাসকরাই বাংলার প্রথম পৃষ্ঠপোষক

আমরা আলোচনা করছিলাম বাংলা ভাষার ওপর অতীতকালে নির্যাতন ও নিপীড়ন প্রসঙ্গে। নিপীড়নের কারণে বাংলা ভাষার পণ্ডিতরা দেশছাড়া হয়েছিলেন। অনেকে নেপালের কপিলাবস্তুতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যে কারণে সেখান থেকে প্রাচীন বাংলার অনেক রচনা ও দলিলপত্র উদ্ধার করা হয়। আরেকটি ঐতিহাসিক সত্য উল্লেখ না করলেই নয়, তা হলো—মুসলিম শাসক শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ প্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মুসলিম শাসনকালে বাংলা ভাষার উন্নয়ন অব্যাহত থাকে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভাষা নিয়ে যতটা রাজনীতি হয়েছে, সে তুলনায় বাংলা ভাষার অগ্রগতির জন্য কাজ হয়নি। বাংলা বানান শুদ্ধ করতে বাংলা একাডেমির ২০ বছর লেগে গেল। এখনও বানানের সমস্যা কাটেনি। এই তো মাত্র সেদিন অর্থাৎ স্বাধীনতার ৪০ বছর পর বাংলা একাডেমির উদ্যোগে একটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করা সম্ভব হয়েছে। বাংলা ভাষার অভিধান প্রকাশ ও বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন নিঃসন্দেহে বাংলা একাডেমির প্রশংসনীয় কাজ। তা ছাড়া আমাদের বাংলা ভাষার বরেণ্য কবি-সাহিত্যিকদের রচনাবলি ও রচনাসমগ্র প্রকাশ করেও বাংলা একাডেমি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ভাষা নিয়ে আরও অনেক বেশি কাজ হওয়া উচিত ছিল। অনুবাদ সাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসংক্রান্ত মৌলিক গ্রন্থের অনুবাদ খুবই জরুরি। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় রচিত মৌলিক রচনা ও গ্রন্থাদির বাংলা ভাষায় অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কী কাজটা এ সংস্থা করছে, তা খুব একটা দৃশ্যমান নয়। বিশ্ববরেণ্য কবি, সাহিত্যিক, পণ্ডিত,

www.pathagar.org

আইনবিদ, দার্শনিকদের মৌলিক গ্রন্থাবলির বাংলায় অনুবাদ প্রকাশের কাজ খুব একটা অগ্রসর হয়নি। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

বাংলা ভাষা বিকৃতির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে

বাংলা ভাষার দুটি রীতি আছে—সাধু বাংলা ও চলিত বাংলা। আর সেইসাথে আছে আঞ্চলিক বাংলা। সম্প্রতি ভাষা বিকৃতির যেন একটি প্রতিযোগিতা লক্ষ করা যাচ্ছে। অনেক লেখক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার তাদের রচনায় এমনভাবে আঞ্চলিক বাংলাকে উপস্থাপন করছেন, যা বাংলা ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে ম্লান করে দিতে পারে। সব ভাষাতেই কথ্যরূপ আছে। তবে একটি স্ট্যান্ডার্ড বা মান রক্ষা করে সবাই। বাংলা ভাষার প্রমিত রূপ বা স্ট্যান্ডার্ড বা মান রক্ষার ব্যাপারে যত্নবান না হলে বাংলা ভাষার সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা আছে বলে অনেকে মনে করেন।

উচ্চারণ বিকৃতি ও উচ্চারণ বিভ্রাট আরেকটি ইস্যু। সম্প্রতি কিছু কিছু রেডিও বিশেষ করে এফএম রেডিও যে স্টাইলে বাংলা উচ্চারণ করছে বিনোদন দেওয়ার নামে, তা রীতিমতো উদ্‌বেগজনক। এ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। ভাষা নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান। কিন্তু তাই বলে ভাষাকে যেনতেনভাবে উচ্চারণ করলে তা কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না।

বাঙালি ও বাংলাদেশি বিতর্ক

উল্লেখ না করেই পারা যাচ্ছে না যে, ভাষার বিতর্ক থেকে আমরা বাঙালি নাকি বাংলাদেশি এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছি। একদল প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন যে, ভাষার ভিত্তিতে আমাদের জাতীয়তা এবং বাংলা ভাষার রাষ্ট্র বাংলাদেশ। ভাষা জাতীয়তার একটি উপাদান হতে পারে। পরিচয়ের জন্য ভাষাভিত্তিক পরিবারের ব্যবস্থা মহান সৃষ্টিকর্তাই করে দিয়েছেন। ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও জাতীয়তা গঠিত হলে ইংরেজি ভাষাভাষী হওয়ার ভিত্তিতে ব্রিটেন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা সব এক রাষ্ট্র হওয়া উচিত ছিল। অথবা ভাষার ভিত্তিতে

www.pathagar.org

জাতীয়তা নির্ধারিত হলে তাদের সবাই একই জাতীয় হতে হতো। অর্থাৎ, তাদের জাতীয়তা হওয়া উচিত ছিল ইংলিশ। আসলে কি তা-ই? তাদের জাতীয়তা ব্রিটিশ, আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান বা কানাডিয়ান। অথচ বাংলাদেশে একটি অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ-৬-এ বলা হয়েছে ৬(২)—

> "বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশি হিসেবে পরিচিত হইবেন।"

বিশ্বের আর কোনো দেশে এমনটি আছে বলে আমাদের জানা নেই। পশ্চিম বঙ্গের বাঙালিরা কি জাতি হিসেবে বাঙালি না ভারতীয়? পৃথিবীর আর কোনো দেশে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব ভিন্ন ভিন্ন নেই। বাংলাদেশের জনগণ 'বাংলাদেশি' এবং বাংলাদেশের নাগরিকতাও 'বাংলাদেশি'। জাতীয়তা বা নাগরিকত্ব নির্ণয়ে রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড ও সীমানা জরুরি। বর্তমানে রাষ্ট্র মানেই আধুনিককালের জাতিরাষ্ট্র বা নেশন স্টেট। এই জাতিরাষ্ট্রের ভিত্তিতেই সারা বিশ্বে জাতীয়তা ও নাগরিকতা নির্ধারণ করা হয়। দেশ বা ভূখণ্ডের সাথে জাতীয়তা বা নাগরিকত্ব সম্পৃক্ত। একসাথে এই দুই পর্যায় অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয়; এর প্রয়োগও নেই। যেমন—কেউ যদি বিদেশে যান, তাহলে তার পরিচয় হবে বাংলাদেশি। আমরা কেউ বলি না, আমার জাতীয়তা বাঙালি আর নাগরিকত্ব বাংলাদেশি। ভাষা জাতীয়তা নির্ধারণ করে না; বরং রাষ্ট্র ও ভূখণ্ডই জাতীয়তা নির্ধারণ করে। নিছক সংকীর্ণ রাজনৈতিক কারণে আমরা অনেক হাস্যকর কাজ করছি। যেমন : সম্প্রতি একটি রাজনৈতিক স্লোগান প্রতিদিন উচ্চারণ করা হচ্ছে, তা হলো—'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি'। পৃথিবীর কোনো দেশ কি আছে, যেখানে বলা হয় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ নেপালি বা জাপানি বা আমেরিকান বা ইংরেজ বা চৈনিক?

বাঙালি সংস্কৃতিচর্চার নামে যা হচ্ছে

আমাদের চমৎকার বাংলা সন ও দিনপঞ্জি বা ক্যালেন্ডার থাকা সত্ত্বেও আমরা বাংলা সন-মাস ব্যবহার করি না। আমাদের সবকিছু চলে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি কর্তৃক ষোড়শ শতাব্দীতে প্রবর্তিত গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী।

www.pathagar.org

বাংলা ভাষার জন্য জীবন দিলেন সালাম-বরকতরা ৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮ সালে। বাংলা সনটাও আমরা জানি না। ৮ ফাল্গুন পালনের পরিবর্তে ২১ ফেব্রুয়ারি নিয়েই আমাদের যত আবেগ আর উচ্ছ্বাস।

আমরা হলাম এক দিনের বাঙালি। অর্থাৎ, পহেলা বৈশাখ পালনের দিন রমনা বটমূলে পান্তা-ইলিশ খাওয়ার বাঙালি। অথচ বাংলাদশের শতকরা ৯৯% ভাগ কৃষক-শ্রমিক পান্তা ইলিশ সেদিন খায় না বা কোনোকালেও খায়নি। পহেলা বৈশাখে শহুরে কিছু লোক এটার প্রচলন করেছে। সেদিন তাদের পুরুষরা গায়ে জড়ান বাহারি রকমের পাঞ্জাবি এবং মেয়েরা পরিধান করেন হলুদ শাড়ি। গ্রামবাংলার কৃষকদের বা তাদের মা-বোনদের কপালে এসব জোটে না। চারুকলা নাম দিয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা করা হয় বাঘ, ভল্লুক, বানর বা নানা জানোয়ারের মুখোশ পরিধান করে, যা এ দেশের গ্রামবাংলার মানুষ কোনোকালেই করেনি এবং এখনও করে না। কিছু লোক চারুকলা ইনস্টিটিউট ও রমনা বটমূলকেই বাংলাদেশ বানিয়ে ফেলেছে। আসলেই কি তা বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি?

আমরা অনেকেই অতিরিক্ত বাঙালিপ্রেম দেখানোর জন্য ছেলেমেয়ের নাম রাখছি বাংলায়। তবে বিদেশি নামের ব্যবহারও বাড়ছে সেই হারে। এটা মুসলমানি নাম থেকে সরে এসে কিছুটা আধুনিক হওয়ার হীনম্মন্যতাও বটে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর পরিবারেও যেমন বাংলা ও বিদেশি নামের জয়জয়কার; যেমন—জয়, পুতুল, ববি, রুপান্তি, ক্রিস্টিনা ইত্যাদি। অ্যাফিডেভিট করে তারা যেন নিজেদের সুন্দর নামগুলো আবার বদলে না ফেলেন। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির পরিবারে যেভাবে অবাঙালিতা হানা দিয়েছে বা ঢুকে গিয়েছে, তাতে শেখ মুজিব সাহেব বেঁচে থাকলে তিনি কতটা স্বাচ্ছন্দ্য বা বিব্রত বোধ করতেন, তা বলা কঠিন। আর প্রধানমন্ত্রী নিজে কতটা মানসিক স্বস্তিবোধ করছেন, তা তিনিই একমাত্র বলতে পারবেন।

আমরা এখন বক্তৃতা-বিবৃতিতেই বাঙালি। ইংলিশ স্কুল, ভিনদেশি পোশাক, ফাস্ট ফুড, কফি, হট ডগ, বার্গার, পিৎজা এবং চায়নিজ, ইতালিয়ান ও ইন্ডিয়ান ফুড আমাদের এখন বড়ো পছন্দ। আমরা এখন পশ্চিমাদের মতোই পপ সংগীত, কনসার্ট, ডিসকো নাইটলাইফ পছন্দ করি এবং আমাদের গুলশান, ধানমন্ডি, বনানী, বারিধারা, উত্তরার অধিবাসী বিত্তবানদের সন্তানদের এক বিরাট অংশ পাশ্চাত্য জীবনধারায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে এবং সেদিকে

www.pathagar.org

ধেয়ে চলেছে। ভালোবাসা দিবস, বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড কালচার, লিভ টুগেদার— এসবের চর্চা আজ ব্যাপকহারে দেখা যাচ্ছে। টিভি পর্দার সিনেমা-নাটক, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি এই কড়া বাঙালি জাতীয়তাবাদের জামানায় আমাদের সমাজকে এমনভাবে বদলে দিচ্ছে, যা বাঙালি কোনো দিন কল্পনাও করেনি। এতে কি বাঙালি সংস্কৃতির উন্নতি হচ্ছে? ইদানীং প্রতিবেশী দেশের স্যাটেলাইট চ্যানেলের বদৌলতে আমাদের শিশু-কিশোররা প্রিয় বাংলা ভাষা বাদ দিয়ে হিন্দি ভাষা চর্চায় যথেষ্ট এগিয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে আমাদের অনেক মা উদ্বিগ্ন হলেও বাঙালি সংস্কৃতি ফেরি করে যারা বেড়ান এবং বাঙালি ঐতিহ্যের কথা বলে মুখে ফেনা তুলছেন, গলাবাজি করছেন, সেই মহারথীদের উদ্‌বেগের কোনো লক্ষণ নেই।

বাঙালি সংস্কৃতির নামে আমরা এমনসব কর্মকাণ্ড করছি, যা বাঙালিরা অতীতে কোনো দিন করেনি। বাঙালি সংস্কৃতির নামে আমরা মোমবাতি জ্বালাই, পুষ্পস্তবক অর্পণ করি, এক মিনিট নীরবতা পালন করি। ইদানীং শুরু হয়েছে কফিনের ওপর পুষ্পস্তবক অর্পণ করা বা শহীদ মিনারে লাশ নিয়ে সেখানে সংগীত পরিবেশন করা, শ্রদ্ধা নিবেদন করা, ফুল দেওয়া ইত্যাদি। আর আছে প্রতিকৃতিতে ফুল দেওয়া। ভাস্কর্যের নামে আমরা যত্রতত্র মূর্তি নির্মাণ করছি। পুরাকীর্তি হিসেবে পাওয়া যায় বুদ্ধের মূর্তি অথবা কোনো দেব-দেবীর মূর্তি। কোনো বাঙালি কৃষকের তো কোনো মূর্তি পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, আদিকাল থেকেই বাঙালি এই মূর্তি চর্চা করত না। অথচ বাঙালি সংস্কৃতির নামে এসব চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করলে বা প্রশ্ন উত্থাপন করলে তাকেই বাঙালির শত্রু, স্বাধীনতার শত্রু বলে গালি দেওয়া হচ্ছে।

বাঙালি সংস্কৃতির নামে যেসব বাড়াবাড়ি হচ্ছে এবং অপসংস্কৃতির চর্চা হচ্ছে, তা আমাদের যুবসমাজকে অধার্মিকতা বা ধর্মহীনতার পথে কিংবা পাশ্চাত্য জীবনধারার দিকে *ঠেলে* দিচ্ছে। এসবের কুফল যে ইতোমধ্যে সমাজদেহকে ক্ষতবিক্ষত করছে, তা নিয়ে আমাদের সমাজনেতা ও চিন্তাশীলদের এখনই ভাবার সময়।

(ভোর ৩:০০ টা; ৭ আগস্ট, ২০১৩)

www.pathagar.org

কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে কিছু কথা

সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ার পরপরই ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্য দলে অনুপ্রবেশ করে কাজ করাটা কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম কূটকৌশল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানে যেসব কমিউনিস্ট ছিলেন, তারা ঘাপটি মেরেই ছিলেন। ১৯৪৮ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার পর অনেকেই সেই দলে ঢুকে পড়েন; এমনকি ন্যাপেও ছিল তাদের একচ্ছত্র প্রভাব। সংবাদপত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পেশায় তারা বেশি বেশি অনুপ্রবেশ করেন।

বিগত শতাব্দীর প্রায় পুরো সময়টা ছিল কমিউনিজমের উত্থান-পতনের শতাব্দী। রাশিয়া, চীন, পূর্ব ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত বিপুল সংখ্যায় মানুষ কমিউনিস্ট সরকারের অধীনে শাসিত হয়। ষাট ও সত্তরের দশকে কমিউনিস্ট হওয়াটা প্রগতিশীলতা ও ফ্যাশনে পরিণত হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। লেনিন-মাওসেতুংয়ের নাম অনেকের মুখে মুখে এবং অনেকের ড্রয়িংরুমে মার্ক্স-লেনিনের বই শোভা পাওয়া শুরু হয়। পড়ুক বা না পড়ুক, বুঝুক বা না বুঝুক, অনেকেই ওইসব কমিউনিস্ট বইপুস্তক ড্রয়িংরুম বা তাদের নিজস্ব স্টাডিরুমে রাখতেন। অনেক প্রোপাগান্ডা ম্যাটেরিয়ালস সোভিয়েত দূতাবাস থেকে সরবরাহ করা হতো। সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিজম দীক্ষা দেওয়ার জন্য অসংখ্য ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করেছিল। বিভিন্ন দেশ থেকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য যেসব ছাত্রকে নেওয়া হতো, তাদের মগজধোলাই করে দেওয়া হতো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার সাথে ঠান্ডা লড়াই এবং দুই পরাশক্তির বিশ্বে আমেরিকার সাথে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করে চলেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। কোথাও আমেরিকা হস্তক্ষেপ করলে তার প্রতিপক্ষে দাঁড়াত সোভিয়েত ইউনিয়ন। আবার কোথাও সোভিয়েত ইউনিয়ন হস্তক্ষেপ করলে

www.pathagar.org

সেখানে ছুটে যেত আমেরিকা। বিশ্বরাজনীতিতে এটা একধরনের ভারসাম্য সৃষ্টি করে। কমিউনিজমের পতন ঘটানোর জন্য আমেরিকা উঠেপড়ে লেগেছিল। এটা ছিল এক আদর্শিক লড়াই পুঁজিবাদ বনাম কমিউনিজম।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের সময় মুসলিম রাজ্যগুলোকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার অঙ্গীকার দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। যেমন—আজারবাইজান, কাজাখস্তান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান। এসব অঞ্চলের মুসলমানদের সাথে যে চুক্তি করা হয়েছিল, মস্কোর নেতারা তা রক্ষা করেননি। পক্ষান্তরে নাস্তিক্যবাদের সমর্থক সোভিয়েত কমিউনিস্ট শাসকগোষ্ঠী মুসলিম জনপদগুলোতে মুসলিমদের ওপর হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। কমিউনিস্ট শাসকগোষ্ঠী দ্বারা লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করা হয় এবং মসজিদ-মাদরাসাগুলোকে ধ্বংস করে ক্লাব বা আস্তাবলে পরিণত করা হয়।

'ধর্ম হচ্ছে আফিম'—এই তত্ত্বে বিশ্বাসী কমিউনিস্টরা মূলত ধর্মের বিরুদ্ধে একটি জঘন্য অভিযান চালায়। অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধেও সোভিয়েত কমিউনিস্ট সরকার নির্যাতনের স্টিমরোলার চালিয়েছে। ধর্মকে উচ্ছেদ করে নাস্তিক্যবাদকেই তারা একধরনের ধর্ম বানিয়ে ফেলে। ইরান, সিরিয়া, ইয়েমেন, আলবেনিয়াসহ কয়েকটি আরব দেশেও কমিউনিস্টরা রাজনীতির মূলধারার শক্তিতে পরিণত হয়। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় ছিল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কমিউনিস্ট পার্টি। ইরান ও তুরস্কেও শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে। পাকিস্তান ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশেও কমিউনিস্ট আন্দোলনের ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ করা যায়। সংবাদপত্র ও শিক্ষকতায় কমিউনিস্টরা একটা দৃশ্যমান ভালো অবস্থা সৃষ্টি করে ফেলে।

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রীচুক্তি হয়। আবার বাংলাদেশের ২৫ বছরের নিরাপত্তাচুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা খুবই উৎসাহিত হন। বাংলাদেশের মস্কোপন্থি কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড মনিসিং বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। পাকিস্তান আমলেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রাশিয়াপন্থি ও চীনপন্থি আলাদা দুটি ধারার সৃষ্টি হয়। ফলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্টরা মস্কোপন্থি ও চীনপন্থি এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের ছাত্রসংগঠন পূর্ব পাকিস্তান

www.pathagar.org

ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বে মস্কোপন্থি এবং রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে চীনপন্থি হিসেবে বিভক্ত হয়। মস্কোপন্থিরা ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপ এবং পিকিংপন্থিরা ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপ হিসেবে পরিচিত হয়। এরপর কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক সংগঠন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও দুই ভাগ হয়। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাপ (পিকিংপন্থি) এবং অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বে ন্যাপ (মস্কোপন্থি) গঠিত হয়।

১৯৭১ সালে চীন যেহেতু পাকিস্তানের পক্ষে ছিল, সেহেতু চীনপন্থি দল ও গ্রুপগুলোও পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। মওলানা ভাসানী ভারতে যাওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস সেখানে নজরবন্দি অবস্থায় ছিলেন। যাহোক, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতের পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনের কারণে মস্কোপন্থি কমিউনিস্ট নেতা মনিসিং ও কমরেড ফরহাদদের গুরুত্ব স্বাধীন বাংলাদেশে অনেক বেড়ে যায়। তাদের প্রভাবেই শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব সোভিয়েত স্টাইলে ১৯৭৫ সালে একদলীয় বাকশালী শাসন কায়েম করেন। মস্কোপন্থি নাস্তিক কমিউনিস্টদের দ্বারাই শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক বিপর্যয় হয় এবং যার পরিণতি ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক। এ প্রসঙ্গে আমরা অন্যত্র আলোচনা করব।

কমিউনিস্টদের অবাস্তব অর্থনৈতিক তত্ত্ব, ধর্মের বিনাশ সাধন করে নাস্তিক্যবাদ বিকাশের নীতি ও এই মতবাদের অন্তর্নির্হিত দুর্বলতার পরও পঞ্চাশ ও ষাটের দশক এমনকি সত্তর দশক পর্যন্ত মস্কোপন্থি কমিউনিস্টদের স্বর্ণযুগ ছিল বলা যায়। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সাম্যের স্লোগান দিয়ে বিপ্লব করার পর কমিউনিজম নিজেই রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে পরিণত হয়। মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংগঠন করার স্বাধীনতা খর্ব করে এক জঘন্য কর্তৃত্ববাদী ও ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সর্বময় ক্ষমতার মালিক বনে যান কমিউনিস্ট পার্টির কিছুসংখ্যক নেতা। কমিউনিস্টরা মানবজাতিকে যতটা জিম্মি করে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে, অতীতের রাজা, বাদশাহ ও সম্রাটরাও তেমন স্বেচ্ছাচারীভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে বলে দেখা যায় না। তা ছাড়া কমিউনিস্টদের গোটা ব্যবস্থাটাই মিথ্যা প্রচারণা ও কল্পনা-বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। ফলে যে জনগণ কমিউনিজমকে একসময় দেশে দেশে গণজাগরণের মাধ্যমে স্বাগত জানিয়েছিল, তারাই সময়ের ব্যবধানে কমিউনিজমের পতন ঘটিয়ে দেয়।

www.pathagar.org

নব্বইয়ের দশকে বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট শাসনের পতন শুরু হয় গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। জনগণ লেনিনের মূর্তি ভেঙে চুরমার করে দেয়। এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নও বাইরের কোনো আক্রমণ ছাড়াই ভেঙে গেল। অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণেই চুরমার হয়ে গেল পৌনে এক শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট ব্যবস্থা। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে জন্ম নিল ১৫টি স্বাধীন রাষ্ট্রের। পুনরুজ্জীবিত হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত মুসলিম প্রজাতন্ত্রগুলো। মস্কোতেই সমাহিত হলো কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র।

সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমের এই আত্মহত্যার পর পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলোর জনগণ নেমে এলো রাজপথে। যুগোস্লাভিয়া ভেঙে কয়েকটি রাষ্ট্র হলো। গণতন্ত্রের বিপ্লব ঘটল চেকোস্লাভিয়ায়। ভেঙে গেল বার্লিন প্রাচীর। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি এক হয়ে আবার জার্মানি হলো। রাশিয়া ও চীন সমাজতন্ত্রের কথা বললেও খোলা বাজার বা মুক্ত বাজার অর্থনীতির দিকেই ঝুঁকে পড়ল। সাম্যবাদ ও শ্রেণিহীন সমাজ কায়েমের যে স্লোগানে কমিউনিজম একসময় বিশ্বময় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তা আজ বিলুপ্তপ্রায়।

ইরানের বিপ্লবের নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভকে লেখা এক চিঠিতে বলেছিলেন—

"কমিউনিজমের স্থান এখন জাদুঘরে।"

১৯৪৮ সালেই বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আবুল আ'লা মওদূদী বলছিলেন—

> "একসময় মানুষের তৈরি পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের পতন হবে। ক্রেমলিন ও পেন্টাগনের ইটগুলো একটা একটা করে খসে পড়বে এবং সেদিন খুব বেশি দূরে নয়।"

মিশরের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়্যিদ কুতুব বলেছিলেন—

> "পশ্চিমাদের বিশ্ববাসীকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো আর কিছু নেই। তাদের নেতৃত্বের সময় ফুরিয়ে এসেছে এবং বিশ্ব নতুন নেতৃত্ব চায়।"

তুরস্কের আধ্যাত্মিক নেতা বদিউজ্জামান নুরসিও একই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। বিশ্ব কাঁপানো সমাজতন্ত্রের আত্মহত্যা ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির ব্যর্থতা বিশ্বকে তো আরেকটা পরিবর্তনের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.org

যাহোক, আমরা কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রের কথা আলোচনা করছিলাম। পরিস্থিতি গুরুতর দেখে কমিউনিস্টরা তাদের রূপ রাতারাতি বদলে ফেলে। যে কমিউনিস্টরা গণতন্ত্রকে বুর্জোয়াদের ব্যবস্থা এবং পার্লামেন্টকে আখ্যায়িত করেছিল শুয়োরের খোঁয়াড় বলে, সেই কমিউনিস্টরা এখন গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে গলা ফাটায়। 'শ্রেণিশত্রু খতম করো, বুর্জোয়া নিপাত করো' স্লোগান দিয়ে যারা বাংলাদেশসহ উপমহাদেশে দিব্যি গলাকাটা রাজনীতি করে মানুষ খুন করেছে, তারাও এখন গণতন্ত্রী বনে গেছে।

কমিউনিস্ট পার্টি, মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট ও কোনো বামপন্থি দল কোথাও নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে পারেনি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো অন্যদলের লেজুড়বৃত্তিই করেছে বরাবর। তবে পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতিবাবুর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি একনাগাড়ে প্রায় ৩৪ বছর ক্ষমতায় ছিল, যা বিশ্বকে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো। এখানে জ্যোতিবাবুর ক্ষমতার স্থানে ভিন্ন ধরনের কৌশল গঠন করে দলীয় মাস্তানবাহিনীদের দিয়েই নির্বাচনী কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ করে পরপর নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিল এবং পেছনে থাকা রাষ্ট্রীয় শক্তির মদদ এ ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল। তবে পশ্চিমবঙ্গেও কমিউনিস্টদের এ দুর্গের পতন ঘটেছে। খাঁটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র বলতে এখন একমাত্র কিউবাকেই গণ্য করা যায়। কিন্তু কিউবায় সংশয়ের ঢেউ নেমেছে। বিশ্বনন্দিত কমিউনিস্ট নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর ভাই রাউল ক্যাস্ট্রোর পর কিউবায় বর্তমান চেহারা থাকবে বলে মনে হয় না।

সমাজতন্ত্র-উত্তর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে রাশিয়াসহ যে ১৫টি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে, সেসব দেশে ও পূর্ব ইউরোপের সাবেক কমিউনিস্ট দেশগুলোতে যেভাবে ইসলাম ও খ্রিষ্টবাদের চর্চা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা খুবই লক্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ। বিগত ১৫-২০ বছরে সেসব দেশে হাজার হাজার চার্চ ও মসজিদ-মাদরাসা গড়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হচ্ছে। মাত্র কয়েক দিন আগে বিবিসির বাংলা অনুষ্ঠানে ইউরোপের অত্যন্ত দরিদ্র দেশ রোমানিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে। সেই প্রতিবেদনে বিবিসি সংবাদদাতা বলেছেন, দেশটিতে বিগত কয়েক বছরে হাজার হাজার অর্থোডক্স চার্চ নির্মিত হয়েছে এবং আরও হাজার হাজার চার্চ নির্মাণের কাজ চলছে। রোমানিয়ায় রাজধানীতে এক বিশাল দৃষ্টিনন্দন অর্থোডক্স চার্চ নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে।

www.pathagar.org

অর্থনৈতিক সংকটাপন্ন রোমানিয়ায় রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে খরচ করে এমন চার্চ নির্মাণের কী যৌক্তিকতা আছে, তা নিয়ে প্রশ্ন করায় রোমানিয়ার ধর্মমন্ত্রী বললেন—'চমেস্কুর শাসনামলে ৪০ বছর যাবৎ রোমানিয়ায় নাস্তিক্যবাদের চর্চা চলে। নাস্তিক কমিউনিস্টরা ধর্মের বিরোধিতা করে হাজার হাজার চার্চ ধ্বংস করেছে। বর্তমান সরকার নতুন চার্চ নির্মাণ করে আসলে জনগণের ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে। মূলত নাস্তিকরা চার্চের অনেক সম্পত্তি দখল করেছিল, বর্তমান সরকার চার্চের সেসব সম্পদ ফেরত দিচ্ছে মাত্র।' এ চিত্র শুধু রোমানিয়াতে নয়; বরং গোটা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অবস্থা অভিন্ন।

এরপরও কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রের আবেদন যে একেবারে ফুরিয়ে গেছে, তা বলা যাবে না। পুঁজিবাদী পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বাসঘাতকতামূলক দ্বিমুখী নীতি, অর্থনৈতিক শোষণ ও নির্যাতনের অবসান না হওয়া পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের প্রতি কিছুটা মোহ থেকেই যাবে।

সম্প্রতি নেপাল ও প্রতিবেশী দেশ ভারতে মাওবাদীদের যে উত্থান লক্ষ করা যাচ্ছে, তার কারণও বৈষম্যমূলক শাসন। গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে চলে আসার পর নেপালে মাওবাদীদের রাজনীতিতে পরিবর্তন এসেছে। ভারতের উন্নয়ন যেহেতু বৈষম্যমূলক, তাই সেখানে একদিকে যেমন টাটা, বিড়লা ও গোয়েঙ্কাদের মতো বড়ো পুঁজিপতির বিকাশ ঘটেছে, আবার কোটি কোটি মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করছে। মুম্বাইকে ধরা যায় ভারতীয় উন্নয়নের মডেল। একদিকে ঘিঞ্জি বস্তি এবং অন্যদিকে আম্বানিদের বিশাল বিশাল অট্টালিকা। শিল্পায়ন ও দারিদ্র্য যেন হাত ধরাধরি করে চলছে।

ভারতে প্রতি বছর গড়ে ৮ লাখেরও বেশি কৃষক আত্মহত্যা করে। এসব নানা কারণেই ভারতের রাজনীতিতে আঞ্চলিকভাবে অনেক সমাজতান্ত্রিক দল বা কমিউনিস্ট দল গড়ে উঠেছে এবং তারা গণতান্ত্রিক রাজনীতির কাঠামোর মধ্যেই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। জওহরলাল নেহেরু নিজেও মস্কোপন্থি সমাজতান্ত্রিক নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। কংগ্রেসের অনেক নেতারই সেদিকে টান ছিল বা আছে। কিন্তু বাস্তবতা বলে কথা। ভারতকে খোলা বাজার বা মুক্ত বাজার অর্থনীতির পথেই হাঁটতে হয়েছে। যদিও-বা এক্ষেত্রে ভারতীয় নেতারা রক্ষণশীল নীতি অনুসরণ করে দেশীয় শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে ভালো অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

www.pathagar.org

সন্দেহাতীতভাবে এ কথা বলা যায় যে, কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রের যৌবন আর ফিরে আসবে না। শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে শ্রেণিহীন সমাজ কায়েমের স্বপ্ন শেষ হয়ে গিয়েছে। মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাওসেতুং, ফিদেল ক্যাস্ট্রো ও চে গুয়েভারারা এখন ইতিহাসের অংশ হয়ে জাদুঘরে আশ্রয় নিয়েছেন। সন্দেহ নেই, সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট আন্দোলনে অনেক সংগ্রামী মানুষ নিঃস্বার্থভাবে আত্মোৎসর্গ করেছেন। মরীচিকার পেছনে ঘুরেছেন তারা। সত্যের সন্ধান পাননি বা সত্যের কাছে পৌঁছাতে পারেননি। এর অর্থ অবশ্য এটা নয় যে, পুঁজিবাদীরা সত্যের সন্ধান পেয়েছে বা সত্যের কাছে পৌঁছে গিয়েছে; বরং এরা উভয়ই বিপথগামী।

ধর্মকে আফিম বলে যারা বিভ্রান্তি ছড়াত, সেই কমিউনিস্টদের যখন দেখি টুপি মাথায় ইফতার মাহফিলে, জানাযায় বা মিলাদে অথবা গণতন্ত্রের কথা বলে গলা ফাটাতে, তখন বিস্মিত হই না। কারণ, ওদের যাওয়ার আর কোনো জায়গা নেই। পার্লামেন্টকে শুয়োরের খোঁয়াড় বলত তারা, অথচ এখন নিজেদের হাতুড়ি-কাস্তে ত্যাগ করে নীতি-আদর্শ বিসর্জন দিয়ে অন্যের নৌকায় ওঠার জন্য তাদের কী প্রাণান্তকর প্রতিযোগিতা! যাদেরকে তারা অতীতে সিআইয়ের দালাল বলত, অথবা যাদের চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাতে চাইত বা জাতির পিতা না জুতার ফিতা বলে ব্যঙ্গ করত, তাদের প্রশংসায় তারা এখন পঞ্চমুখ। যে দলকে বুর্জোয়া দল বলে চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করত, এখন সেই দলকে পূজা করছে কমিউনিস্টরা। আর সেই দলের নেত্রীকে যে কত বিশেষণে বিশেষিত করছে এবং জাতির মুক্তিদাতা বা ত্রাণকর্তা হিসেবে উপস্থাপন করছে!

আমাদের জীবদ্দশায় কমিউনিস্টদের এমন রংবদল ও ডিগবাজি দেখব, তা কল্পনাও করিনি। কমিউনিস্টরা পুরোপুরি হতাশ; এমনকি এদের একজন আরেকজনকে বিশ্বাস করে না। এরা ভুল তত্ত্ব দিয়ে এ দেশের অনেক প্রতিভাবান ছাত্র-যুবককে বিপথগামী করেছে এবং কমিউনিজম নামক মরীচিকার পেছনে দৌড়িয়ে অনেকের আমও গেছে, ছালাও গেছে।

আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথেই বলতে পারি, কমিউনিস্টদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই এবং আশা করা যায়, এরা মানুষকে শয়তানের প্রতিনিধি হিসেবে আর বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

www.pathagar.org

ছাত্র আন্দোলন : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে অনেক কথা, অনেক গৌরব, অনেক অহংকার ও অনেক আবেগ জড়িয়ে আছে। ছাত্র আন্দোলন প্রসঙ্গটিকে খুব বেশি আবেগময় ও স্পর্শকাতর করে ফেলা হয়েছে। এ সম্পর্কে কোনো বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা বা মন্তব্য অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ। উপমহাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে যে ছাত্র আন্দোলন ছিল, তাতে দেখা যায় মেধাবী ছাত্রদের নেতৃত্ব ও দেশপ্রেমের টান। সে সময় ছাত্রসংগঠনগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গসংগঠন হিসেবে কাজ করত না।

১৯৪৮ সালে মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হয় ছাত্রনেতা নাইম উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে। ১৯৫৭ সালে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে নাম হলো ছাত্রলীগ। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ নাম বদলে হয়ে হলো পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ। মুসলিম শব্দ বাদ দেওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন শেখ মুজিব। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো—বর্তমান ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনের সময় বা অন্য কোনো সময় এ কথা কখনোই বলে না যে, তাদের পূর্বনাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। এমনকি আওয়ামী ধারার বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকরাও মুসলিম ছাত্রলীগের নাম উচ্চারণ করেন না।

পঞ্চাশের দশকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত হয় কমিউনিস্টদের উদ্যোগে। বাংলায় ষাটের দশকে এনএমএফ, ইসলামী ছাত্রশক্তি ও ইসলামী ছাত্রসংঘ নামের ছাত্রসংগঠনগুলো কার্যক্রম শুরু করে। তবে ছাত্রলীগ সবচেয়ে বড়ো ছাত্রসংগঠন ছিল। আইয়ুব খানের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হয়েছিল এনএমএফ। প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক তৎপরতা থাকলেও সরকারি আনুকূল্যে এই সংগঠনও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সক্রিয় ছিল। ছাত্র ইউনিয়নও পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান প্রধান জেলাশহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। তমদ্দুন মজলিসের অনুপ্রেরণায় ছাত্রশক্তিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ তৎপর ছিল। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ইসলামী ছাত্রসংঘ জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে সংগঠিত হয়। পাকিস্তান আমলে উত্তরবঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংঘ বেশ প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ নির্বাচনেও ভালো অবস্থানে চলে আসে ছাত্রসংঘ। আসলে উত্তরবঙ্গের সিরাজগঞ্জ কলেজ থেকেই ছাত্রসংঘের যাত্রা শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শীর্ষস্থানে ছিল ছাত্রলীগ;

www.pathagar.org

এরপর পর্যায়ক্রমে ছিল ছাত্র ইউনিয়ন, এনএমএফ ও ছাত্রসংঘের অবস্থান। সারা দেশব্যাপী মাদরাসা ছাত্রদের একক সংগঠন ছিল তালাবায়ে আরাবিয়া। ঢাকা আলিয়া মাদরাসাই ছিল এই সংগঠনের প্রধান কেন্দ্রস্থল।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আগে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও মাওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। এই নির্বাচন ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম নির্বাচন। তবে কেবল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানেই এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগ সরকারের ব্যর্থতা, গণবিরোধী নীতি, ক্ষমতা নিয়ে হানাহানির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে গোটা পূর্ব পাকিস্তান যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানায়। মুসলিম লীগের বাঘা বাঘা নেতারা যুক্তফ্রন্টের তরুণ নেতাদের কাছে হেরে যান। ১৬৭টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসনে জয়লাভ করে। হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর যুক্তফ্রন্ট বলেই যুক্তফ্রন্টের পরিচয় হয়। এই নির্বাচনে নেজামে ইসলাম পার্টির একটি বড়ো ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও মাওলানা আতাহার আলীর নামটা তলে পড়ে যায়। অথচ এই নির্বাচনে নেজামে ইসলাম পার্টি ৩৮টি আসনে জয়লাভ করেছিল।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করার পর শুরু হয় কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র। একটার পর একটা সরকার গঠিত হতে থাকে আর সরকারের পতন হতে থাকে। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার পতনের পর আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কেন্দ্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের কোয়ালিশন সরকার ১৪ মাস ক্ষমতায় ছিল। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ২১ মাস সরকার পরিচালিত হয়। এ সময় বয়সে তরুণ হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েছিলেন। তিনি শিক্ষা ও দুর্নীতি দমনবিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন। এখানে একটি ঐতিহাসিক সত্য উল্লেখ করা নেহায়েত প্রয়োজন। যখন যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় এবং যুক্তফ্রন্টের মধ্যে অনেক সুবিধাবাদী রাজনীতিক ঢুকে পড়ে, সে পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমান দল বদলকারী নেতাদের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু এদিকে তার নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ও মওলানা ভাসানীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের ঘোষণা দেওয়ায় তিনি মতপার্থক্য সত্ত্বেও

www.pathagar.org

তা মেনে নেন। এ কথা শেখ সাহেব তার *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*-তে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মজার বিষয় হলো—এখন আওয়ামী লীগ প্রচার করে থাকে যে, শেখ মুজিব যুক্তফ্রন্ট গঠনের অন্যতম নেতা ছিলেন। জেনে হোক না জেনে হোক, আওয়ামী ঘরানার অনেক বুদ্ধিজীবী এখন বলে থাকেন, অন্যান্য নেতাদের সাথে নিয়ে শেখ সাহেব যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। শেখ মুজিব জীবিত থাকলে তিনি এসব প্রচারণায় খুবই বিব্রত হতেন বলে আমার ধারণা।

শেখ মুজিব তার রাজনৈতিক জীবনের আদর্শ হিসেবে সর্বদা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুসরণ করতেন। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রতিও তার ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। তার লেখা *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* এ কথার সাক্ষী। কোথাও তিনি জিন্নাহ সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক উক্তি করেননি। ভিন্ন দল করলেও শেরেবাংলার প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। মওলানা ভাসানীকে তিনি আমৃত্যু সম্মান করে গিয়েছেন। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*-তে তিনি উল্লেখ করেছেন, তার প্রচেষ্টায় গোপালগঞ্জে 'মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ কলেজ' নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অতি উৎসাহী লোকেরা পরে এ কলেজের নাম বদলে দিয়েছে। পরে তিনি কীভাবে জিন্নাহ এভিনিউয়ের নাম পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ রাখা অনুমোদন করেছিলেন, তা আমার জানা নেই।

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের জন্য সংবিধান রচনা করেছিল যুক্তফ্রন্ট। কিন্তু এই সংবিধান ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক আইন জারির ফলে কার্যকর হতে পারেনি। আওয়ামী মুসলিম লীগ তথা আওয়ামী লীগ যখন কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় ছিল, তখন এক ইউনিট প্রথা চালু করা হয় এবং আওয়ামী লীগ দাবি করে যে, ৯৮% স্বায়ত্তশাসন বাস্তবায়িত হয়েছে। যদিও-বা এ দাবির তেমন কোনো ভিত্তি ছিল না।

১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন বেগবান হয়। তখনকার প্রধান দাবি ছিল—জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে যে শোষণ করা হচ্ছে, তার অবসান করা। এ সময় প্রথমে আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, পিডিপি-এর সমন্বয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক মুভমেন্ট (পিডিএম)। পরে এই জোটে দুই ন্যাপ ও নেজামে ইসলাম পার্টি যোগ দেয়। তারা যোগ দেওয়ার পর গঠিত হয় ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি (ডাক)।

www.pathagar.org

পূর্ব পাকিস্তানের সকল দলই স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ছিল এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। তবে আওয়ামী লীগ ১৯৬৬ সালেই আলাদাভাবে ৬ দফা দাবি উত্থাপন করে। ৬ দফার কোনো কোনো দফা নিয়ে কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের ভিন্নমত ছিল। সেসব দল মনে করত, ৬ দফা হুবহু বাস্তবায়িত হলে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ভেঙে যাবে। ওই সময়ের প্রায় সকল নেতাই শেখ মুজিবসহ পাকিস্তান আন্দোলনে যেহেতু প্রত্যক্ষভাবে শামিল ছিলেন, তাই তাদের কাছে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নটি আবেগের সাথে জড়িত ছিল। শেখ সাহেব নিজেও বারবার এ কথা বলেছেন যে, ৬ দফা পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করবে না; বরং শক্তিশালী করবে।

এমনই এক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক আন্দোলন যখন বেগবান হয়, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের নেতৃত্বে গঠিত সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ বিরাট বিপ্লবী ভূমিকা রাখে। তারা ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে এবং এর মধ্যে ৬ দফাও সম্পৃক্ত ছিল। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও এনএসএফের একটি অংশ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সাথে ছিল। আদর্শিক মতপার্থক্যের কারণে অথবা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদে স্থান না হওয়ার কারণে ইসলামী ছাত্রসংঘ, ইসলামী ছাত্রশক্তি ও তালাবায়ে আরাবিয়ার নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং তারা ৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। প্রধানত ছাত্র ইউনিয়নের কারণে সমাজতন্ত্র ১১ দফায় সংযুক্ত হওয়ার কারণেই ইসলামপন্থি ছাত্ররা সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচির সাথে একমত হতে পারেননি।

আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠল, তখন ৮ দলের সমন্বয়ে গঠিত ডাক (DAC) আর কার্যকর ছিল না। একক নেতৃত্ব চলে আসে আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবের হাতে। এমনকি ডাকের একটি সভায় আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোনো দলের নেতাকে মঞ্চেই উঠতে দেননি ছাত্রনেতারা।

ছাত্র আন্দোলনের আলোচনার মাঝখানে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা দাবিতে নির্বাচন ও পরবর্তী রাজনীতি, পিডিএম ও ডাকের আন্দোলন ইত্যাদি এজন্যই উল্লেখ করা হলো, ১৯৬৯-এ এসে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব কার্যত ছাত্র আন্দোলনের হাতে চলে যায়। সামরিক শাসক আইয়ুব খান এ আন্দোলনের ফলে বিদায় নিতে বাধ্য হন। এ কারণেই এ দেশের ছাত্র

www.pathagar.org

আন্দোলনের ইতিহাস এত গৌরবময়। ১৯৫২ সালের আন্দোলনও ছাত্রদের নেতৃত্বেই পরিচালিত; যদিও সে সময় কোনো বিশেষ ছাত্রসংগঠনের ভূমিকা ছিল না। তাই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন ও ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্রসমাজের ভূমিকা গৌরবময়।

ছাত্ররা যেহেতু সমাজের সবচেয়ে সচেতন অংশ, তাই সামরিক শাসন ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে তাদের ভূমিকাও ছিল গৌরবময় এবং এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা। ১৯৪৭-এর আগে এবং বাংলাদেশে ১৯৭১ পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলনের শক্তিশালী ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা সবাই স্বীকার করবেন। পাকিস্তান আমলে জাতীয়তাবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও ইসলামী এই তিন ধারায় ছাত্রসংগঠন ছিল। মুসলিম ছাত্রলীগ (পরবর্তীকালে ছাত্রলীগ) ছিল জাতীয়তাবাদী ধারার, পূর্বপাক ছাত্র ইউনিয়ন ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ছিল সমাজতান্ত্রিক ধারা এবং ইসলামী ছাত্রসংঘ, ইসলামী ছাত্রশক্তি ও তালাবায়ে আরাবিয়া ছিল ইসলামী ধারার ছাত্রসংগঠন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ছাত্রলীগ ভেঙে জাসদ ছাত্রলীগ গঠিত হওয়ায় দুটি ছাত্রলীগ হয়ে যায় এবং ছাত্রলীগের প্রতিভাবান ও মেধাবী অংশটাই জাসদ ছাত্রলীগে যোগদান করে। অপরটি ছিল মুজিববাদী ছাত্রলীগ। আর এই দলটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল হয়ে যায়। বাংলাদেশে প্রথম ছাত্রসংসদ নির্বাচনে মস্কোপন্থি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ডাকসুতে বিজয় লাভ করে। তারপর সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল ডাকসুতে বিজয় লাভ করে। ডাকসুর সর্বশেষ ভিপি ছিলেন আমানুল্লাহ আমান এবং এরপর বিগত ২২ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের নির্বাচন হয়নি।

এই উপমহাদেশে যারা রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তারা কেউ ছাত্রসংগঠনের নেতা ছিলেন না। এমনকি শেখ মুজিবুর রহমানও সেই অর্থে কোনো বড়ো মানের ছাত্রনেতা ছিলেন না। ফজলুল হক চৌধুরী, শাহ আজিজ, শামসুল হুদা চৌধুরী প্রমুখ শেখ মুজিবের চেয়ে বড়ো ছাত্রনেতা ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনে যারা ছাত্রদের নেতৃত্ব দিয়েছেন, পরবর্তী সময়ে তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যুক্ত হয়ে এমপি, মন্ত্রী হয়েছেন বা বড়ো সরকারি আমলা হয়েছেন। কিন্তু একেবারে জাতীয় শীর্ষপর্যায়ে কেউ নেতৃত্বে আসেননি। বরং গোটা উপমহাদেশে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও পরিবারকেন্দ্রিক রাজনীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সহসা অসাধারণ প্রতিভাধর কোনো ছাত্রনেতা দেশের

www.pathagar.org

প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন—এমন কথা বলা কঠিন। এমনকি দলের প্রধান নেতা হবেন, এমন সম্ভাবনাও ক্ষীণ। বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে ব্যক্তিতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে রাজনীতির প্রধান ধারা সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামপন্থি ও কমিউনিস্টদের সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির ধারা বাংলাদেশের রাজনীতির মূলধারায় প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি।

উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা বাংলাদেশে যে ছাত্ররাজনীতি পেয়েছি, তাতেও জাতীয়তাবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও ইসলামী ধারা বিদ্যমান ছিল। জনগণের সেন্টিমেন্ট, আত্মমর্যাদাবোধ ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি বিদ্বেষী অল্প কিছু নাস্তিক ও ধর্মবিরোধী কমিউনিস্টদের প্ররোচনায় দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ একটা ইসলামবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করায় জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টি হতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক থেকে কুরআনের আয়াত মুছে ফেলা, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও ফজলুল হক মুসলিম হলের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দেওয়া, জিন্নাহ হলের নাম পরিবর্তন করে 'সূর্যসেন হল' নামকরণ, ইসলামিয়া কলেজকে প্রথমে 'কবি নজরুল ইসলাম কলেজ' এবং তারপরে ইসলাম বাদ দিয়ে শুধু 'কবি নজরুল কলেজ' নামকরণ, জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়' নামকরণ ইত্যাদি এই ক্ষোভকেই বৃদ্ধি করে।

আওয়ামী লীগের এসব পদক্ষেপের ব্যাপারে সাধারণ ছাত্রদের মাঝে সন্দেহ-সংশয় দেখা দিলো। ইসলামী দলগুলো নিষিদ্ধ করা এবং দেশের পীর-মাশায়েখ ও আলেমদের জেলে বন্দি করার কারণেও সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অতি উৎসাহী কিছু লোক রেডিও ও টিভিতে কুরআন তিলাওয়াত ও ইসলামী ধরনের অনুষ্ঠানাদি বন্ধ করে দেয়। 'জিন্দাবাদ' বর্জন করে 'জয় বাংলা' স্লোগান নিয়েও খুব বেশি বাড়াবাড়ি শুরু হয়ে যায়। দেখাসাক্ষাতে সালামের পরিবর্তে কিছু কিছু লোক 'জয় বাংলা' বলা শুরু করে। এর পাশাপাশি বেনামাজি ও ধর্মবিরোধী বলে পরিচিত লোকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায় এবং কিছু প্রগতিশীলতার নামধারী লেখক-কবি-সাহিত্যিক ইসলামের বিরুদ্ধে লেখালিখি শুরু করেন।

দাউদ হায়দার নামক একজন কবি আল্লাহর রাসূল সা.-এর মায়ের নামে এক জঘন্য গালি দিয়ে কবিতা রচনা করে—যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।

www.pathagar.org

একটি পত্রিকায় কবিতাটি ছাপা হওয়ায় পর সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই সাধারণ ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। যে বিক্ষোভ ছিল বিশাল এবং তা দেশের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে। সরকার বাধ্য হয়ে দাউদ হায়দারকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠায়। আল্লাহর নবি সা.-এর মাকে গালি দিয়ে কবিতা লিখেছে জানতে পারায় কারাগারের বন্দিরা তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে। কারাগারেও তাকে নিরাপত্তা দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই সরকার তাকে কারাগার থেকে বের করে বাংলাদেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। আজও পর্যন্ত সেই কবি দেশে ফিরে আসতে পারেনি।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ সময় ছাত্রদের বা যুবকদের এক বিরাট অংশের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অনেকের হাতে অস্ত্র ছিল। দেশে অভাব ও বেকারত্ব ছড়িয়ে পড়ে চরম আকারে। তারা জড়িয়ে পড়ে হাইজ্যাক ও ছিনতাইয়ের মতো ব্যাপক অপরাধে। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের গোলকধাঁধায় পড়ে ছাত্রদের মধ্যে আদর্শিক বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হয়। এমন একটি পরিস্থিতিতে আমরা কিছু ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। নিজের চরিত্র গঠন, নামাজ পড়া, কুরআন শিক্ষা ইত্যাদি কাজে ছাত্রদের উৎসাহিত করার চিন্তা করা হলো। কাজ শুরু হলে বেশ সাড়া পাওয়া গেল এবং হলের মসজিদগুলোতে মুসল্লিসংখ্যা বাড়তে শুরু হলো। তখন আমাদের মধ্য থেকে কিছু ছাত্রবন্ধু 'ছাত্র ইসলামী মিশন' নামে একটি সংগঠন করলেন। এটা ছিল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন। এই সংগঠন বেশ ভালো সাড়া লাভ করে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস খুবই রাজনীতি-সচেতন হওয়ায় ১৯৭৭ সালের প্রথম দিকেই আমরা কিছু বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নিই সরাসরি ইসলামের নামে একটি সংগঠন করার। দেশের পরিস্থিতির কারণে শতকরা ৯০% মুসলমানের এই দেশটিতে ইসলামের অনুকূলে যেন একটি সাড়া দেখা গিয়েছিল।

১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে ইসলামী ছাত্রশিবির নামক সংগঠনের ঘোষণা দেওয়া হলো। এতে আশাতীত সাড়া পাওয়া গেল। অতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে *সংগঠনের আহ্বান* ও *মুক্তির পয়গাম* নামক দুটি পুস্তিকা ছাত্রদের মাঝে ব্যাপক চাহিদার সৃষ্টি করল। সারা দেশে সংগঠনের শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে পড়ল। এভাবেই জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক ধারার পাশাপাশি ইসলামী ধারারও সূচনা হয়ে গেল বাংলাদেশে।

www.pathagar.org

পাকিস্তান ইসলামের নামে অর্জিত হলেও বিশেষ করে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার ছাত্রসংগঠনই বেশি প্রাধান্য লাভ করেছিল বা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

আইয়ুব খানের সময় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন (এনএসএফ) নামে একটি সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক তৎপরতা চালায়। তবে ছাত্রদের সাধারণ প্রবণতা সরকারবিরোধী হওয়ায় এনএসএফ খুব একটা ভালো অবস্থান তৈরি করতে পারেনি। এ আর ইউসুফ, আবদুল হাসনাত, জমির আলী, ফিরোজ খান, একে আজাদ চৌধুরী, ইব্রাহিম খলিল প্রমুখ অনেকেই এনএসএফের সাথে জড়িত ছিলেন। এ আর ইউসুফ তো এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদেরই একজন। তবে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এনএসএফের আর কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

আমার জানামতে, মুসলিম লীগ নেতা মরহুম খান এ সবুর খান অনেক চেষ্টা করেছেন একটি ছাত্রসংগঠন প্রতিষ্ঠা করার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই চেষ্টা সফল হয়নি। ১৯৭৭ সালে জাসদ ছাত্রলীগের অবস্থানই ছিল ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চে।

১৯৭৫ সালে একদলীয় বাকশালী শাসন চালু করার পর সকল ছাত্রসংগঠন বিলুপ্ত করে জাতীয় ছাত্রলীগ গঠন করা হয়। শেখ সাহেবের ভাগ্নে শেখ শহীদুল ইসলাম ছিলেন তখন মুজিববাদী ছাত্রলীগের নেতা এবং তাকেই জাতীয় ছাত্রলীগের সভাপতি করা হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। আমিও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র ছিলাম। একদিন আমাদের দেখা হয়ে গেল। মূলত আমাদের সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগের পক্ষ থেকে শেখ শহীদকে জাতীয় ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছিল। সেই সংবর্ধনা সভায় শিক্ষকদের পক্ষ থেকে কেউ কেউ বক্তব্য রাখেন। শেখ শহীদ তার বক্তব্য রাখেন এবং সবার সহযোগিতা কামনা করেন। বিভাগের ছাত্রদের মধ্য থেকে কেউ বক্তব্য রেখেছেন বলে আমার মনে পড়ে না। অনুষ্ঠানটি ছিল খুব সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বর। আমাদের শ্রেণিকক্ষেই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের সাথে পড়ত আরেফিনও (বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি); সেদিন আরেফিনও উপস্থিত ছিল। আমি প্রথম সারিতেই বসেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই একদিনই শেখ শহীদের সাথে আমার দেখা হয়।

www.pathagar.org

পরবর্তীকালে শেখ শহীদ আওয়ামী লীগের রাজনীতি ছেড়ে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন এবং সাধারণ সম্পাদক হন। তখন অবশ্য অনেক অনুষ্ঠানে তার সাথে দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হয়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে দেশ গড়ার জন্য যে ধরনের ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠা উচিত ছিল এবং ছাত্রসংগঠনগুলোর কর্মসূচিতে ছাত্রদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের জন্য গঠনমূলক কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজন ছিল, তা হয়ে ওঠেনি। মুজিববাদী ছাত্রলীগের নেতার নামে স্লোগান, মস্কোপন্থি ছাত্র ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রের স্লোগান, জাসদপন্থি ছাত্রলীগের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের স্লোগান ইত্যাদি ছাড়া এসব ছাত্রসংগঠনের ছাত্রদের সমস্যা সমাধানে এবং তাদের মেধাবিকাশে কোনো দৃষ্টিপাত ছিল না।

জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর যখন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গঠন করেন, তখন অবশ্য তিনি ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণমূলক কিছু কর্মসূচি দিয়েছিলেন। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, স্বনির্ভর অর্থনীতি, কৃষিজ ও গ্রামীণ উন্নয়ন, খালকাটা, ১৯ দফা কর্মসূচি, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং দেশ গড়ার ব্যাপারে ছাত্রসমাজের দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্রদের মাঝে চেতনা সৃষ্টির প্রয়াস চালান। কিন্তু বাস্তবতা হলো—প্রায় সব ছাত্রসংগঠনই রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় আরোহণের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। তাদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায় শুধু রাজনীতি আর দলপ্রীতি এবং নেতানেত্রীর নামে স্লোগান দেওয়া, দলের সভা-সমাবেশ সফল করা এবং রাজনৈতিক দলকে সাহায্য করা।

অতিরিক্ত রাজনীতিপ্রবণতার কারণে ছাত্রসংগঠনগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর পুরো নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। আর ছাত্রসংগঠনের নেতা মনোনীত হতে থাকে রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের সরাসরি হস্তক্ষেপে; ছাত্রদের স্বতন্ত্র কোনো নির্বাচনপ্রক্রিয়া অনুসৃত হচ্ছিল না। ক্রমান্বয়ে ছাত্রসংগঠনের নেতৃত্ব প্রথমে অছাত্র পরে অস্ত্রধারী ক্যাডারদের হাতে চলে যায়। রাজনৈতিক দল ও ছাত্রসংগঠন পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য রাজনৈতিক নেতারা অর্থ ও অস্ত্র ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ছাত্রসংগঠনের অভ্যন্তরে নিজস্ব গ্রুপ তৈরি করতে থাকে। সুস্থ রাজনীতি চর্চার পরিবর্তে শক্তিপ্রয়োগে প্রতিপক্ষকে দমন, প্রতিযোগিতার পরিবর্তে বৈরিতা, সংলাপ,

www.pathagar.org

সমঝোতা ও গণতান্ত্রিক সহনশীলতার পরিবর্তে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার চর্চা শুরু হয়। রাজনৈতিক অঙ্গনে সুস্থ ধারার পরিবর্তে গণতন্ত্র দমন ও প্রতিপক্ষ দমনের অগণতান্ত্রিক কালচারের প্রভাব ছাত্র অঙ্গনকেও কলুষিত করে।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিজে আওয়ামী লীগ ভেঙে বাম দলগুলোকে নিয়ে গঠন করলেন বাকশাল তথা বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। শেখ মুজিবের একদলীয় রাজনীতি থেকে দেশকে বহুদলীয় রাজনীতির আলোতে আনলেন জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমান পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বহুদলীয় রাজনীতি চালু করে বাকশাল বিলুপ্ত করায় আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় সুযোগ পেল। ১৯৭২ সালেই আওয়ামী লীগ ভেঙে গঠিত হয়েছিল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আকর্ষণীয় স্লোগান নিয়ে জাসদ প্রতিষ্ঠার মূল কারিগর ছিলেন সিরাজুল আলম খান। তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে রহস্যপুরুষ বলে পরিচিত; এমনকি তাকে 'কাপালিক' বলেও অভিহিত করা হয়।

পরবর্তী সময়ে জাসদ ভেঙে বাসদ গঠিত হয় এবং বর্তমানে দুটি জাসদ ও বাসদ করেছে। মওলানা ভাসানীর ন্যাপ ভেঙে মোজাফফর ন্যাপ অনেক আগেই গঠিত হয়। আবার ভাসানীর ন্যাপ থেকে বের হয়ে কাজী জাফর, আবদুল হালিম চৌধুরী ও মেননরা ইউপিপি (ইউনাইটেড পিপলস পার্টি) গঠন করেন। কাজী জাফর ও হালিম চৌধুরী জেনারেল জিয়ার সাথে যোগ দিলে রাশেদ খান মেনন ওয়ার্কাস পার্টি গঠন করেন। পরবর্তী সময়ে ওয়ার্কার্স পার্টিও ভেঙে দুটো পার্টি হয়েছে। আরেকটার নাম দেওয়া হয়েছে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি। কমিউনিস্টও পার্টিও অনেক ভাগে বিভক্ত হয়ে খণ্ডবিখণ্ড হয়েছে। এসব দলই ছাত্রসংগঠন করার চেষ্টা করেছে বা ছাত্রসংগঠন করেছে নামকাওয়াস্তে। মূল দল ভেঙে যেসব দল হয়েছিল, সেসব দল যেমন টেকেনি, তেমনি তাদের ছাত্রসংগঠনও টেকেনি।

জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করেছিলেন একটি নতুন দল হিসেবে। এ দলে এসে যোগদান করেন আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের (ভাসানী গ্রুপ) নেতারা এবং সাবেক মুসলিম লীগারগণ। তবে জিয়ার গঠিত ছাত্রদল টিকে গিয়েছিল ঐতিহাসিক কারণে এবং জিয়াউর রহমানের কিছু গঠনমূলক কর্মসূচির সুবাদে। জেনারেল এরশাদ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি

www.pathagar.org

বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে বন্দুকের নলের মুখে অপসারিত করে ক্ষমতা দখলের পর তিনিও জাতীয় ছাত্রসমাজ নামক একটি ছাত্রসংগঠন করেছিলেন। এ সংগঠনটিও ছাত্রদের কোনো সমর্থন পায়নি।

বাংলাদেশের বিগত ৪২ বছরের ছাত্রসংগঠনগুলোর ভূমিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রধান কলেজগুলোতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্রলীগ ও ইসলামী ছাত্রশিবির এই তিনটি ছাত্রসংগঠনই বেশি সক্রিয়। কোথাও কোথাও ছাত্র ইউনিয়ন এবং উত্তরবঙ্গের কতিপয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রমৈত্রীর অস্তিত্ব থাকলেও তা খুব একটা উল্লেখ করার মতো নয়। প্রধান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের বড়ো বড়ো কলেজগুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ, রাজশাহী সরকারি কলেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, খুলনা বিএল কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, সিলেট এমসি কলেজ, বরিশাল বিএম কলেজ, বগুড়া আজিজুল হক কলেজসহ আরও বেশ কিছু বড়ো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইসলামী ছাত্রশিবিরের অবস্থান এখনও পর্যন্ত শীর্ষস্থানে রয়েছে। তবে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও শিবির সক্রিয়। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকায় টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি ও অস্ত্রের জোরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের অবস্থান শক্তিশালী মনে হলেও সাধারণ ছাত্রদের মাঝে ছাত্রদলের সমর্থনই উল্লেখযোগ্য।

ইদানীংকালে জয় বাংলা ও জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান ছাড়া ছাত্রলীগের কোনো আদর্শ আছে বলে লক্ষ করা যায় না। ছাত্রদলের বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ও জিন্দাবাদ স্লোগানই সম্বল। ছাত্রলীগ জাতির পিতা শেখ মুজিব এবং ছাত্রদল স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়ার আদর্শের কথা বলে থাকে। গঠনমূলক ও জ্ঞানভিত্তিক কোনো কর্মসূচি এই দুই দলের কারও মধ্যে দেখা যায় না। তবে সম্প্রতি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের প্রচেষ্টায় ছাত্রদলের কিছু প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নেওয়ার কথা জানা যায়, যা একটি আশার কথা।

সমাজতন্ত্রের পতনের পর বাংলাদেশের বামপন্থিরা পথ হারিয়ে ফেলেছে। আওয়ামী লীগের কাঁধে সওয়ার হয়ে যতটুকু রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত ফায়দা আদায় করা যায়, তা হাসিল করতেই ওরা ব্যস্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে

www.pathagar.org

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারি দলের ছত্রছায়া ও প্রশ্রয়ে ছাত্রলীগের গুন্ডামি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের যে চিত্র জাতি বিগত বছরগুলোতে দেখে আসছে, তা রীতিমতো উদ্‌বেগজনক। ছাত্রলীগের অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, সিট দখল, হল দখল, শিক্ষক পেটানো ইত্যাদি অপকর্মের ফলে শিক্ষাঙ্গন অস্থির এবং লেখাপড়ার পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। বিরোধীদলীয় ছাত্রসংগঠনের ওপর এবং সেইসাথে সাধারণ ছাত্রদের ওপর চলছে নির্যাতন। এ সম্পর্কে নতুন করে বর্ণনা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। পুলিশের ছত্রছায়ায় বিগত সাড়ে ১২ বছর ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের হাতে বন্দুক, রাইফেল, রিভলবার, পিস্তল, রামদা ও চাপাতির যেসব ছবি সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেলের বদৌলতে গোটা জাতি দেখেছে, তা-ই এ সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

আমাদের এখন স্বাধীন জাতি হিসেবে পাকিস্তানের ২৪ বছর এবং বাংলাদেশের ৪২ বছরে ছাত্রসংগঠনগুলোর তৎপরতা, অবদান ইত্যাদি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসে গিয়েছে।

এক. আমাদের দেশের মতো রাজনীতিপ্রভাবিত বিশেষ করে দলীয় রাজনীতিপ্রবণ ছাত্রসংগঠন ও আন্দোলন পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। ছাত্রসংগঠনগুলোর এভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড়বৃত্তি করার ঘটনা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে নেই।

আমি বিশ্বের ৪০টি দেশে সফর করেছি, সেসব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছি এবং বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ ও রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথেও আমার মতবিনিময়ের সুযোগ হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো ছাত্রসংগঠন আমি কোথাও পাইনি। অন্যান্য দেশের ছাত্র আন্দোলন হয় ক্যাম্পাসভিত্তিক ও ছাত্রসংসদকেন্দ্রিক এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপবিহীন। তারা রাজনীতি চর্চা করে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন প্রদান করে এবং নির্বাচনে স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মী হিসেবে কাজ করে। কিন্তু সেই সমর্থন নিতান্তই সাময়িক বা নির্বাচনকালীন। আমাদের দেশের ছাত্রসংগঠনগুলোর মতো সারা বছর নেতা-নেত্রীদের পেছনে স্লোগান দেওয়ার কাজ তারা করে না। তারা নিজেদের প্রস্তুত করার জন্য অ্যাকাডেমিক পড়াশোনার বাইরেও ব্যাপক পড়াশোনা করে। পাশাপাশি বিতর্ক, নিবন্ধ পাঠ, ওয়ার্কশপ, লাইব্রেরি ওয়ার্ক ও সমাজকল্যাণ-মূলক কার্যক্রম করে থাকে।

www.pathagar.org

দুই. স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ভাষা আন্দোলনে ছাত্রসংগঠনগুলোর ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত হওয়াটা সময়ের দাবি ছিল, দেশপ্রেমের দাবি ছিল। তবে তখনকার ভূমিকা ও দেশ স্বাধীন হওয়ার পর একই ধরনের ভূমিকা কাম্য হতে পারে না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের ছাত্রদের উৎপাদন ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া উচিত। নিরক্ষর মানুষকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করা, অসহায় মানুষের সেবা করা, নিজেদের চরিত্র গঠন ও আগামীদিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে সময় দেওয়া, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও গবেষণার কাজে মনোনিবেশ করা, উন্নত বিশ্বের সাথে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলার মতো যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করা ছাত্রসংগঠনগুলোর কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

পাকিস্তান আমলের ছাত্ররাজনীতি থেকে আমরা কিছু রাজনৈতিক কর্মী পেয়েছি মাত্র। তারা বিভিন্ন দলে মাঝারি ধরনের নেতা হিসেবে কিছু অবদান রাখলেও একটি দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বহুমুখী গুণাবলিসম্পন্ন ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে ভূমিকা রাখার লোকের সংখ্যা নেহায়েত কম। আলোকিত জাতি হওয়ার জন্য সর্বক্ষেত্রে যে ধরনের দক্ষতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষ আমাদের দরকার, সোনার বাংলাদেশ গড়ার জন্য যে ধরনের সোনার মানুষ প্রয়োজন ছিল, আমরা তা পাইনি।

তিন. বামপন্থি তথা কমিউনিস্টরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে আমাদের ছাত্র আন্দোলনের যে অপূরণীয় ও অমার্জনীয় ক্ষতি করেছে, তা নজিরবিহীন। এত বিপুলসংখ্যক ছাত্র কমিউনিস্টদের দ্বারা বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়ে তাদের জীবন দিয়েছে, সুন্দর ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দিয়েছে, তা সম্ভবত আর কোথাও ঘটেনি।

একজন বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা জীবনসায়াহ্নে আমাকে বলেছেন, 'ছাত্রজীবনে আমরা মনে করতাম, এই তো বিপ্লব হয়ে যাচ্ছে। বিপ্লবের এমন রঙিন চশমা আমাদের কমরেডরা আমাদের চোখে পরিয়ে দিয়েছিল যে, তার নেশায় আমরা সবকিছু রঙিন দেখতাম এবং সংসার, পরিবার, পিতা-মাতা, লেখাপড়া সব ছেড়ে দিয়ে দৌড়িয়েছি বিপ্লবের পেছনে; কিন্তু ফলাফল শূন্য।'

কমিউনিস্ট আন্দোলনের পেছনে কত মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র যে আমাদের চোখের সামনেই হারিয়ে গিয়েছে, তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। এরা দ্বীন, দুনিয়া, ধর্ম সবটাই হারিয়েছে। সশস্ত্র সংগ্রামের নামে বা শ্রেণিসংগ্রামের দীক্ষা দিয়ে এই উপমহাদেশে কমিউনিস্টরা যে কত যুবককে বিপথগামী করে

www.pathagar.org

করুণ পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে, সে সংখ্যাও বিপুল। কমিউনিস্টরা আমাদের জাতির সবচেয়ে বড়ো যে ক্ষতিটা করেছে তা হলো—আমাদের ছাত্র-যুবকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে ধর্মবিমুখ ও অধার্মিক কিংবা ধর্মের প্রতি বিদ্রোহী করে তুলেছে। এদের সংখ্যা যদিও-বা খুব কম, কিন্তু সমাজে এরা ক্যানসারের মতো বিরাজ করছে।

চার. বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ছাত্রসংগঠনগুলোর তৎপরতা বা আন্দোলন খুবই হতাশাব্যঞ্জক। যে কয়টি ছাত্রসংগঠন সক্রিয়, তাদের মধ্যে কোনো সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক নেই এবং পারস্পরিক কোনো আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় নেই। এক টেবিলে বসে তারা চা-ও খায় না। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় আদর্শবিরোধী ও দেশের মানুষের ঈমান-আকিদাবিরোধী কর্মকাণ্ডের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এখানে অনেকটা প্রকাশ্যেই দেশের নব্বই ভাগ মানুষের ধর্মীয় চেতনার বিরোধী কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা চলছে। ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করাই এদের প্রধান কাজ। নামাজি বা টুপি-দাড়িওয়ালা কোনো ছাত্র এসব জায়গায় নিরাপদ নয়। নাস্তিক, মাতাল, চরিত্রহীন, ধর্ষণের সেঞ্চুরিওয়ালারা এখানে নিরাপদ হলেও ইসলামী ছাত্রসংগঠনের কোনো কর্মী নিরাপদ নয়। নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে এই পরিস্থিতি মেনে নেওয়া যায় না। এখানে অসন্তোষ ও ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। একদিন যে তার বিস্ফোরণ ঘটবে, সে কথা নিশ্চিত করে বলা যায়।

পাঁচ. শিক্ষাঙ্গনে যে সংঘাতময় ও অস্থির পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তার জন্য শিক্ষক-রাজনীতিও দায়ী। শিক্ষকরাও এখন বিভিন্ন দলের ব্যানারে নির্বাচন করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিগণ দলীয় রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। শিক্ষকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দলীয় রাজনীতি নিয়ে এতটাই ব্যস্ত থাকেন যে, তারা ছাত্রদের পড়াশোনা ও গবেষণাকাজে কোনো অবদান রাখতে পারছেন না। এমনসব লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসিপদে নিযুক্তি পাচ্ছেন দলীয় আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে; যারা গবেষণার কাজ তো দূরের কথা, জীবনে একটি ভালো নিবন্ধও লেখেননি।

ছয়. বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতির নামে একধরনের ক্যাডারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ছাত্ররাজনীতি বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠন করাটা একটা লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। টেন্ডার লুট, চাঁদাবাজি ইত্যাদির মাধ্যমেই অনেকেই বিপুল অর্থ ও সম্পদের মালিক বনে যায়। এদের অনেকেই

www.pathagar.org

বিয়েশাদি ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে ছাত্রাবস্থাতেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাজে লিপ্ত থাকে। ব্যাপকভাবে অস্ত্রের ব্যবহার ছাত্ররাজনীতিকে সন্ত্রাস ও সংঘর্ষের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। ফলে অনেক সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করতে এসে লাশ হয়ে ফিরে যায় মায়ের কোলে। বর্তমানে ছাত্ররাজনীতির নামে যেভাবে লাশ পড়ছে আর রক্ত ঝরছে, তা কখনোই কাম্য হতে পারে না।

সাত. ছাত্ররাজনীতিতে অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরগণ একসময় প্রস্তাব দিয়েছিলেন ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করে দেওয়ার জন্য। পরীক্ষামূলকভাবে হলেও কিছুদিনের জন্য ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে দেওয়ার কথাও তারা বলেছিলেন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানান ছাত্ররাজনীতির প্রশ্নে একটি সমঝোতায় পৌঁছার জন্য। একমাত্র জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। আওয়ামী লীগ বা বিএনপি এ আহ্বানে সাড়া দেয়নি। ছাত্ররাজনীতির ক্ষতিকর দিক বিবেচনা করেই রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের সময় কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন থাকতে পারবে না মর্মে নির্বাচন কমিশন আরপিওতে একটি বিধান সংযোজন করে, কিন্তু পরে আওয়ামী লীগের চাপে অঙ্গসংগঠন না থাকলেও সহযোগী সংগঠন থাকতে পারবে বলে নির্বাচন কমিশন স্বীকার করে নেয়।

মোদ্দাকথা হচ্ছে, বর্তমানে বাংলাদেশে যে ধরনের রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির ছাত্রসংগঠনের অস্তিত্ব বিরাজ করছে, তা দেশের মানুষ পছন্দ করছে না। আগে ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে যে মর্যাদা ও আকর্ষণ ছিল, তা আজ আর অবশিষ্ট নেই। সাধারণ মানুষ ছাত্ররাজনীতিকে আর ভালো দৃষ্টিতে দেখে না। ছাত্রসংগঠন থাকতে পারে, তবে তা সীমাবদ্ধ থাকবে শিক্ষাঙ্গনে এবং তাদের কার্যক্রম হবে মেধা ও প্রতিভা বিকাশ এবং চরিত্র গঠন বিষয়ে। ছাত্রসংগঠনের ওপরে রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি বা রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপ থাকতে পারবে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে ধরনের ছাত্রদের সমিতি বা অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ছাত্রসংগঠনগুলো সে ধরনের জ্ঞানচর্চাভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

(রাত ১২:৩০ টা; ৮ আগস্ট, ২০১৩)

www.pathagar.org

মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ কৃষক সন্তানদের ভূমিকা ছিল প্রধান

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার, সৈনিক, পুলিশ বাহিনী ও তদানীন্তন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলের বাঙালি সদস্যরাই নেতৃত্ব দেয়। তাদের সাথে যুদ্ধে অংশ নেয় সাধারণ মানুষ ও বাংলার ছাত্র-যুবসমাজ। তবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক বা প্রশিক্ষণবিহীন নিরক্ষর বা অর্ধশিক্ষিত যুবক ও শ্রমিকদের সংখ্যাই ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সীমানা পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর একপর্যায়ে ভারতের জেনারেল উবানের নেতৃত্বে দেরাদুনে তাদের প্রশিক্ষণ চলে। ওদিকে বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডারদের তত্ত্বাবধানে যেসব যুবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, তারাই নিয়মিত বাহিনীর সাথে দেশের অভ্যন্তরে এসে অনেক অপারেশনে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ছাত্রলীগের যেসব নেতাকর্মী দেরাদুনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, তারা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে খুব কমই অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। তাদের গঠিত মুজিব বাহিনী বা বিএলএফের প্রশিক্ষণ যখন সমাপ্ত হয়, তার অল্পদিনের মধ্যে ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে বাংলাদেশ মুক্ত হয়ে যায়। এ কারণেই ছাত্রলীগের মধ্য থেকে বড়ো মাপের ছাত্রনেতা মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি ময়দানে শহীদ হওয়ার সংখ্যা খুবই কম। যারা বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেছে, অর্থাৎ যাদেরকে সাধারণভাবে এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার্স) বা মুক্তিবাহিনী বলা হতো, তারাই মূলত জীবন দিয়েছে। সেইসাথে জীবনদানকারী অধিকাংশই ছিল অতিসাধারণ কৃষকসন্তান, যুবক ও শ্রমিক।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, আওয়ামী লীগের নেতারা যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাদের আদৌ কেউ প্রত্যক্ষ রণাঙ্গনে ভূমিকা পালন করেছেন, এমন দৃষ্টান্ত খুব একটা পাওয়া যায় না। তাই দেখা যায়, মুক্তিযুদ্ধ

www.pathagar.org

শুরুর প্রাক্কালে যশোরের আওয়ামী লীগ নেতা মশিউর রহমান ছাড়া আওয়ামী লীগের কোনো শীর্ষস্থানীয় নেতাই নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে জীবনদান করেননি। তারা অনেকেই কলকাতায় বিলাসী জীবনযাপন করেছেন বলে সমালোচনা আছে। এমনকি মুক্তিযুদ্ধে সহ-অধিনায়ক ছিলেন যে এ কে খন্দকার, তিনি নাকি আদৌ কোনো অপারেশনেই যাননি। অবশ্য তার ব্যাপারে মুক্তিযুদ্ধের পর মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী তীব্র সমালোচনা করেছেন প্রত্যক্ষ রণাঙ্গনে না যাওয়ার কারণে। (দ্রষ্টব্য : *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর কথোপকথন*)

বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী তো চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর শফিউল্লাহ (পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রথম সেনাপ্রধান) কোনো প্রত্যক্ষ যুদ্ধেই নেতৃত্ব দেননি। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যেভাবে দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তেমনটি আর কারও সম্পর্কে জানা যায় না। (দ্রষ্টব্য : *মূলধারা একাত্তর*, মঈদুল হাসান)

অথচ তখন যুবনেতা ফজলুল হক মনিসহ তার সাথিরা তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণের অনেক চেষ্টা করেছেন। মনির নেতৃত্বে ছাত্রলীগ কর্মীদের নিয়ে যে বিএলএফ বা মুজিব বাহিনী গঠন করা হয়েছিল, তারা তাজউদ্দীন আহমদ বা সেক্টর কমান্ডারদের মেনে নিতে চায়নি। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখা থেকে এমন তথ্যই পাওয়া যায়। মোদ্দাকথা, শেখ মুজিবের নামে এবং আওয়ামী লীগের প্রবাসী সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হলেও এতে সাধারণ কৃষক-শ্রমিক সন্তানদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। তা ছাড়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। একপর্যায়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যক্ষ যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনেক অফিসারসহ প্রায় ১২ হাজার ভারতীয় সেনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জীবন দিয়েছেন।

পাকিস্তানি বাহিনী ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার জগজিৎ সিং অরোরার কাছেই অস্ত্রসংবরণ করে আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীকে উপস্থিত রাখা হয়নি। বলা হয়ে থাকে, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সহ-অধিনায়ক এ কে খন্দকার উপস্থিত

www.pathagar.org

ছিলেন। কিন্তু আত্মসমর্পণের দলিলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কারও কোনো স্বাক্ষর নেই। পাক বাহিনীর ৯৩ হাজার সৈন্যসহ জেনারেল একে নিয়াজীর আত্মসমর্পণকে ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের বিজয় হিসেবেই দেখা হয় এবং প্রতি বছর ইস্টার্ন কমান্ড ১৬ ডিসেম্বর এ বিজয় দিবস পালন করে।

(রাত ১২:৩০ টা; ৯ আগস্ট ২০১৩)

www.pathagar.org

শেখ মুজিবের সতর্কতা ও ভারতের সৈন্য প্রত্যাহার

শেখ মুজিব প্রথম থেকেই ভারতের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। পাকিস্তান আন্দোলনের একজন প্রথম সারির কর্মী হিসেবে তিনি কোনো অবস্থাতেই পাকিস্তান ভাঙার দায়িত্ব নিতে চাননি। ৭ মার্চের বক্তব্যে তিনি 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলার পরও, জয় বাংলার পর 'জয় পাকিস্তান' বলে ভাষণ শেষ করেন। অবশ্য এখন তার ভাষণে 'জয় পাকিস্তান' শব্দটা কেটে ফেলা হয়েছে।

তাজউদ্দীন আহমদ ২৫ মার্চ অপরাহ্নে একটি টেপরেকর্ডার ও একটি বক্তব্য লিখে নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের নিকট গিয়েছিলেন। কাগজটি বঙ্গবন্ধুকে দিয়ে তাজউদ্দীন আহমদ বলছিলেন—'এটি আপনি রেকর্ড করে নিন, তাহলে প্রয়োজনে কাজে লাগানো যাবে।' লেখাটা পড়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে শেখ মুজিব বললেন—'এটা ওরা আমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ হিসেবে ব্যবহার করবে।' তাজউদ্দীন আহমদ সেদিন মন খারাপ করে ৩২ নম্বরের বাড়ি থেকে চলে আসেন। (দ্রষ্টব্য : *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর কথোপকথন*, প্রথমা প্রকাশনী)। উল্লেখ্য, ২৬ ও ২৭ মার্চ সারা দেশে হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল।

শেখ মুজিব ১৯৭২-এর ৮ জানুয়ারি পাকিস্তান জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর লন্ডনে যান। তাকে বহন করার জন্য ভারত সরকার একটি বিমান দেওয়ার প্রস্তাব করলে শেখ মুজিব তা গ্রহণ করেননি। তিনি ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটি বিমানে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি দিল্লিতে যাত্রাবিরতি করে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করে দেশে ফেরেন।

ফেব্রুয়ারি মাসে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে অনুষ্ঠিত আলোচনায় শেখ মুজিব ইন্দিরা গান্ধীকে জিজ্ঞেস করলেন—'কবে নাগাদ বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্যদের

www.pathagar.org

প্রত্যাহার করবেন?' ইন্দিরা গান্ধী তাৎক্ষণিক এ কথার জবাব দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। জবাব দিয়েছিলেন—'খুব শীঘ্রই। ১৭ মার্চ আপনার জন্মদিনের আগেই।'

শেখ মুজিব একটি ব্যাপার ভালোভাবে বুঝেছিলেন, ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্যদের অবস্থান নিয়ে নানান কথাবার্তা ও আলোচনা শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে ভারতের ওপর চাপও ছিল। এমন একটি মোক্ষম সময় বেছে নিয়েই শেখ মুজিব ইন্দিরা গান্ধীকে সৈন্য অপসারণের কথাটি জিজ্ঞেস করেন।

ভারতের ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমানের সতর্কতার আরও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হলো, ১৯৭৪ সালের ১৬ মে নয়াদিল্লিতে সম্পাদিত মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি। সীমানা নির্ধারণ, ছিটমহল বিনিময়, তিন বিঘা করিডোরের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৮ মিটার × ৮৫ মিটার একটি এলাকা তিন বিঘা পাটগ্রামের পানবাড়ি মৌজার পাশে) ইত্যাদি সকল ব্যাপারে অত্যন্ত সুস্পষ্ট সমাধান ও নিষ্পত্তি করা হয় মুজিব-ইন্দিরা চুক্তিতে। চুক্তির ১ নং অনুচ্ছেদের ১৪ নং ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের ১২ নং দক্ষিণ বেরুবাড়ি ইউনিয়ন সংলগ্ন ছিটমহলসহ ২.৬৪ বর্গমাইল এলাকা ভারত পায় এবং তার পরিবর্তে দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা ছিটমহল পায় বাংলাদেশ। দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতাকে বাংলাদেশের পাটগ্রাম থানার পানবাড়ি মৌজার সাথে সংযোগের জন্য ভারত ১৭৮ মি. × ৮৫ মি. (তিন বিঘা করিডোর) জমি বাংলাদেশকে চিরস্থায়ীভাবে লিজ দেবে। বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধন করে দক্ষিণ বেরুবাড়ি ইউনিয়ন ও তৎসংলগ্ন ছিটমহল ভারতের কাছে হস্তান্তর করলেও বিগত ৪২ বছরে ভারত তার অঙ্গীকার পূর্ণ করেনি।

ভারত চুক্তি অনুযায়ী তিন বিঘা করিডোরের মালিকানা বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করেনি এবং এক নম্বর অনুচ্ছেদের ১২ নং ধারা মোতাবেক ছিটমহলগুলো উভয় দেশ পরস্পরকে হস্তান্তর করতে পারেনি। সম্প্রতি শেখ হাসিনা ও ড. মনমোহন সিংয়ের স্বাক্ষরিত ল্যান্ড বাউন্ডারি অ্যাগ্রিমেন্ট মোতাবেক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ৫৪টি ছিটমহল এবং ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ১১২টি ছিটমহলও হস্তান্তর করার ব্যবস্থা ভারত করেনি। এজন্য ভারতের সংবিধান সংশোধন করতে হবে এই অজুহাতে এই চুক্তিটিও বাস্তবায়ন করেনি ভারত সরকার।

www.pathagar.org

মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের অনুরোধে সরলমনে ৪১ দিনের জন্য অস্থায়ীভাবে ফারাক্কা বাঁধ খুলে দেওয়ার সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ৪১ দিন আজও শেষ হয়নি। ফারাক্কার পানি ভারত অবৈধভাবে প্রত্যাহার করে নিয়ে যাওয়ার সব ব্যবস্থাই করেছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শেখ হাসিনা ভারতের সাথে ৩০ বছরের গঙ্গা পানিচুক্তি সম্পাদন করে। এতে কোনো গ্যারান্টি ক্লজ না থাকায় বাংলাদেশ শুষ্ক মৌসুমে পানির ন্যায্য হিস্সা পাচ্ছে না। অথচ জিয়াউর রহমানের সময় পানি বণ্টনসংক্রান্ত অন্তর্বর্তীকালীন যে চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাতে শুকনো মৌসুমে বাংলাদেশকে প্রতিদিন ৩৪,৫০০ কিউসেক পানি দিতে বাধ্য ছিল ভারত।

তবে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, বাংলাদেশ থেকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য করাটা ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের এক অসাধারণ কৃতিত্ব। এ নিয়ে ভারতের নেতাদের মধ্যে মতপার্থক্যও ছিল। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি জৈল সিংসহ অনেকেই মন্তব্য করেছেন—'বাংলাদেশ থেকে ভারতের সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়ে আসা ছিল একটি বড়ো ভুল।'

(রাত ১২:০০ টা; ১০ আগস্ট, ২০১৩)

www.pathagar.org

স্বাধীন দেশ পরিচালনায় আওয়ামী লীগের পরিকল্পনাহীনতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সমাধানে পৌঁছার জন্য ১৯৭১ সালের মধ্য মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সাথে আলোচনা চালিয়েছেন। বিভিন্ন সময় আলোচনার অগ্রগতি ভালো হচ্ছে বলেও মিডিয়াকে জানানো হয়। আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে ইয়াহিয়ার প্রতিনিধিদের কাছে ফেডারেল সরকারের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। ২০ ও ২৫ মার্চ শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার পিএস পীরজাদার পক্ষ থেকে বার্তা পাওয়ার অপেক্ষা করছেন এবং ড. কামাল হোসেনকে খোঁজ নিতে বলেছেন। শেখ মুজিব মানসিকভাবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। মূলত ভুট্টো-ইয়াহিয়ার গাদ্দারির কারণেই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজেও পাকিস্তানের ফেডারেল কাঠামোর ভেতরেই ৬ দফা দাবির ভিত্তিতে অধিকার ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। শেখ মুজিব যদি পাকিস্তান ভাঙতে চাইতেন, তাহলে সকল রাজনৈতিক দলের কনভেনশন ডেকে আলোচনার টেবিলে লাহোর প্রস্তাবের আলোকে পাকিস্তানকে ভাগ করতে পারতেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের সকল দল তা সমর্থন করত।

কুয়ালালামপুর ও সিঙ্গাপুর কিন্তু এক রাষ্ট্র ছিল। লি কুয়ান ইউ ও টেংকু আবদুর রহমান উভয়ের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞার বদৌলতে রক্তপাতহীনভাবে কুয়ালালামপুর থেকে আলাদা হয়ে সিঙ্গাপুর স্বাধীনতা লাভ করে। এখনও সিঙ্গাপুরের অভ্যন্তরে কুয়ালালামপুরের রেললাইন আছে এবং পানীয় জলের জন্য সিঙ্গাপুর কুয়ালালামপুরের ওপর শতভাগ নির্ভরশীল। দুটি দেশ

www.pathagar.org

আত্মঘাতী সংঘাতে লিপ্ত না হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে দুটো দেশেরই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আশাতীত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটেছে। বিশেষ করে সিঙ্গাপুর তো উন্নয়নের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

১৯৭১ সালের সংকটে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে অথবা আপসে বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তান আলাদা হয়ে গেলে ইতিহাসের নিকৃষ্টতম ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত হতো না। চার দশক পর আজও ১৯৭১-এর বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।

শেখ মুজিব যদি সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করতে চাইতেন, তাহলে ভারতে আশ্রয় নিয়ে তার নেতৃত্বেই প্রবাসী সরকার গঠিত হতো। আর তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত সরকারকে ভারত যেভাবে সক্রিয় সহযোগিতা করেছে, স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল নেতাকে পেলে আরও বেশি সহযোগিতা করত। আর একইসাথে বাংলাদেশ আরও কম সময়ের মধ্যে স্বাধীনতা লাভ করত। পাকিস্তানি সামরিক সরকারের হাতে স্বেচ্ছায় শেখ মুজিব কারাবরণ করায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী সংশয়ে ছিলেন এবং সেই সংশয় তিনি প্রকাশও করেছিলেন। শেখ সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা না করে পাকিস্তানিদের হাতে ধরা দিলেন কেন? এ প্রশ্ন তিনি তাজউদ্দীন আহমদকে করেছিলেন। (দ্রষ্টব্য : *মূলধারা একাত্তর* ও *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর কথোপকথন*)

১৯৭১ সালের ৬ নভেম্বর ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় বলেন—'আমার জানামতে, শেখ মুজিবুর রহমান এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। সুতরাং সংকট নিরসনের এখনও একটা সুযোগ রয়ে গেছে।' (*India speaks*, ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত)

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার এবং শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তনের পর যেসব কর্মপন্থা গ্রহণ করেন, তাতে এটা আরও পরিষ্কার হয় যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে দেশটা কীভাবে পরিচালিত হবে, সেজন্য তার বা তার দলের কোনো কর্মপরিকল্পনা ছিল না। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান স্বাধীন হলে দেশ কীভাবে পরিচালনা করা হবে, তার কোনো কর্মসূচি বা কর্মপরিকল্পনা তদানীন্তন মুসলিম লীগের ছিল না। রাষ্ট্রপরিচালননীতি সম্পর্কেও সুস্পষ্ট নীতি-আদর্শের চিন্তাভাবনা ছিল না। আর সে কারণেই মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মুসলিম লীগের প্রতি মানুষের আবেগ ও ভালোবাসা রূপান্তরিত

www.pathagar.org

হয় অসন্তোষ ও ক্ষোভে। এজন্য ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জনগণ মুসলিম লীগকে বিদায় জানায়। রাষ্ট্রপরিচালনায় সুনির্দিষ্ট নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচির অনুপস্থিতিতে শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব অস্থিরচিত্ততার পরিচয় দেয়।

শেখ মুজিব ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করে ১২ জানুয়ারি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব প্রদান করেন। তখন ধরে নেওয়া হয়েছিল, শেখ মুজিব হয়তো ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।

অনেকেই আশা করেছিলেন এবং দাবিও জানিয়ে ছিলেন যে, একটি জাতীয় সরকার গঠন করা হোক। বামপন্থি দলগুলো এ ব্যাপারে চাপ দিয়েছিল। কিন্তু শেখ সাহেবের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার কারণে সেই চাপে কোনো কাজ হয়নি। শেখ মুজিব ও তার দলের যেসব সদস্য পাকিস্তান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনি তাদের মধ্য থেকেই মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। প্রাদেশিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনকে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হলো। আরও যে অভিনব কাজটা তিনি করলেন তা হলো—পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র বা সংবিধান রচনার জন্য লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডিন্যান্স (এলএফও)-এর অধীনে যারা পাকিস্তান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের এমএনএ (মেম্বার অব ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি) ও এমপিএ (মেম্বার অব প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেম্বলি) নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাদের সমন্বয়ে বাংলাদেশের সংবিধান রচনার জন্য Contitnent Assembly বা গণপরিষদ গঠন করেন। ইতিহাসের নির্মম পরিহাস এই যে, সেই গণপরিষদই বাংলাদেশ নামক নতুন স্বাধীন দেশের সংবিধান রচনা করে।

স্বাধীনতা-উত্তর শেখ মুজিবের সরকার আরেকটি মারাত্মক সিদ্ধান্ত নিল। দেশের সমস্ত কলকারখানা পাইকারিভাবে জাতীয়করণ করে অনভিজ্ঞ দলীয় লোকদের হাতে তুলে দিলো। এসব শিল্পকারখানা তো তারা চালাতেই পারল না; বরং চুরিচামারি ও লুটপাট করে অনেক ফ্যাক্টরির মেশিন পর্যন্ত বিক্রি করে খেয়ে ফেলল। পাকিস্তান আমলে শিক্ষা বিকাশের যে ধারা সূচিত হয়েছিল, তা ২০-২৫ বছরের মতো পিছিয়ে গেল।

www.pathagar.org

জাতীয় ঐক্যের কোনো চিন্তাই করা হলো না

জনপ্রিয়তার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন শেখ মুজিব। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সাবেক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ ব্যক্তিকে কোনো পাত্তাই দিলেন না। পাক সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করার অপরাধে পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি (৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরিক দল ও দেশের আলেমসমাজের প্রতিনিধিত্বকারী দল), পিডিপি (নুরুল আমিন সাহেবের দল, যিনি ১৯৭০ সালেও এমএনএ নির্বাচিত হয়েছিলেন) এবং জামায়াতে ইসলামী (যে দল ভোটপ্রাপ্তির দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল)-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। মাত্র ২৪ বছর আগে ধর্মের ভিত্তিতে যে দেশের সীমানা নির্ধারিত হয়েছে, সেই দেশেই ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করলেন।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত পূর্ব পাকিস্তানই তো বাংলাদেশে রূপান্তরিত হলো। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের ভূমিই স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং এর সাথে তো এক ইঞ্চিও নতুন জমি যুক্ত হয়নি। তা ছাড়া যে বামপন্থিরা মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছে, তাদের ওপর আস্থা রেখেও জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনে সবাইকে সাথে নিয়ে তিনি একটা কিছু করতে পারলেন না। তিনি বরং দলীয় বৃত্তের মধ্যেই থেকে গেলেন। জাতির মধ্যে শেখ মুজিবের মর্যাদা তখন এমন উঁচুতে উঠে গিয়েছিল যে, তিনি যদি ইরানের বিপ্লবী নেতা ইমাম খোমেনির মতো রাষ্ট্রের নির্বাহী পদ গ্রহণ নাও করতেন, তারপরও নেতৃত্ব তার হাতেই থাকত।

এ কথাও বিবেচনা করা হলো না যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ভোট কাস্ট হয়েছিল ৫৪%। অর্থাৎ, বাকি ৪৬% জনগণ ভোট দেয়নি। ৫৪% ভোটারের সব ভোটও আওয়ামী লীগ পায়নি। অন্যান্য সব দল মিলে যদি ১০-১৫% ভাগ পেয়ে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে আওয়ামী লীগ ৫০%-এর কম ভোট পেয়েছে। অতএব, আওয়ামী লীগের বাইরেও জনগণের একটি বড়ো অংশ আছে। কিন্তু এসব বিবেচনা না করে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো। যে অপরাধে মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি, পিডিপি ও জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করা হলো, সে অপরাধে অপরাধী তার দলের লোকও আছে। আওয়ামী লীগের ২৬ জন বা

www.pathagar.org

ততোধিক সদস্য প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সমর্থন ও সহযোগিতা করেছেন। গভর্নর এ.এম. মালেকের মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের ওবায়দুল্লাহ মজুমদার ও শামসুল হক যোগদান করেন। পিডিপি থেকে দুজন কাউন্সিলর, মুসলিম লীগের দুজন, জামায়াতে ইসলামীর দুজন, নেজামে ইসলাম পার্টির একজন এবং কেএসপির একজনকে নিয়ে গভর্নর এ.এম. মালেক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। অর্থাৎ, একাত্তরে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অখণ্ডতার পক্ষের মন্ত্রিসভার অন্যদের সাথে আওয়ামী লীগ সদস্যরাও ছিলেন।

যুদ্ধের সময় এক কোটি লোক প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নিলেও সাড়ে ছয় কোটি মানুষ দেশেই ছিলেন। আর তখন যে সরকার ছিল, এই বিশাল জনসংখ্যা সেই সরকারেরই আনুগত্য করতে হয়েছে। পাক বাহিনীর বন্দুকের নলের মুখে মানুষের জীবন বিপন্ন ছিল। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সচিব ও সরকারি কর্মকর্তাগণ পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য করেই দেশে থেকেছেন এবং ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাক সরকারই এখানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। তাদের জীবন এক দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কেটেছে।

১৯৭১-এর সংকটটি যে একটি রাজনৈতিক সংকট ছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। পাক বাহিনীর হাতে মানুষ নিগৃহীত হয়েছে, এটাও ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু যারা বাধ্য হয়ে বেসামরিক সরকারকে এবং ক্ষেত্রবিশেষে সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করেছে, তা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই করেছে। একইভাবে দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীকেও জনগণ সহযোগিতা করেছে। বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকীর কাদেরিয়া বাহিনীর কার্যক্রম দেশের অভ্যন্তরেই ছিল। তা ছাড়া কিছু কিছু বাম গ্রুপও দেশের ভেতরেই গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছে। রাজধানী ঢাকাতেও গেরিলা গ্রুপ তৎপর ছিল। যারা শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল-বদর, আশ-শামস গঠন করেছিল বা তাতে অংশ নিয়েছিল, তারাও ছিল পরিস্থিতির শিকার। অনেকে সরল মনে পাকিস্তান রাষ্ট্রের হেফাজতের জন্যও কাজ করেছে—এ কথাও অস্বীকার করা যাবে না। সুতরাং, সবচেয়ে উত্তম কাজ হতো প্রতিশোধ না নিয়ে বিবাদ মিটিয়ে ফেলা। আর কাজটা শেখ মুজিবের পক্ষেই করা সম্ভব ছিল। তিনিই পারতেন দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলা যেভাবে জাতীয় ঐক্যের পথ ধরে বিভেদ মিটিয়ে ফেলে বিশ্বের বুকে নজির স্থাপন করেছেন, তেমন নজির স্থাপন করতে।

www.pathagar.org

মুক্তিযুদ্ধে কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের অবদান এবং বুদ্ধিজীবী হত্যা প্রসঙ্গ

তদানীন্তন সুপরিচিত কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কী পরিমাণ ব্যক্তি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন বা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন? খ্যাতিমানদের মধ্যে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান এবং কবি আল মাহমুদ দেশত্যাগ করে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে কিছু শিল্পী ও গায়কের সমাবেশ ঘটেছিল, তারা নিঃসন্দেহে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের নাম ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু তাদের সংখ্যাও ছিল নেহায়েত কম।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. এবনে গোলাম সামাদসহ আরও কিছু শিক্ষাবিদ ওপারে চলে গিয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কী, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার চাইতে নিরাপত্তার কারণেই অনেকে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ওপারে যান। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের নাম উল্লেখ করে করে দেশত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে শামিল হওয়ার জন্য বা কলকাতায় যাওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু তেমন কেউ যাননি। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী সম্প্রতি এক আলোচনা সভায় বলেছেন—'আমাদের বুদ্ধিজীবীগণ ১৯৭১ সালের ১৩-১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের সাথে সহযোগিতা করেছেন এবং পাক বাহিনীর পক্ষেই কাজ করেছেন।'

প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী একটি সাহসী সত্য উচ্চারণ করছেন। এ কথার বড়ো প্রমাণ হলো—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ ৩৫ জন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষে বিবৃতি দিয়েছিলেন। এ বিবৃতিতে স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও কবীর চৌধুরীও ছিলেন। ১৬ ডিসেম্বরের প্রাক্কালে যেসব শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়, তারা প্রায় সকলেই চীনপন্থি ছিলেন; তারা আওয়ামী লীগ করতেন না। তারা কবি আল মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের মতো কলকাতায় গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেননি বা অংশ নেওয়ার চেষ্টাও করেননি। পাকিস্তানের সেনাপ্রশাসনের সাথে তাদের অনেকের সুসম্পর্কও ছিল।

মুনীর চৌধুরীর স্ত্রী স্বাধীনতার পর বিবিসির সাথে সাক্ষাৎকারে বলেন—'মুক্তিযোদ্ধারাও তাকে হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠি লিখেছিল এবং তাদের অভিযোগ ছিল, অধ্যাপক চৌধুরী পাকসেনাদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন।

www.pathagar.org

পাকসেনারা মুনীর চৌধুরীকে হত্যা না করলে হয়তো মুক্তিযোদ্ধারাই তাকে হত্যা করত।' বিবিসির আর্কাইভে এ সাক্ষাৎকার সংরক্ষিত আছে। মাত্র কিছুদিন আগেও তার এ সাক্ষাৎকারটি প্রচার করা হয়েছে।

প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, বিজয় দিবসের আগপর্যন্ত যেসব বুদ্ধিজীবী শহীদ হলেন, তারা কেন ঢাকায় অবস্থান করে পাক বাহিনীর অধীনে শেষ দিন পর্যন্ত চাকরি করেছেন? পাক বাহিনীর সাথে তাদের একটি সমঝোতা ও সহযোগিতার সম্পর্ক না থাকলে তাদের তো এখানে অবস্থান করার কথা নয়। অন্যরা যেভাবে নিরাপত্তার জন্য গ্রামে বা ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাদেরও তো তা-ই করার কথা। তা ছাড়া বারবার দেশত্যাগ করে তাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়। অনুগত এসব বুদ্ধিজীবীকে পাক বাহিনীই-বা হত্যা করল কেন? এ প্রশ্ন কিন্তু খুব ছোটো প্রশ্ন নয়।

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী তার এক লেখায় এ সম্পর্কে চমৎকার একটা তথ্য দিয়েছেন। কবি তালিম হোসেনের স্ত্রী ১৩ ডিসেম্বরের পর তার সাথে সেই ৩৫ জনের বিবৃতির কপি হাতে নিয়ে দেখা করেন। তিনি জানান—'বিবৃতিতে স্বাক্ষরদাতা অনেকেই বিজয়ের ২-৩ দিন আগে মারা গিয়ে শহীদ হয়ে গেলেন, আর তোমার তালিম চাচা বেঁচে থেকে এখন রাজাকার হিসেবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আছেন। তুমি তাকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা করো।'

এ ঘটনার কয়েক দিন পর কাদের সিদ্দিকী ঢাকায় আসেন এবং কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়ে কবি তালিম হোসেনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। পরে শেখ মুজিবকে বলে তার মুক্তির ব্যবস্থা করেন। কাদের সিদ্দিকীর প্রশ্ন ছিল এটাই যে, একটা বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী কেউ বিজয় দিবসের ২-৩ দিন আগে মারা গিয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবী হয়ে গেলেন এবং সেই তালিকার জীবিত ব্যক্তি কবি তালিম হোসেন রাজাকার হয়ে জেলে গেলেন কীভাবে? যেসব বুদ্ধিজীবী শহীদ হয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে তাদের কী অবদান, তা কিন্তু দেশবাসী জানে না। ট্রাইবুনালে তাদের হত্যার বিচার নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম। তিনি মনে করেন, তাদের হত্যার বিচার সাধারণ আদালতে প্রচলিত আইনে হওয়া উচিত।

(রাত ১১:৪৫ টা; ১২ আগস্ট, ২০১৩)

www.pathagar.org

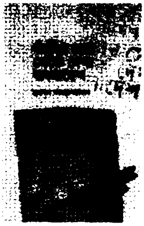

আদর্শিক বিভ্রান্তি

কোন আদর্শে দেশ চলবে, এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের কোনো স্থিরতা ছিল না। শেখ মুজিব তার *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*-তে নিজেই বলেছেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তার রাজনৈতিক গুরু এবং তার আদর্শকেই তিনি ধারণ করেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব একজন গণতন্ত্রী ছিলেন এবং শেখ মুজিবও গণতন্ত্রের জন্য বহুবার কারাবরণ করেছেন, সংগ্রাম করেছেন। ওয়েস্টমিনস্টার ধাঁচের গণতন্ত্রের প্রতিই শেখ মুজিবের আস্থা ছিল, তাই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব অন্যকে দিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

শেখ মুজিব সারাজীবন অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু ১৯৭২ সালের সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হলো। আধুনিককালে রাষ্ট্র মানেই জাতিরাষ্ট্র এবং সেদিক থেকে জাতীয়তাবাদ ঠিক আছে। আর বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফসল। সুতরাং গণতন্ত্রও মূলনীতি হিসেবে যথার্থ। অথচ ভিনদেশি মতবাদ ধর্মনিরপেক্ষতা, যা কার্যত ধর্মহীনতা এবং সমাজতন্ত্র তো নাস্তিক্যবাদ। এ দুটো মতবাদকে কেন মূলনীতি করা হলো? ধর্মপ্রাণ বাংলাদেশের জনগণ তো ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা চায় না বা এজন্য আওয়ামী লীগকে কোনো ম্যান্ডেটও দেওয়া হয়নি। সমাজতন্ত্রের সাথে তো গণতন্ত্রে চলে না বা গণতন্ত্রের সাথে সমাজতন্ত্র মেলে না। একটি অপরটির সাথে সাংঘর্ষিক এবং এজন্য দেশের মানুষ তো আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়নি।

জনগণ শোষণের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে, বৈষম্যের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে, স্বায়ত্তশাসনসহ অন্যান্য দাবি আদায়ের প্রশ্নে ভোট দিয়েছে; ভিনদেশি মতবাদকে মূলনীতি ঘোষণার জন্য বা দেশের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার

www.pathagar.org

জন্য কোনো রায় দেয়নি। অথচ সংবিধানে এমন মতাদর্শকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হলো, যা বাংলাদেশের মানুষের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধর্মবিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। এভাবে একটা আদর্শিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হলো। অর্থাৎ, জাতিকে বিশেষ করে ছাত্র-যুবসমাজকে আদর্শিক দিকনির্দেশনা দিতে আওয়ামী লীগ সরকার ব্যর্থ হলো। এতে জাতিসত্তা নিয়েও সৃষ্টি হলো বিভ্রান্তি। জাতীয় জীবনে এটা ছিল সবচেয়ে ক্ষতিকর একটি পদক্ষেপ।

১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতের লোকসভায় প্রদত্ত বক্তৃতায় ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন—'বাংলাদেশের নেতারা অঙ্গীকার করেছেন, তারা বাংলাদেশকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বানাবেন।' এটাই কি কারণ, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা বা অধার্মিকতাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ঘোষণা করার। অথচ শেখ মুজিবুর রহমান দেশে প্রত্যাবর্তনের দিনই (১০ জানুয়ারি, ১৯৭২) ঘোষণা করেছিলেন—'বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ।' তিনি আরও বলেছিলেন—'আমি একজন বাঙালি, আমি একজন মুসলমান এবং মুসলমান একবারই মরে।' তিনি রেসকোর্সে ঘোড়দৌড়ের নামে চলা জুয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বাংলাদেশে ৯০% মুসলমানের বিশ্বাসভিত্তিক গণতন্ত্র অর্থাৎ মুসলিম ডেমোক্র্যাসি চলতে পারে, যেমন খ্রিষ্টান দেশগুলোতে থাকে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাসি। জাতির আদর্শিক লক্ষ্য সম্পর্কে আওয়ামী লীগের সুনির্দিষ্ট অবস্থান না থাকার কারণেই পরস্পরবিরোধী আদর্শকে মূলনীতি ঘোষণা করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শের নামে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, তার সুযোগ নিয়ে নাস্তিক-কমিউনিস্টরা, বিশেষ করে মস্কোপন্থি কমিউনিস্টরা আমাদের নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করে যাচ্ছে। ইসলামের বিরোধিতাই নাস্তিক-কমিউনিস্ট ও তথাকথিত প্রগতিশীলদের মূল লক্ষ্য। এদের যত আক্রোশ, সব যেন ইসলামের বিরুদ্ধে। ইসলাম শান্তি ও উদারতা, সর্বজনীন মানবাধিকার, সকল মানুষের ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধর্ম।

ইসলামের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনা হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ করলে সাম্প্রদায়িকতা নষ্ট হয় না। অথচ অধার্মিকতা বা ধর্মনিরপেক্ষতার দাবিদারগণ ইসলামী দল বা সংগঠনকে সাম্প্রদায়িক

www.pathagar.org

মৌলবাদী ইত্যাদি অপবাদ দিয়ে প্রোপাগান্ডা চালায়। আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় ধর্মবিরোধী ও বামপন্থিরা অত্যন্ত সফলভাবে বাংলাদেশে আদর্শিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, যার একটা সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজে। একসময়কার মুসলিম লীগের শেখ মুজিব, গণতন্ত্রী শেখ মুজিব হঠাৎ সমাজতন্ত্রী হতে গিয়ে নিজেও যেন পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন।

(রাত ১২:৩০ টা; ১৩ আগস্ট, ২০১৩)

www.pathagar.org

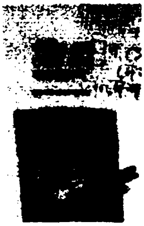

প্রশাসনিক ব্যর্থতা :
দলীয় লোকদের বেপরোয়া ও নিয়ন্ত্রণহীন লুটপাট

বাংলাদেশের ৪২ বছরের ইতিহাসে আমার চোখের সামনে এত সব ঘটনা ও পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে, জানি না খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করলেও শেষ করতে পারব কি না। আমার সংগৃহীত বইপুস্তকগুলোতে অনেক ঘটনা ও নানা প্রসঙ্গ পাওয়া যাবে। কিন্তু সব তথ্য ও ঘটনা একসাথে পাওয়া যাবে না। তাই আমার চেষ্টা হলো—খুব সংক্ষেপে সেসব ঘটনা যথাসম্ভব উল্লেখ করা।

স্বাধীনতার আগে ও পরে রাজনৈতিক কর্মসূচি, দৃষ্টিভঙ্গি ও আবেদন একরকম হতে পারে না। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য রাজপথ কাঁপানো আন্দোলনের প্রয়োজন হয়। জনগণকে উদ্‌বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার জন্য উত্তেজনাকর বক্তব্য দিতে হয়। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষায় কথা বলতে হয়। আর স্বাধীনতা লাভের পর অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় দেশ গড়ার কাজে মনোনিবেশ করতে হয়। রাজপথে উত্তেজনা সৃষ্টি, প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার পরিবর্তে জাতীয় ঐকমত্য ও সংহতি গড়ে তুলতে হয়। দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে সকল মানুষকে সাথে নিয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার কাজ করতে হয়। বক্তৃতা-বিবৃতি ও স্লোগানের পরিবর্তে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, শিক্ষা ও জনহিতকর কাজকে গুরুত্ব দিতে হয়। দেশের মানুষের দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করার জন্য যথোপযুক্ত কর্মপরিকল্পনা নিতে হয়। দেশকে ব্যক্তি ও দলের ওপরে স্থান দিতে হয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আওয়ামী লীগ এবং স্বয়ং শেখ মুজিব রাজপথ ও বিক্ষোভের রাজনীতিতে যতটা পারদর্শী ছিলেন, রাষ্ট্রপরিচালনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে ছিলেন ততটাই দুর্বল ও অদক্ষ। সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো, আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার পাশাপাশি শেখ মুজিবের চারপাশে চাটুকারদের সমাবেশ ও ভিড় জমেছিল। তা ছাড়া শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিত্ব এতটাই উচ্চতায় পৌঁছেছিল যে, কারও পক্ষে তার সামনে দাঁড়িয়ে সাহস করে সত্য কথা বলাটাও ছিল কঠিন। উপরন্তু তিনি সমালোচনা বরদাশত করতেন না।

www.pathagar.org

তার সমকক্ষ কোনো নেতা ছিলেন না। তার সামনে সবাই ছিলেন অনুগত কর্মী ও ভক্তমাত্র। যার ফলে প্রশাসনে কোথায় কী করতে হবে, এই আলোচনা উত্থাপনের চেয়ে সবাই শেখ সাহেবের প্রশংসাই করতেন বেশি। এজন্য মতলববাজ-চাটুকাররাই বেশি দায়িত্ব পেত। সারা দেশে দলের লোকেরা ক্ষমতার দাপটে সাধারণ মানুষের ওপর নানাভাবে জুলুম-অত্যাচার শুরু করে। দলের একেকজন কর্মী শেখ মুজিবুর রহমান বনে যায়।

ক্ষমতার অপব্যবহার, পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল, শত্রুতামূলক মামলা-মোকদ্দমা দিয়ে মানুষকে হয়রানি, সরকারি অফিসগুলোকে দলীয় আখড়ায় পরিণত করা, সাহায্য ও রিলিফের মালামাল লুটপাট করা ইত্যাদির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ দেশময় এক ত্রাসের রাজত্ব শুরু করে। ওদিকে বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের কারণে দেশে ব্যাপকভাবে অপরাধ, ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি বেড়ে যায়। দল ও সরকার একাকার হয়ে যাওয়ায় প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে; বিশেষ করে দলীয় হস্তক্ষেপের কারণে। দলীয় লোকদের রিক্রুট করে প্রশাসনে বসানোর ফলে এক লেজেগোবরে অবস্থার সৃষ্টি হয়। দলের এমপি, মন্ত্রী, নেতা ও পাতি নেতারা নিজেদের আখের গোছাতে গিয়ে দেশটাকে যেন খাবলে খাবলে খেয়ে ফেলছিল। একপর্যায়ে সবকিছু শেখ মুজিবের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং জননন্দিত এই নেতা কার্যত জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। দলীয়করণের পাশাপাশি আত্মীয়করণ ও স্বজনপ্রীতিও এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী। লাইসেন্স পারমিটও দুর্নীতির আরেকটি উৎসে পরিণত হয়। এ সময় মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি, গুলশান, বনানীতে উর্দুভাষীদের বাড়ি ও সম্পত্তি দখলেরও মহোৎসব চলে। আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীরা ধরে নেয় যে, দেশ তারা স্বাধীন করেছে, তাই সবকিছু ভোগদখল করা তাদেরই অধিকার। জাল দলিলপত্র দিয়ে ধানমন্ডি, গুলশান, বনানীর অনেক মূল্যবান বাড়ি, জমি ও শিল্পকারখানাও দখল করে নেওয়া হয়। শেখ সাহেব নিজেই আফসোস করেছেন—'আমার ডানে চোর, বামে চোর, সামনে চোর, পেছনে চোর। সবাই পায় সোনার খনি আর আমি পেয়েছি চোরের খনি।'

শেখ মুজিব তখনকার রেডক্রসের সভাপতি আওয়ামী লীগ নেতা গাজী গোলাম মোস্তফাকে প্রকাশ্য সভায় জিজ্ঞেস করেন—'বিদেশ থেকে সাহায্য হিসেবে আট কোটি কম্বল এলো, কিন্তু আমার ভাগের কম্বলটা কই?' উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে রিলিফের লুট হওয়া মালামাল কলকাতায় বিক্রি হয়েছে। দেশের জনগণ আওয়ামী লীগারদের 'কম্বলচোরা' বলে ডাকা শুরু করেছিল।

www.pathagar.org

অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ব্যর্থতা, দুর্নীতি, লুটপাট, রিলিফ চুরি, সরকারি সম্পত্তি আত্মসাতের কারণেই ১৯৭৪ সালের ভয়ংকর দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায়। চাল, ডাল, তেল, নুনের দাম মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। খাদ্যাভাব এতই প্রকট হয়েছিল যে, টাকা থাকলেও খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যেত না। চালের দাম ৮ আনা থেকে ২০ টাকা এবং লবণের দাম ৪ আনা থেকে ২০ টাকা হয়ে গিয়েছিল। কাপড়ের অভাবে মাছ ধরার জাল পরিধান করে লজ্জা নিবারণের চেষ্টারত এক মহিলার ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে সারা বাংলাদেশের বিস্তৃত এলাকায় অনাহারে মৃত মানুষের লাশ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে।

খাদ্যের অভাবে বানের পানির মতো মানুষ রাজধানী ঢাকায় আসতে থাকে। রেলস্টেশনে জীবন বাঁচানোর জন্য মানুষ মানুষের বমি খাওয়ার ছবি, ডাস্টবিন থেকে খাদ্য কুড়িয়ে খাওয়ার দৃশ্য পত্রিকার পাতায় ছাপা হয়েছে। এই দুর্ভিক্ষ ছিল সম্পূর্ণ মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ।

মানুষের জন্য কষ্টের ব্যাপার ছিল, দেশে এমন ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের বছরই শেখ সাহেবের পুত্রের বিবাহের অনুষ্ঠানে তার মাথায় সোনার মুকুট পরানো হয়। বিয়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয় বর্তমান গণভবনে। বৃষ্টি-বাদলার দিন ছিল। গণভবনের সামনের রাস্তার অবস্থাও ভালো ছিল না। অনেক অতিথি ও মেহমানের ভিড় হওয়ার কারণে গণভবনের সামনে প্রচণ্ড যানজট হয়েছিল। ঘটনাক্রমে আমি সেদিন কী একটা কাজে মিরপুর গিয়েছিলাম, ফেরার পথে বেবিট্যাক্সিতে করে আসছিলাম। গণভবনের সামনে অস্বাভাবিক যানজটের কারণে বেবিট্যাক্সি চালক শেখ সাহেবের নাম ধরে গালিগালাজ করছিল এবং স্বগতোক্তির মতো অনেক কথা বলছিল। সেদিন জনগণ খুবই বিক্ষুব্ধ হয়েছিল।

গণভবনের বিয়ের অনুষ্ঠানে শেখ-তনয়ের মাথায় সোনার মুকুট পরার কাহিনি বেবিট্যাক্সি চালকের কাছেই জেনেছিলাম। এত বড়ো নেতার নাম ধরে গালিগালাজ করছে লোকটা, এজন্য আমার খুব ভয় হচ্ছিল। সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম, বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ও জননন্দিত নেতার জনপ্রিয়তায় ধস নামছে।

(রাত ২:১৫ টা; ১৪ আগস্ট, ২০১৩)

www.pathagar.org

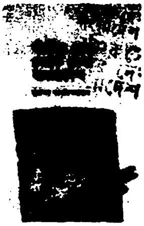

দালাল আইন, সাধারণ ক্ষমা ও
১৯৫ যুদ্ধাপরাধীর বিচারে ১৯৭৩-এর আইন

প্রিয় ওয়ামী! গত দুদিন লেখা হয়নি। গোটা রমজান মাসেই রাতে ঘুমাইনি। ফজর পড়ে যতটুকু সম্ভব ঘুমিয়েছি। এখন আবার ছয়টি নফল রোজা করার নিয়ত করে শুরু করেছি। রাতে না ঘুমানোর কারণে হয়তো-বা শরীরে ক্লান্তি এসেছে। তা ছাড়া চেয়ার-টেবিল ছাড়া আর কতটাই-বা লেখা যায়। ফ্লোরের বিছানায় বসেই লিখতে হয়। কখনও উপুড় হয়ে বা কখনও পা ছড়িয়ে লিখি। টুলে বসে লিখতে গেলেও কোমরে চাপ পড়ে। ডিভিশনে যখন ছিলাম, তখন এ সমস্যাগুলো ছিল না। রায় হওয়ার পর ফাঁসির সেলের বাসিন্দা হওয়ায় সবকিছুই বদলে গেছে।

ডিভিশনে আরও কয়েকজন থাকায় আমরা একটা পরিবারের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। কখনও সংখ্যা বেড়েছে, আবার কখনও কমেছে। সেখানে জীবনটা ছিল বেশ রুটিনমাফিক। সকালে ৯:৩০ টায় একসঙ্গে নাশতা। তারপর পত্রিকা পাঠ। দুপুরে জোহরের নামাজের পর খেয়ে বিশ্রাম। একসঙ্গে জামায়াতে নামাজ আদায়। সকাল-বিকাল হাঁটাহাঁটি অথবা শীত মৌসুমে ব্যাডমিন্টন খেলা। মাঝেমধ্যে ট্রাইবুনালে ও হাসপাতালে যাওয়া। প্রতি সপ্তাহে পরিবারের লোকদের সাথে সাক্ষাৎ। এভাবেই বলা যায় ব্যস্ততার মধ্যে সময়টা কেটে গেছে। তা ছাড়া কমপক্ষে তিন বেলা সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা একসাথে নাশতা, খাওয়াদাওয়া, বিকেলে চা-কফির মাঝে রাজনৈতিক আড্ডা, নানা বিষয় নিয়ে জ্ঞানমূলক আলোচনা চলত। ৪০ সেলের ২১ নং কক্ষের অধিবাসী হওয়ার পর নিঃসঙ্গ সময় কাটাতে হয়, কথা বলার মতো কোনো লোক নেই। একজন ক্যাপ্টেন (রেজা) এখানে ছিল, আমি আসার পর তাকে স্থানান্তর করে নেওয়া হয়েছে ৩-৪ দিনের মাথায়। সে থাকাকালে সকালেই ফজরের পর আমার জন্য চা-বিস্কুট পাঠাত এবং খোঁজখবর নিত, কথাবার্তা হতো; কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা পছন্দ করেনি।

www.pathagar.org

আবার আরেকটি দুরন্ত ছেলে সোহেল রিয়াজকেও আমার ব্লক থেকে নিয়ে যাওয়া হয় একই কারণে। সাগর নামে একটি ছেলে ছিল আমার পাশের কক্ষে। একদিন তাকেও সরিয়ে দুই নম্বর ব্লকে নেওয়া হলো। এরা দুজনই খুবই ভালো ছেলে এবং আমার প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল ছিল।

সাগর আমাকে মামা বলে সম্বোধন করে আর সোহেল রিয়াজ সম্বোধন করে আংকেল বলে। শরীফ নামে জেএমবির মামলায় আটক একজন উচ্চশিক্ষিত ছেলে এখানে ছিল। সে প্রায়ই কোর্টে হাজিরা দিতে যায় এবং অনেক খোঁজখবর নিয়ে আসে। সে আবার ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার আসামি। তাকে সরানো হলো এক নাম্বার ব্লকে। এখন দেখাসাক্ষাৎও হয় না। তবে ভাগনে ও ভাতিজা প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই মাঝেমধ্যে আমার সাথে দেখাসাক্ষাৎ করে এবং খোঁজখবর নেয়। এরা তো জুনিয়র ছেলেপেলে। তবে সোহেল খুবই রাজনীতি-সচেতন ছেলে। তারা প্রথম দিকে আমার জন্য খাতা-কলম জোগাড় করে দিয়েছিল। বিশেষ করে সোহেল কোর্টে যাওয়ার আগেই বারবার বলবে—'আংকেল, আপনার জন্য কী আনতে হবে বলুন।' অন্যান্য ফাঁসির আসামিদের মধ্যে বয়সে যারা যুবক, তারা সবাই স্যার বলে সম্বোধন করে। নিষেধাজ্ঞা থাকায় আমার কক্ষে আসতে তারা সাহস করে না। তবে বয়সে যারা যুবক, তারা খুবই সম্মান করে এবং সকালে বা বিকালে যখন হাঁটতে বের হই, তখন কথা বলার চেষ্টা করে।

আমার সাথে কয়েকজন কট্টর ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগার আছে, তাদের সাথেও সম্পর্ক ভালো। সবাই মনে করে, আমি হয়তো-বা অল্পদিন এখানে আছি অথবা সরকার বদলালেই মুক্তি পেয়ে যাব। এরা কেউই বিশ্বাস করে না যে, শেষ পর্যন্ত আমাদের দণ্ড কার্যকর হবে। ওরা বলে—'স্যার, আপনি তো এখানকার অস্থায়ী বাসিন্দা। কদিন পরই আল্লাহর ইচ্ছায় চলে যাবেন।' কারারক্ষীরা খুবই আন্তরিক, বিশেষ করে যারা বয়সে নবীন, তারা তো সরকারকে রীতিমতো গালিগালাজ করে। যেহেতু আমার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা একজন করে আলাদা কারারক্ষীকে ডিউটিতে রাখা হয়েছে, সেহেতু তারা এসেই আমার খোঁজখবর নেয়, কোনো কিছু প্রয়োজন আছে কি না জিজ্ঞাসা করে। এখানে জেল সুপার, জেলার ও ডেপুটি জেলাররাও আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেন। জেলার সুভাষ কুমার ঘোষ এলে বলেন—'আপনার কোনো অসুবিধা থাকলে বলেন, আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করব।' আমি ধন্যবাদ জানাই। অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা লিখে ফেললাম।

www.pathagar.org

১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি কলাবরেটরস আইন করা হয় অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে। এই আইন করার আগেই পাকিস্তানপন্থি বলে পরিচিত রাজনীতিক, শিক্ষক, আইনজীবী, সরকারি কর্মচারী, আলেম, পীর-মাশায়েখসহ সর্বশ্রেণির লক্ষাধিক মানুষকে গ্রেফতার করে জেলখানাগুলো ভরতি করে ফেলা হয়। জেলখানাগুলোর যে ক্যাপাসিটি ছিল, তার ১০ গুণ বেশি লোক গ্রেফতার করা হয়। দালাল আইনের ভিত্তিতে বিচার করার জন্য সারা দেশে ৭২টি ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। ৩৭ হাজার লোকের বিরুদ্ধে দালাল আইনে অভিযোগ আনা হয়। এদের মধ্যে বিচার না করেই অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব নিজের উদ্যোগে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মুক্তির ব্যবস্থা করেন। তাদের মধ্যে মুসলিম লীগ নেতা খান এ সবুর খান, খাজা খয়ের উদ্দিন আহমদ ও শাহ আজিজুর রহমানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুক্তি পাওয়ার পর তাদের বাসস্থান ও নিরাপত্তার ব্যবস্থাও তিনি করেন।

এদিকে মওলানা ভাসানী, অধ্যাপক আবুল ফজল, আবুল মনসুর আহমদসহ অনেক প্রবীণ নেতা দালাল আইন বাতিলের দাবি করতে থাকেন এবং বিচার না করার জন্য লেখালিখি করেন। ১৯৭৩ সালেই শেখ মুজিব দেশের জনমত উপলব্ধি করে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। নির্দিষ্ট কোনো মামলা না থাকায় এর আগেই অধিকাংশ লোক মুক্তি পেয়েছিলেন। যে ৩৭ হাজার মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তাদের মধ্যে যাদের ব্যাপারে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ আছে, তারা বাদে বাকিদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে। এ বছরই ১৬ ডিসেম্বর সাধারণ ক্ষমার আওতায় ২৫ হাজার লোক মুক্তি পায়। বাকি যে ১২ হাজার অভিযুক্ত ছিল, তাদের বিরুদ্ধে বিচারকাজ শুরু হলে ২৮০০ লোকের বিচার সম্পন্ন হওয়ায় তাদের মধ্যে ৭৫২ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেওয়া হয়।

এরপর আসলে সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে মামলাগুলো চলছিল না এবং মামলা নিষ্পত্তিতে গতি শ্লথ হয়ে আসে। ইতোমধ্যে ৭৪-এর দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ভেঙে জাসদের উত্থান, সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে দেশব্যাপী সর্বহারাদের সশস্ত্র সংগ্রাম, ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি একদলীয় বাকশাল প্রতিষ্ঠা, ১৫ আগস্ট সেনা-অভ্যুত্থানে সপরিবারে শেখ মুজিবের মর্মান্তিক মৃত্যু এবং ৭ নভেম্বর গণ-অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমানের উত্থান ইত্যাদি অনেক ঘটনা ঘটে যায়। এসব ব্যাপারে আলাদাভাবে আলোকপাত করার ইচ্ছা আছে।

www.pathagar.org

এখানে আরেকটি বিষয়ে আলোচনা করব। সেটা হলো, শেখ মুজিবের জীবদ্দশায় পার্লামেন্টে ১৯৭৩-এর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল আইন পাশ। কিন্তু এই আইনটি যে ১৯৫ জন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাকে বিচার করার জন্য পাশ করা হয়েছিল, তা কেবল কাগজে-কলমেই থেকে গেল। ১৯৭৪ সালেই ত্রিদেশীয় দিল্লিচুক্তির মাধ্যমে ১৯৫ জন পাকিস্তানি কর্মকর্তা, যাদেরকে তালিকাভুক্ত যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, শেখ মুজিব তাদের ক্ষমা করে দিয়ে পাকিস্তানে ফেরত পাঠান। ১৯৭২ সালে দালাল আইন পাশ, ১৯৭৩ সালে সাধারণ ক্ষমা, ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল আইন পাশ এবং ১৯৭৪ সালেই যাদের জন্য এই আইনটি পাস হয়েছিল, তাদের মুক্তি দানের ঘটনা ঘটে। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, শেখ মুজিব নিজেই জাতির বৃহত্তর স্বার্থে পাক বাহিনীর সহযোগী ও পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিষয়টি নিষ্পত্তি করে দিয়েছিলেন।

১৯৭৫ সালে প্রেসিডেন্ট সায়েম দালাল আইন বাতিল করে পাক বাহিনীর যেসব সহযোগীর সাজা হয়েছিল এবং যেসব মামলা সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে চলছিল না, তার একটি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে শেখ সাহেবের কাজেরই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছিলেন মাত্র। শেখ মুজিবের নিজ দেশের নাগরিকদের বিচার করে জাতিকে বিভক্ত করার কোনো ইচ্ছা বা পরিকল্পনা ছিল না। বামপন্থি বা প্রতিহিংসাপরায়ণ কিছু লোকের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ১৯৭২ সালের দালাল আইন বা ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল আইন করেছিলেন বটে, কিন্তু বাস্তবায়নের পক্ষে তিনি ছিলেন না। তা-ই যদি হতো, তাহলে এত অল্প সময়ের ব্যবধানে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা এবং পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের তিনি মুক্তি দিতেন না। এখন শেখ হাসিনা বা মস্কোপন্থি কমিউনিস্টরা যেসব ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন যে, বঙ্গবন্ধু এদের বিচার শুরু করেছিলেন, কিন্তু তাকে হত্যা করায় তিনি তা সম্পন্ন করে যেতে পারেননি—এর সবই মিথ্যাচার। কারণ, শেখ মুজিব নিহত হওয়ার অনেক আগেই সাধারণ ক্ষমা ও পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি দিয়েছিলেন। শেখ মুজিব বেঁচে থাকলে দালাল আইনও বাতিল করে দেওয়ার প্রক্রিয়ার দিকেই তিনি এগোচ্ছিলেন। আর তিনি জীবিত থাকলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নও আসত না।

৪২ বছর পর আওয়ামী লীগ এখন যা করছে, তা সম্পূর্ণরূপে শেখ মুজিবের চিন্তাচেতনার বিরোধী। তিনি যদি বিচারই করতে চাইতেন, তাহলে নিজ

www.pathagar.org

দায়িত্বে সবুর খান, খাজা খয়ের উদ্দিন ও শাহ আজিজকে মুক্তি দিতেন না। সবুর খান ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী মুসলিম লীগ নেতা ও আইয়ুব খান সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি জাতীয় পরিষদে সরকারি দলের নেতা (লিডার অব দ্য হাউজ) দিলেন। খাজা খয়ের উদ্দিন পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটির সভাপতি ছিলেন এবং শাহ আজিজ পাকিস্তানের পক্ষে প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য হিসেবে জাতিসংঘে গিয়েছিলেন সেই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে।

এ কথা সত্য যে, শেখ মুজিব বিচার শুরু করছিলেন এবং তিনি বিচার শেষও করে দিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালে মুক্তি দেওয়ার পর ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত জীবিত থাকাকালে কি তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন বা তিনি জীবিত থাকলে কি পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জন্য আবার বাংলাদেশে নিয়ে আসতেন? অথচ শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগার এবং তাদের সহযোগী মস্কোপন্থি নাস্তিক-কমিউনিস্টরা জাতিকে বিভ্রান্ত করছে যে, বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করেছিলেন, কিন্তু তাকে হত্যা করার ফলে বিচারকাজ বন্ধ হয়ে যায়।

শেখ মুজিব জীবিত থাকাকালে তো যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কোনো কাজই শুরু করেননি। এমনকি বিগত ৩৭ বছরেও ১৯৭৩ সালের আইনটি কার্যকর হয়নি। এখন প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে কিছু বামপন্থিদের খুশি করার জন্য পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দালাল আইন পুনরুজ্জীবিত করেছে আওয়ামী লীগ। কিন্তু বিগত সাড়ে চার বছরেও তো একজন লোককেও সেই দালাল আইনে বিচারের আওতায় আনা হয়নি। সম্ভবত হাতের পাঁচ হিসেবে দালাল আইন পুনরুজ্জীবিত করে রাখা হয়েছে, যদি প্রয়োজন হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল আইনটি (অবশ্য তিনটি সংশোধনীর পর) যেমন এখন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে খতম করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, তেমনই প্রয়োজনে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সেই কালো আইনটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

(ভোর ৩:৩০ টা; ১৭ আগস্ট, ২০১৩)

www.pathagar.org

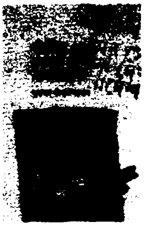

রক্ষীবাহিনী গঠন ছিল একটি ভুল পদক্ষেপ

স্বাধীনতা-উত্তরকালে সাড়ে তিন বছরের শাসনে শেখ মুজিবুর রহমান যেসব ভুল পদক্ষেপ বা সিদ্ধান্ত নেওয়ায় জনমনে অনাস্থা ও প্রশ্নের সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে রক্ষীবাহিনী গঠন অন্যতম। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পোশাকের আদলে রক্ষীবাহিনীর পোশাক নির্ধারণ, উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিতকরণ, সেনাবাহিনীর সমান গুরুত্ব প্রদান অথবা সেনাবাহিনীর সমান্তরাল আরেকটি বাহিনী গঠন করায় শুরুতেই রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে সমালোচনা ওঠে। এমনকি মনে করা হয়, হয়তো ভারতের নীলনকশা অনুযায়ীই এ বাহিনীটি গঠন করা হয়। এতে সেনাবাহিনীর মাঝেও প্রশ্নের সৃষ্টি হয়।

তা ছাড়া রক্ষীবাহিনীর অতিরিক্ত ক্ষমতা-প্রয়োগ ও বিরোধী মতাবলম্বীদের ওপর নির্যাতন ও দমনমূলক আচরণ মুজিব সরকারের জনপ্রিয়তার ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। রক্ষীবাহিনী একটি ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। অসংখ্য রাজনৈতিক নেতাকর্মী রক্ষীবাহিনীর জুলুম-নিপীড়নের শিকার হন। পরবর্তী সময়ে রক্ষীবাহিনী বিলুপ্ত করায় প্রমাণিত হয় যে, ওই বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্তটি ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্ত।

১৫ আগস্ট ভোরে যখন শেখ মুজিবকে বিদ্রোহী একদল সেনাসদস্য হত্যা করে, তখন রক্ষীবাহিনী কোনো কাজে আসেনি। এত বড়ো ঘটনার পরও তা প্রতিরোধ করার জন্য বিদ্রোহী সেনাসদস্যদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করেনি কেন—তা আজও রহস্যাবৃত। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমদ রক্ষীবাহিনীর দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বা তদানীন্তন রক্ষীবাহিনীপ্রধান কেন কোনো ব্যবস্থা নেননি, তা বলা কঠিন। পরবর্তী সময় এ নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রাজ্জাক রক্ষীবাহিনীর দায়িত্বে অবহেলার জন্য বিবৃতিতে তোফায়েল আহমদকে দোষারোপ করেছিলেন। এ সম্পর্কে পত্রপত্রিকার তাদের পালটাপালটি বিবৃতি আমরা

www.pathagar.org

দেখেছি। রক্ষীবাহিনী সদর দফতর ছিল শেরেবাংলা নগরে। সেই সদর দফতরের সামনে দিয়ে গুলিবিহীন ট্যাংক ৩২ নংয়ের বাড়ির দিকে গিয়েছে; অথচ রক্ষীবাহিনী তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেনি।

১৯৭৩ সালের নির্বাচন : কারচুপির কি আদৌ প্রয়োজন ছিল

১৯৭৩ সালে দেশের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনে বেশ কিছুসংখ্যক বিরোধীদলীয় ও স্বতন্ত্র সদস্য জয়লাভ করলে নির্বাচনের ফলাফল পালটিয়ে দেওয়া হয়। হেলিকপ্টারে করে ব্যালটবক্স ঢাকায় এনে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। তখনকার রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বড়ো জোর ২০ থেকে ২৫ জন সরকারবিরোধী সদস্য নির্বাচিত হতেন, যদি জোরপূর্বক ফলাফল পালটে না দেওয়া হতো। যাদের নির্বাচনে হারানো হয়েছিল, তাদের মধ্যে দাউদকান্দির আবদুর রশিদ ইঞ্জিনিয়ার, টাঙ্গাইলের আলিম আল রাজি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অলি আহাদ, বরিশালের মেজর জলিল ও ডা. আজহার উদ্দীনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যতদূর মনে পড়ে, সে নির্বাচনে জাসদের ও স্বতন্ত্র সদস্যসহ মাত্র ৭ জন সংসদে বিরোধী দলের সদস্য হয়েছিলেন। এমন কী ক্ষতি হতো, যদি সুষ্ঠু নির্বাচনে ২০-২৫ জন সদস্য বিরোধী দলের নির্বাচিত হয়ে আসতেন। সে সময় জাসদের আবদুল্লাহ সরকার, আবদুস সাত্তার প্রমুখ নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সংবিধানের ২য় সংশোধনীর মাধ্যমে জরুরি আইন জারির বিধান

১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর সংবিধানের ২য় সংশোধনী আইন পাশ করার মাধ্যমে সংবিধানের নবম ভাগের পর নবম-ক ভাগ সংযোজন করে জরুরি আইন জারির বিধান করা হয়। জরুরি আইন বলে মৌলিক অধিকার রহিতকরণের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করা হয়। যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণের আশঙ্কা বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের বিপদ আসন্ন বলে প্রতীয়মান হলে দেশের কোনো অংশে বা সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান রাখা হয় এই সংশোধনীর

www.pathagar.org

মাধ্যমে। আওয়ামী লীগের শাসনামলেই দেশে প্রথম জরুরি আইন জারি করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়েও এই আইনটির অপপ্রয়োগ করে দেশে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করা হয়। তা ছাড়া আওয়ামী লীগই ১৯৭৪ সালের কুখ্যাত বিশেষ ক্ষমতা আইন পাশ করে। এই বিশেষ ক্ষমতা আইনে নিবর্তনমূলক আটকের অগণতান্ত্রিক বিধান, বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করা এবং প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তিকে দমন করার তাবৎ ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন সরকার এই কালো আইনের অপপ্রয়োগ করছে বারবার। শেখ মুজিবের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থন থাকার পরও ভিন্ন মতাবলম্বীদের দমনের জন্য এই কালাকানুন করার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

যেহেতু ভিন্নমত আওয়ামী লীগ সহ্য করতে পারে না, তাই এসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়; যার কারণে নিবর্তনমূলক আটকাদেশের ফলে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের পথ প্রশস্ত হয়। জরুরি আইন ও বিশেষ ক্ষমতা আইনের মাধ্যমে সংবিধানপ্রদত্ত অধিকার হরণ করে ভিন্নমতের লোকদের ওপর নিপীড়ন চালিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকাশের পথে আওয়ামী লীগই প্রথম অন্তরায় সৃষ্টি করে। এর ফলাফল জাতি এখনও ভোগ করছে।

(রাত ১২:০০ টা; ১৮ আগস্ট, ২০১৩)

www.pathagar.org

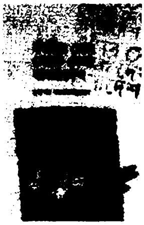

প্রবাসী সরকার ও তাজউদ্দীন আহমদের প্রতি আচরণ

তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত প্রবাসী সরকারই বাস্তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছে। শেখ সাহেবকে এই সরকারে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দিয়ে তার অনুপস্থিতির কারণে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি করে প্রবাসী সরকার কাজ করে। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ অসাধারণ পরিশ্রম করেছেন এবং দলের একটি শক্তিশালী গ্রুপের বৈরিতার মধ্যেও ধৈর্য ও প্রজ্ঞার সাথে প্রবাসী সরকারের নেতৃত্ব দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যের বন্দরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তিনি শেখ মুজিবের খুবই বিশ্বস্ত ও দীর্ঘদিনের সহকর্মী এবং দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু শেখ সাহেব দেশে ফিরে এসেই দুই দিনের মাথায় নিজেই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেন এবং তাজউদ্দীন আহমদকে সাইডলাইনে ঠেলে দিলেন। তাকে দেওয়া হলো অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হলো। বলা হয়ে থাকে যে, শুরুতেই প্রবাসী সরকার বা মুজিবনগর সরকারের সাথে শেখ সাহেবের একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়। যেহেতু তিনি প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেননি এবং তাজউদ্দীন আহমদই প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাই তাজউদ্দীনের প্রভাব ও জনপ্রিয়তাকে তিনি ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখতেন। এ মন্তব্য অনেক রাজনীতিবিশ্লেষকের। শেখ সাহেব তার জীবদ্দশায় একটি দিনের জন্যও মুজিবনগরে, যেখানে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের শপথ হয়েছিল, সে জায়গাটি পরিদর্শনে যাননি। প্রবাসী সরকারের নামটাও তিনি উচ্চারণ করতেন না। মুজিবনগর সরকারের ব্যাপারে শেখ মুজিবের কেন এমন উদাসীনতা ছিল, তা কিন্তু ছোটো প্রশ্ন নয়।

যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা শেখ সাহেবের ভাগনে ফজলুল হক মনির তখন বিরাট প্রভাব ছিল। তাজউদ্দীন আহমদের প্রতি ঈর্ষাকাতর ফজলুল হক মনির অনেক কানকথা শেখ সাহেবের সাথে তাজউদ্দীনের দূরত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

www.pathagar.org

তাজউদ্দীন আহমদের প্রায় ২৯ দিনের এক দীর্ঘ বিদেশ সফর থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনকালে কলকাতা ও ঢাকা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সাথে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং পররাষ্ট্রবিষয়ক একটি ব্যাপারে মন্তব্য করেন, যা শেখ সাহেবকে বিক্ষুব্ধ করে বলে জানা যায়। দেশের পরিস্থিতি নিয়ে সকল দলের সমন্বয়ে বৈঠক করার ব্যাপারে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দেবেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। এর মাত্র কয়েক দিন পরই তাকে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করার জন্য বলা হলো শেখ সাহেবের পক্ষ থেকে। তিনি সাথে সাথেই পদত্যাগ করলেন, কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া বা নেতার প্রতি কোনো অসন্তোষ তিনি প্রকাশ করেননি।

ও মনে পড়েছে! স্বাধীন দেশ সিকিম পার্লামেন্টে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারতের সাথে একীভূত হওয়া সম্পর্কে তাজউদ্দীন আহমদকে কলকাতার সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে, তিনি এটাকে সিকিমের জনগণের জন্য বড়ো অর্জন বলে মন্তব্য করেছিলেন। তখনও সিকিমের ব্যাপারে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। শেখ সাহেব তাজউদ্দীন আহমদের এই মন্তব্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বা তাকে এসব ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ করা হয়েছিল। এরপর তাজউদ্দীন আহমদ অনেকটাই নির্লিপ্ত হয়ে যান। জনগণের মধ্যে এ নিয়ে অনেক বিভ্রান্তিও সৃষ্টি হয়। অনেকে মনে করেন যে, তাজউদ্দীন আহমদ বেশি ভারতঘেঁষা হওয়ার কারণেই শেখ সাহেব তাকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

আসলে তাজউদ্দীন আহমদ আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির শিকার হয়েছিলেন। তাজউদ্দীন এবং মুজিবনগর সরকার বা প্রবাসী সরকার এখনও আওয়ামী লীগের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয়। মুজিবনগরে সেদিন যারা প্রবাসী সরকারের সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন, তাদের নামও সঠিকভাবে উচ্চারণ করা হয় না। আর সেই দিবসটি যে গুরুত্বের সাথে পালন করা উচিত, আওয়ামী লীগ সেটাও করে না। মুক্তিযুদ্ধে তাজউদ্দীন আহমদের যে অবদান, তার সঠিক মূল্যায়ন আওয়ামী লীগ করে না। আমি এখনও বুঝতে অক্ষম, শেখ মুজিব কেন তাজউদ্দীন আহমদকে ওভাবে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন!

(ভোর ৩:৩৫ টা; ১১ আগস্ট, ২০১৩)

www.pathagar.org

ভারতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও লাহোরে ওআইসি সম্মেলনে যোগদান

প্রিয় ওয়ামী! ফাঁসির সেলে আমার হাতের কাছে রেফারেন্স বইপুস্তক নেই। তাই সম্পূর্ণরূপে স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করেই আমাকে লিখে যেতে হচ্ছে।

১৯৭৪ সালে লাহোরের ঐতিহাসিক গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ওআইসির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভার কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্য ও তাজউদ্দীন আহমদসহ লাহোরের সম্মেলনে যাওয়ার বিরোধিতা করেন। খন্দকার ওবায়দুর রহমান ও তোফায়েল আহমদের কাছ থেকে শোনা বর্ণনামতে বলা যায়, পুরো মন্ত্রিসভা ওআইসির সম্মেলনে শেখ সাহেবের যোগদানের বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু তিনি এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং বলেন—'দেশের স্বার্থেই মুসলিম বিশ্বের সাথে আমাকে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে হবে।' এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তিনি মুসলিম বিশ্ব ও পাকিস্তানের সাথে একটি সুসম্পর্ক গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করেন। এটা ছিল তার প্রজ্ঞা ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

পরে দুজন আওয়ামী লীগ নেতার কাছ থেকে শুনেছিলাম, শেখ সাহেব যখন বিমানে ভারতীয় আকাশসীমা অতিক্রম করেন, তখন বিমান থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বার্তা পাঠিয়ে ছিলেন। অর্থাৎ, তিনি জানান দিয়েছিলেন যে, আপনাদের আপত্তি সত্ত্বেও আমি ওআইসির সম্মেলনে যোগদান করছি। শেখ সাহেব মন্ত্রিসভার সদস্যদের এটাও বলেছিলেন—'আমার দেশ গড়ে তুলতে হলে মুসলিম বিশ্বের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে।'

শেখ মুজিব এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের যতই ঘনিষ্ঠ হোক না কেন, অর্থনৈতিক সাহায্যের ব্যাপারে তাদের সীমাবদ্ধতা আছে। মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক হলে আমেরিকা ও

www.pathagar.org

চীনের সাথেও সম্পর্কের উন্নয়ন হবে, যা বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য। আজ আমরা এর বাস্তবতাই লক্ষ করি। বর্তমানে চীন, জাপান, আমেরিকা, সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশগুলো বাংলাদেশের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। বাংলাদেশ বেশি অর্থনৈতিক সাহায্য এসব দেশ থেকেই পেয়ে আসছে।

জুলফিকার আলী ভুট্টোর বাংলাদেশ সফর

যে জুলফিকার আলী ভুট্টোর কারণে নির্বাচনে জয়লাভ করেও শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেননি, যে ভুট্টো-ইয়াহিয়ার যোগসাজশ ও আঁতাতের ফলেই ২৫ মার্চ রাতে পাক বাহিনী বাংলাদেশের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালায় এবং যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণই পাকিস্তান বানিয়েছিল, সেই জনগণের ওপরই একটি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, যার ফলে একটি ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে, সেই ভুট্টোকে বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিব আমন্ত্রণ জানালেন বাংলাদেশ সফরে।

ভুট্টোকে লালগালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হলো তখনকার তেজগাঁও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। ঢাকার রাজপথে সেদিন যে অভূতপূর্ব জনতার ঢল নেমেছিল, তা না দেখে বিশ্বাস করা কঠিন। আমি নিজেও সেদিন ফার্মগেটের রাস্তার পূর্বপাশে জনতার সাথে ভুট্টো ও মুজিবকে দেখার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। কিছুটা ধীরগতিতে একেবারে আমাদের কয়েক ফুট সামনে দিয়েই গাড়ির বহরে পাইপ হাতে শেখ মুজিব এবং সংবর্ধনায় বিপুল জনসমাগমে উল্লসিত ভুট্টোকে দেখলাম। আমার নিজের কাছেই প্রশ্ন ছিল যে, পাকিস্তান বাংলাদেশের ওপর এত নির্যাতন চালাল, সেই পাকিস্তানের নেতাকে শেখ সাহেব আমন্ত্রণ করে এত বড়ো সংবর্ধনা দিলেন বা তাকে দেখার জন্য কেন জনতার এত ঢল নামল রাজপথে? রাস্তার পাশে সমবেত জনতার মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখেছি সেদিন, তা ছিল বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো। আর এ কারণেই জনতার ভিড় এড়ানোর জন্য ফেরার সময় ভুট্টোকে মোটর শোভাযাত্রার পরিবর্তে হেলিকপ্টারে তেজগাঁও বিমানবন্দরে নেওয়া হয়।

সত্যি কথা বলতে কি, ভুট্টোর আগমনের দিনে রাজপথে নেমে আসা জনতার পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে লক্ষ করে কিছু মন্তব্যও ছুড়ে দিতে শুনেছি। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের দেশময় বেপরোয়া লুটপাট ও দুর্নীতি, ক্ষমতার

www.pathagar.org

অপব্যবহার ও পীড়নে শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তাও ভাটার দিকে যাচ্ছিল। মানুষ বলাবলি শুরু করে দিয়েছিল যে, নেতা শেখ মুজিব সফল হলেও সরকারপ্রধান শেখ মুজিব ব্যর্থ হচ্ছেন এবং তার নিয়ন্ত্রণে কিছুই নেই।

দেশ ক্রমান্বয়ে নৈরাশ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, মানুষ হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছে। তার কাছে মানুষের প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। তিনি তা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছেন। শেখ মুজিব কর্তৃক এভাবে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে আমন্ত্রণ জানানো ও বিপুল সংবর্ধনা দেওয়াটা ভারত সরকার খুব একটা ভালো চোখে দেখেনি। ভুট্টোর প্রতি জনগণের এতটা আগ্রহ ছিল আসলে ভারতবিরোধী একটা সেন্টিমেন্টের প্রকাশ।

এত দ্রুততম সময়ে কেন ভারতবিরোধী সেন্টিমেন্ট সৃষ্টি হলো

উপমহাদেশের রাজনীতিতে সৃষ্ট হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যকার দূরত্ব ও অবিশ্বাস একটি নির্মম বাস্তবতা। এই দূরত্ব সৃষ্টির জন্য মূলত হিন্দু মহাসভা আরএসএস ও কংগ্রেসের হিন্দুত্ববাদী নেতারাই দায়ী—এ কথা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত।

১৯২০-১৯৩০ সালে মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি হয় পৃথক নির্বাচনব্যবস্থার ফলে। পাঞ্জাব ও বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা কংগ্রেস থেকে ক্ষমতা নিয়ে নিতে সক্ষম হয়। ইতোমধ্যে সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা পূর্ণাঙ্গ প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে। তবে তখন পর্যন্ত ভারতীয় মুসলিম লীগ গণসংগঠনে পরিণত হয়নি।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ব্যাপক সাফল্যে উজ্জীবিত কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহেরু ঘোষণা করলেন—

> There are now only two parties in the Indian political scene, the Raj and Congress.

মুসলমানদের সংগ্রাম ছিল আলাদা জাতিসত্তা হিসেবে মর্যাদা লাভ করা, যাতে তারা রাজনৈতিক অধিকার লাভ করতে পারে। মি. নেহেরুর বক্তব্যে মুসলমানদের সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করার ফলে মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে ভারতবর্ষব্যাপী

www.pathagar.org

মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ লাভ করে। বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ, বিহার, হায়দারাবাদসহ অন্যান্য স্থানের মুসলমানরাও মুসলিম লীগে ব্যাপকভাবে যোগদান করে। মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা ৩০ লাখ ছাড়িয়ে যায়। জিন্নাহ মুসলিম লীগের একক মুখপাত্র হিসেবে আবির্ভূত হন।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে মুসলমানদের একটি জাতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। শেষ পর্যন্ত এটাই দ্বিজাতি তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় এবং ভারতীয় রাজনীতির ময়দানে মুসলমানরা একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে একটি জাতিতে রূপান্তর লাভ করে। পরবর্তী সময়ে ভারত ভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ও উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থান ইত্যাদি কারণে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অনাস্থা ও দূরত্ব বৃদ্ধি পায়।

হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক বৈরীভাব সৃষ্টিতে আরেকটা বিষয় অনেক বড়ো অবদান রেখেছে। পরিকল্পিতভাবে বাংলা, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, বিহার প্রভৃতি স্থানের হিন্দুদের মধ্যে সংহতি সৃষ্টির কৌশল হিসেবে মসজিদের সামনে বাদ্য বাজানোর কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ব্যাপক দাঙ্গা হয়েছে এবং মুসলিমরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসবের মধ্যে ভারতবিরোধী সেন্টিমেন্টের বীজ লুক্কায়িত ছিল।

এসব ঐতিহাসিক কারণের পাশাপাশি জাজ্বল্যমান বাস্তবতা হিসেবে সামনে আসে তখনকার চলমান বিভিন্ন ঘটনা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতীয় সৈন্যরা আত্মসমর্পণকারী পাক সৈন্যদের সমস্ত অস্ত্রপাতি নিয়ে যায়। বাংলাদেশ থেকে অর্থ, স্বর্ণ, ট্রাক গাড়ি, যানবাহন, রেল ইঞ্জিনসহ ব্যাপক সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যায় তারা। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর *বঙ্গ কথা* পত্রিকায় প্রতিবেদন অনুযায়ী এর পরিমাণ ছিল ৬৫ হাজার কোটি টাকা।

খুলনায় ভারতীয় সৈন্যরা অসংখ্য ট্রাকভরতি লুণ্ঠনকৃত অস্ত্র ও মালামাল নিয়ে যাওয়ার সময় বাধা দিতে গিয়ে বন্দি হন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিল। স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারত আমাদের সর্বাত্মক সাহায্য করায় মুখ বুজে এসব সহ্য করলেও জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার হতে থাকে। বিজয়ের পর থেকেই জনগণের মধ্যে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়, ভারত কি আমাদের স্বাধীনতার জন্য সাহায্য করেছে? নাকি নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তার চিরশত্রু পাকিস্তান নামক বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ একটি রাষ্ট্রকে ভাঙার জন্য সাহায্য করেছে?

www.pathagar.org

সীমান্ত অনেকটা উন্মুক্ত থাকায় ব্যাপক চোরাচালান শুরু হয়। বাংলাদেশের বিশাল বাজার দখলের ফলে ভারতীয় পণ্যে দেশ সয়লাব হতে থাকে। এসব কারণে বাংলাদেশে খুব অল্প সময়ের মধ্যে একধরনের ভারতবিরোধী সেন্টিমেন্ট জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হয়। চীনপন্থি দল ও গ্রুপগুলোও ভারতবিরোধী সেন্টিমেন্ট সৃষ্টিতে অবদান রাখে। ভারত থেকে আনা নিম্নমানের শাড়ি-লুঙ্গি, ভারতীয় সেনাবাহিনীর আদলে রক্ষীবাহিনীর পোশাক ইত্যাদিরও সমালোচনা শুরু হয়। ভারতবিরোধী সেন্টিমেন্ট এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে, এমন স্লোগানও উঠতে শুরু হয়—

'জয় বাংলা জয় হিন্দ, লুঙ্গি ছেড়ে ধুতি পিন্দ'।

সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টি ও নবগঠিত রাজনৈতিক দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ ভারতবিরোধী সেন্টিমেন্টকেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। জাসদের গণবাহিনীর নেতা কর্নেল তাহের সেনাবাহিনীতে চীনপন্থি বলে পরিচিত ছিলেন। মাত্র কয়েক বছরে বাংলাদেশের জনগণের মাঝে ভারতবিরোধী সেন্টিমেন্ট যে কতটা ব্যাপকতা লাভ করেছিল, তার একটি বড়ো প্রমাণ হলো—মুক্তিযোদ্ধা ও সেনা কর্মকর্তা খালেদ মোশাররফের সামরিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে যাওয়া।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির সামনে থেকে খালেদ মোশাররফের মা, ভাইসহ ভারতপন্থি বলে পরিচিত লোকদের নেতৃত্বে একটি মিছিল ৩২নং ধানমন্ডিতে এলে প্রচারিত হয়ে যায় যে, খালেদ মোশাররফ ভারতের মদদে ক্ষমতা দখল করেছেন। বিদ্যুৎগতিতে এ কথা ছড়িয়ে পড়ায় খালেদ মোশাররফ সৈনিকদের হাতেই মর্মান্তিকভাবে নিহত হন এবং ৭ নভেম্বর সিপাহি জনতার অভ্যুত্থান ঘটে। বিরোধিতার কারণে বিরোধিতা নয়; বরং নানান বাস্তব ঘটনাবলির ফলেই বাংলাদেশে এত দ্রুততার সাথে ভারতবিরোধী সেন্টিমেন্ট সৃষ্টি হয়। সামনের দিকে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার আশা রাখি। কারণ, এই ইস্যুটি বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(ভোর ৪:৪৫ টা; ২০ আগস্ট, ২০১৩)

www.pathagar.org

পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকট

আমি যখন জীবনের প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরে গেলাম, পার্বত্য চট্টগ্রামের অপরূপ বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়ি। আমরা বেশ কয়েকজন ছিলাম। আমি বলেই ফেললাম—'পার্বত্য চট্টগ্রাম দেখা না হলে আমার বাংলাদেশই দেখা হতো না। অথচ এতদিন পর আমি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই লীলাভূমি দেখার সুযোগ পেলাম। অনেক আগেই আসা উচিত ছিল।'

উঁচুনিচু পাহাড়, রাস্তাঘাট, ঝরনা, নদী, পাহাড়ে নানা ধরনের গাছপালা, বনানী, উপজাতীয় লোকদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ঘরবাড়ি, যেদিকে তাকানো যায়, সবই যেন মনে হয় সাজানো ও চোখজুড়ানো সৌন্দর্যের সমাহার। শুধু দেখতেই মনে চায়। কাপ্তাই লেকের সৌন্দর্য পর্যটককে আকর্ষণ করবে। তবে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য নির্মিত বাঁধের কারণে রাজবাড়িসহ পানির নিচে ডুবে গিয়েছে অনেক বাড়িঘর।

বিশেষ একটি নৌযানে আমরা লংগদুতে গিয়েছিলাম। লংগদুতে একটি চমৎকার হাসপাতাল নির্মিত হয়েছে রাবেতার উদ্যোগে। আমরা সেখানে রাতযাপন করি এবং কাপ্তাই লেকের মাছ দিয়ে আমাদের ভূরিভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নৌকায় বসে সংলগ্ন পাহাড়ের সৌন্দর্য কী অসাধারণ দৃষ্টিনন্দন ও মনোলোভা, তা আমার মতো লোকের পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। শুধুই মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছি যে, আমাদের বাংলাদেশে এমন অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থান রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশের দশ ভাগের এক ভাগ। আগে একটি জেলা ছিল। বর্তমানে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান নামে তিনটি জেলা করা হয়েছে। পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্ত ছিল। পাহাড়ি ও সমতলবাসী মিলেমিশেই বসবাস করে আসছিল।

www.pathagar.org

১৯৭১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত একমাত্র এমএনএ রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তান সরকারের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল শেখ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের নানা দাবিদাওয়া নিয়ে কথা বলার জন্য। শেখ সাহেব তাদের বলেন—'তোমরা বাঙালি হয়ে যাও। বাংলাদেশের সবাই বাঙালি।' মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা হতাশ হয়ে ফিরে যান।

এরপরের ইতিহাস খুবই দুঃখজনক। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগোষ্ঠী সশস্ত্র সংগ্রামের পথে চলে যায়। প্রতিবেশী ভারত তাদের প্রশ্রয় দেয় এবং অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করে। ফলে পাহাড় অশান্ত হয়ে ওঠে এবং বাংলাদেশ সরকার সেনা মোতায়েন করতে বাধ্য হয়ে। দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত ও সন্ত্রাস চলতে থাকে। আওয়ামী লীগের পর বিএনপি ও এরশাদের শাসনামলেও অশান্ত পাহাড়ে সংঘাত অব্যাহত থাকে। সেনাসদস্যসহ ২৫ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে পার্বত্য চট্টগ্রামে।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে পার্বত্য চট্টগ্রাম রক্ষা করতে অনেক চড়া মূল্য দিতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মারমা, মোরং, মগ, রাখাইনসহ ১৪টির মতো জাতিগোষ্ঠী আছে। তবে চাকমারাই সংখ্যার দিক থেকে প্রধান। তারা তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি নিয়ে সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই শান্তির সাথে বসবাস করে আসছিল। তাদেরকে বাঙালি হয়ে যেতে বলায় তারা তাদের স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং এ কারণেই তারা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। সমস্যার বীজটা সেখানেই নিহিত ছিল।

আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করার পর জনসংহতি সমিতির সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে। সেই চুক্তিটি ছিল সংবিধান ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী। চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। বিরোধী দলসহ দেশের সব মহল ওই চুক্তির তীব্র প্রতিবাদ করে। চারদলীয় জোট ও বিএনপির নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম অভিমুখে লংমার্চ করে রাজধানী থেকে সকাল ৭টায় রওনা করার পর কাঁচপুরে সরকার ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেয়। প্রায় ৭ ঘণ্টা আটক রাখার পর রাস্তা খুলে দেওয়া হয়। এই লংমার্চে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম থেকে বান্দরবান ও রাঙামাটি পথের দুই ধারে নামে জনতার ঢল। রাত জেগে লংমার্চকে অভিনন্দন জানায় জনগণ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, জনগণ তথাকথিত শান্তিচুক্তি সমর্থন

www.pathagar.org

করেনি। কিন্তু চুক্তির দীর্ঘদিন পরও পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অনেকেই মনে করেন, আওয়ামী লীগ জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে চুক্তি করে দেশের সুদূরপ্রসারী ক্ষতি করেছে। কারণ, এই চুক্তির কারণে পার্বত্য তিন জেলার অধিবাসীগণ সারা বাংলাদেশে জমির মালিক হতে পারবে। কিন্তু বাকি ৬১ জেলার অধিবাসীরা পার্বত্য তিন জেলায় জমি ক্রয় করতে পারবে না।

সংবাদপত্রের প্রতি আওয়ামী লীগের বৈরিতা ও অসহিষ্ণুতা

সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় আওয়ামী লীগ কখনও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেনি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সাল থেকেই আওয়ামী লীগ সংবাদপত্র দলন শুরু করে।

১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি মার্কিনবিরোধী এক বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে একজন ছাত্র নিহত হলে সরকার নিয়ন্ত্রিত *দৈনিক বাংলা* পত্রিকা একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করায় দুইজন সম্পাদককে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়। এর আগে ১৯৭২ সালে *বাংলাদেশ অবজারভার* পত্রিকার সম্পাদক আবদুস সালাম যখন 'দ্য সুপ্রিম টেস্ট' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় লেখেন, তাতে শেখ মুজিবের অহংবোধে আঘাত লাগে। ফলে আবদুস সালামের মতো এত বড়ো মাপের সম্পাদককেও চাকরি হারাতে হয়।

জাসদের পত্রিকা *গণকণ্ঠ* সরকার নিষিদ্ধ করে অফিসে তালা লাগায় এবং বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি *গণকণ্ঠ* সম্পাদক আল মাহমুদকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। এ ছাড়া সাহিত্যিক *মুখপত্র* ও *স্পোক্সম্যান*-এর সম্পাদক ফয়েজুর রহমান এবং মওলানা ভাসানীর পত্রিকা *হক কথা*-এর সম্পাদক ইরফানুল বারীকেও গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করা হয়।

একসময়ের গণতন্ত্রকামী শেখ মুজিব এভাবে ক্রমান্বয়ে সংবাদপত্রের প্রতি দারুণ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন শেখ মুজিব চারটি পত্রিকা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে বাকি সকল পত্রিকা নিষিদ্ধ করে দেন। ফলে শত শত সাংবাদিক বেকার হয়ে যান। যে *ইত্তেফাক* পত্রিকা শেখ মুজিবের রাজনৈতিক উত্থানে বিশাল অবদান রেখেছিল, সেই *ইত্তেফাক*-কেও রেহাই দেওয়া হয়নি। একপর্যায়ে সরকার *ইত্তেফাক* দখল করে।

www.pathagar.org

আওয়ামী লীগের কাছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানে তাদের পক্ষেই লিখতে হবে। আর কোনো পত্রিকা যদি তার ব্যত্যয় ঘটায়, তাহলে সেই পত্রিকাকে আওয়ামী লীগ শত্রু বলে গণ্য করে। বর্তমানেও একই ধারা অব্যাহত আছে এবং সে সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করার আশা রাখি। আজকের মতো এখানেই ইতি টানছি।

(রাত ১:০০ টা; ২১ আগস্ট, ২০১৩)

www.pathagar.org

সিরাজ শিকদার ও
চল্লিশ হাজার রাজনৈতিক নেতাকর্মী হত্যা

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকালেই সিরাজ শিকদার বাম আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। মেধাবী ছাত্র সিরাজ শিকদার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জনের পর মার্কসবাদ, লেনিন ও মাওসেতুংয়ের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি গঠন করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নির্যাতন, নিপীড়ন, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও বেকারত্বের কারণে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক যুবক আওয়ামী লীগের প্রতি হতাশ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে সিরাজ শিকদারের দলে যোগদান করে।

ওদিকে আওয়ামী লীগ ভেঙে সিরাজুল আলম খানের তত্ত্বে মেজর এম এ জলিল, আবদুল আউয়াল, আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, মাওলানা আবদুল মতিন, শ্রমিকনেতা রুহুল আমিন খানের নেতৃত্বে তখনকার সময়ে চমক সৃষ্টিকারী ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আকর্ষণীয় স্লোগান নিয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) গঠিত হয়। জাসদ নামক এই রাজনৈতিক দলটির অ্যাডভেঞ্চারিজমের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমান অনেকটা বেদিশা হয়ে পড়েন। প্রকাশ্য রাজনৈতিক দল হিসেবে জাসদকে সামলানো সম্ভব ছিল। কিন্তু অপ্রকাশ্য ও শ্রেণিসংগ্রামে বিশ্বাসী সর্বহারা পার্টি যদিও আওয়ামী লীগের মতো বিরাট সংগঠন ও শেখ মুজিবের মতো জনপ্রিয় নেতার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমতার চ্যালেঞ্জ ছিল না, তারপরও বেসামাল শেখ মুজিব সিরাজ শিকদারকে গ্রেফতার করার পর বিনা বিচারে হত্যার মতো কাণ্ড করে বসলেন। সিরাজ শিকদারকে জিপে তুলে নিয়ে সাভারের নিকট পুলিশ হত্যা করে।

বর্তমানে র‍্যাব যেভাবে ক্রসফায়ারের নামে বিনা বিচারে হত্যা করে, ঠিক একই কায়দায় সিরাজ শিকদারকে হত্যা করে গল্প সাজানো হয় যে, তিনি পালানোর

www.pathagar.org

চেষ্টা করলে পুলিশ বাধ্য হয়ে তাকে গুলি করে। মূলত বিনা বিচারে ক্রসফায়ারে মানুষ হত্যার এই কাজটি আওয়ামী লীগই সূচনা করেছিল। সিরাজ শিকদার নিহত হওয়ার পর শেখ মুজিব খুব দম্ভ করে বলেছিলেন—'এখন কোথায় সিরাজ শিকদার!' তার এ মন্তব্যের কারণেই মনে করা হয় যে, সরাসরি তার নির্দেশেই সিরাজ শিকদারকে হত্যা করা হয় অথবা তাকে অবহিত করেই কাজটি করা হয়। তা ছাড়া রক্ষীবাহিনীকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমন করার বিষয়টি তো ছিলই। জাসদসহ যারাই আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে বা প্রতিবাদ জানিয়েছে, রক্ষীবাহিনী তাদের ধরে নিয়ে নির্যাতন করে বিনা বিচারে হত্যা করেছে। এ সম্পর্কে ১৯৭১-৭৫ বাংলাদেশের সংবাদপত্র ছাড়াও অনেকের লেখা বইপুস্তকে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এক হিসাব মতে, প্রায় ৪০ হাজার রাজনৈতিক কর্মী হত্যা করে শেখ মুজিবের সরকার।

একদলীয় বাকশালী শাসন : শেখ মুজিবের সবচেয়ে বড়ো ভুল

এই ঘটনা বাংলাদেশের রাজনীতির গতিধারা পালটে দিয়েছিল। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর সংবিধান প্রবর্তনের মাত্র দুই বছর এক মাস দশ দিনের মাথায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটে। গণতন্ত্রী শেখ মুজিবের উলটো পথে যাত্রা শুরু হয়। সংসদের অধিবেশনে মাত্র ১২ মিনিটে চতুর্থ সংশোধনী পাশ করে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়। সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তথাকথিত একমাত্র জাতীয় দল বাকশাল গঠন করার মাধ্যমে সম্ভাবনার বাংলাদেশকে অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়।

এই চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের মূল কাঠামো পালটে ফেলা হয়। ৩৯টি অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করা হয়। তিনটি তফসিল সংশোধন করা হয়। সংসদ ও রাষ্ট্রপতির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয় এবং কোনো নির্বাচন ছাড়াই শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগ এবং অপসারণের যাবতীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত করা হয়। জাতীয় দলের নামকরণ, কর্মসূচি, সদস্যভুক্তি, সংগঠন,

www.pathagar.org

শৃঙ্খলা, অর্থসংস্থান এবং কর্তব্য ও দায়িত্বসম্পর্কিত সকল বিষয় রাষ্ট্রপতির এখতিয়ারভুক্ত করা হয়। জনগণের সকল মৌলিক অধিকার, সভা-সমাবেশ করার অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়। এটার নাম দেওয়া হয় দ্বিতীয় বিপ্লব।

রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ হয়ে বেসামাল শেখ মুজিব মস্কোপন্থি কমিউনিস্টদের খপ্পরে পড়ে এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেন। তার দলের লোকেরা যদি সরকারি সম্পত্তি লুটপাট, পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও বাড়িঘর দখল ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত না হয়ে শেখ মুজিবকে দেশ পরিচালনায় ও নবীন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশটি গড়ে তোলার কাজে সহায়তা করতেন, তাহলে হয়তো-বা তিনি কমিউনিস্টদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে তার নিজের ও দেশের এত বড়ো সর্বনাশ করতেন না। সারা দেশময় দলের সর্বপর্যায়ের নেতা ও পাতিনেতারা একেকজন 'শেখ মুজিব' বনে গিয়ে ক্ষমতার দম্ভে মানুষের ওপর চালায় নানা রকম জুলুম। মামলা-মোকদ্দমা দিয়ে মানুষকে হয়রানি, থানা-কোর্ট-কাচারি সবকিছু তাদের নিয়ন্ত্রণে, রিলিফের মালামালসহ যা কিছু পাচ্ছে, দলের লোকেরা আত্মসাৎ করছে আর এভাবেই দেশের মানুষ আওয়ামী লীগের ওপর অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সবকিছুর দায় গিয়ে গড়াচ্ছে নেতা শেখ মুজিবের ওপর। মানুষ আশাহত। আর ওদিকে চাটুকার পরিবেষ্টিত শেখ মুজিব জানতেই পারছেন না দেশের প্রকৃত অবস্থা ও জনগণের চরম দুর্ভোগের কথা। বাকশাল গঠনের ঘটনা ছিল বাংলাদেশের রাজনীতিতে মস্কোপন্থি কমিউনিস্টদের স্বর্ণযুগ, কিন্তু শেখ মুজিব তথা আওয়ামী লীগের জন্য ছিল পতনের ঘণ্টাধ্বনি।

'এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' স্লোগান দিয়ে গণতন্ত্রকে হত্যা করে সমাজতান্ত্রিক আদলে একদলীয় শাসন জাতির ওপর চাপিয়ে দেওয়ায় হতবাক ও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী জনগণ। আওয়ামী লীগের অনেক নেতাও এমনটি আশা করেননি। কিন্তু জননন্দিত নেতা শেখ মুজিবের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করার কোনো সাহস কারও ছিল না। শুনেছি, সংসদে সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী একটি আবেগময় বক্তব্যও রেখেছিলেন। জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী ও ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন একদলীয় শাসনের বিরোধিতা করে সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।

www.pathagar.org

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা জরুরি। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীটি ছিল মূলত একটি নতুন সংবিধান। অর্থাৎ, এই সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের সংবিধান কেটে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগই সংবিধানকে কেটে-ছিঁড়ে সম্পূর্ণরূপে বদলে ফেলেছিল। অথচ আওয়ামী লীগ ১৯৭২ সালের সংবিধান ক্ষতবিক্ষত করার জন্য অন্যদের দায়ী করে মিথ্যা আস্ফালন করে। অন্যদের ওপর দোষ চাপাতে তাদের একটুও লজ্জা হয় না।

(রাত ১.০০ টা; ২১ আগস্ট, ২০১৩)

www.pathagar.org

১৫ আগস্ট ট্র্যাজেডি

শেখ মুজিবের মতো জননন্দিত নেতা দেশের মানুষের ওপর তথা গণতন্ত্রের ওপর কেন আস্থা হারালেন, তা আমার বুঝে আসে না। দলের লোকদের বাড়াবাড়ি, লুটপাট ইত্যাদি কারণে মানুষ আওয়ামী লীগের ওপর অসন্তুষ্ট হলেও স্বাধীনতার স্থপতি হিসেবে শেখ সাহেবের অবস্থান ছিল অনেক উর্ধ্বে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কোনো নেতা ছিলেন না। সংগঠিত বড়ো কোনো রাজনৈতিক দলও ছিল না। জাসদ একটি চমক সৃষ্টি করলেও তাদের হঠকারিতা ও অ্যাডভেঞ্চারিজমের কারণে তাদের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ছিল না। তা ছাড়া আকস্মিকভাবে জাসদের উত্থান নিয়েও মানুষের নানা প্রশ্ন ছিল।

স্বাভাবিক গণতন্ত্র বহাল থাকলে পরবর্তী নির্বাচনেও আওয়ামী লীগই জয়লাভ করত। ব্যক্তিগতভাবে শেখ সাহেবের নির্বাচনে পরাজয়ের প্রশ্নই আসে না। যে দেশের মানুষ জেনারেল এরশাদের মতো স্বৈরশাসকদের বারবার একাধিক আসনে নির্বাচিত করে, সে দেশের মানুষ দেশের স্থপতি শেখ মুজিব ভোটে দাঁড়ালে তাকে ভোট দেবে না—এ কথা কল্পনা করাও কঠিন। নাকি শেখ সাহেবের নিজের ওপর অতিরিক্ত আস্থা ছিল যে, তিনি যেভাবে চাইবেন দেশ সেভাবেই চলবে এবং জনগণ তা-ই মেনে নেবে? এ কারণেই কি তিনি বাকশালের স্বপ্ন দেখে ছিলেন এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দেশের মানুষের সকল প্রকার গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার হরণ করার মতো মারাত্মক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

১৫ আগস্ট ভোর হওয়ার আগেই তরুণ মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে এক সেনা-অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান তার ধানমন্ডির ৩২ নং সড়কের বাড়িতে সপরিবারের নিহত হলেন। এই কিংবদন্তি নেতার রক্তাক্ত লাশ সিঁড়িতে রেখেই শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রিসভার সদস্য খোন্দকার মোশতাক

www.pathagar.org

আহমদ আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে নিয়েই নিজে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ৩২ নম্বরের বাড়ি আক্রান্ত হলে শেখ সাহেব সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহকে ফোন করলে তিনি শেখ সাহেবকে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন; কিন্তু অভ্যুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে পালটা কোনো ব্যবস্থা নেননি। ৩২ নং থেকে মাত্র দুই মিনিটের পথ শেরেবাংলা নগরেই রক্ষীবাহিনীর সদর দফতর ছিল। তারাও অভ্যুত্থান ঠেকাতে বা শেখ সাহেবের জীবন বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি। এখন বলা হয়, কিছু বিপথগামী সেনা কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে। অথচ দায়িত্ব নেওয়ার পর শফিউল্লাহসহ তিন বাহিনীপ্রধানই আনুষ্ঠানিকভাবে খন্দকার মোশতাক আহমদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছিলেন। যে কারণে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ ফজলুল করিম সেলিম বারবার প্রকাশ্য সভায় মেজর জেনারেল শফিউল্লাহর বিচার দাবি করেছেন। সেনাপ্রধানের পক্ষ থেকে ওইসব তরুণ সেনা কর্মকর্তা, যারা সেই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন, তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি একদলীয় শাসন চালু করার মাত্র ৮ মাস ২০ দিনের মাথায় শেখ মুজিবুর রহমানের মর্মান্তিক পতন ঘটে।

সেদিন ছিল শুক্রবার। জুমার নামাজের জন্য কারফিউ শিথিল করা হলে সত্যি বলতে কী শোকের পরিবর্তে লক্ষ করা গিয়েছে উৎসবের আমেজ। আওয়ামী লীগের জন্য বিরাট সুযোগ ছিল রাজপথে এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানানোর। শেখ মুজিবের দুর্ভাগ্য যে, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া সারা বাংলাদেশের কোথাও একটি বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ মিছিল বের হয়নি। অথচ ৩৭ বছর পর এ বছরই পত্রিকায় দেখলাম মুজিব হত্যার প্রতিবাদ জানানোর জন্য চট্টগ্রামে এক ব্যক্তিকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। কিশোরগঞ্জে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন মুজিব হত্যার প্রতিবাদ জানিয়েছিল বলেও একটি খবর দেখলাম। এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩-৪ জনের একটি বিক্ষোভ হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। অথচ সেদিন তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিক্ষোভে ফেটে পড়ার কথা ছিল। কারণ, সেদিন সকালেই শেখ সাহেবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার কর্মসূচি ছিল এবং এজন্য ব্যাপক প্রস্তুতি ও রাজকীয় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেদিন শেখ মুজিবের এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কেউ টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত করেনি।

www.pathagar.org

গোলাবিহীন কয়েকটা ট্যাংক নিয়ে একদল সেনা কর্মকর্তা এত বড়ো একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাষ্ট্রপতিকে নৃশংসভাবে হত্যা করল, তা অস্বাভাবিক। অভ্যুত্থানকারীদের পেছনে সেনাবাহিনীর সমর্থন না থাকলে সেনানিবাস থেকে ট্যাংক নিয়ে সৈনিক দল প্রেসিডেন্টের বাসভবন ৩২ নং ধানমন্ডি, বঙ্গভবন, টিভি ও রেডিও স্টেশনসহ বিভিন্ন স্থানে অবস্থান গ্রহণ এবং সফলভাবে আওয়ামী লীগেরই একজন নেতা প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করে সামরিক অভ্যুত্থান সফল করা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। দেশের মানুষ এটাকে সফল সেনা-অভ্যুত্থান হিসেবেই গ্রহণ করে এবং আওয়ামী লীগও কোনো প্রতিবাদ না করে তা মেনে নিয়েছিল। হাতে গোনা কয়েকজন নেতা ছাড়া সবাই খন্দকার মোশতাক আহমদকেই সমর্থন করেছিলেন। মনোরঞ্জন ধর, ফণীভূষণ মজুমদার, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, কে এম ওবায়দুর রহমান, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, নুরুল ইসলাম মঞ্জুরসহ আরও অনেকেই মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এই মুহূর্তে অন্যদের নাম আমার মনে পড়ছে না। তখনকার পত্রিকার বা বিভিন্ন পুস্তকে খন্দকার মোশতাক আহমদের মন্ত্রিসভার সকল সদস্যের নাম পাওয়া যাবে।

১৫ আগস্ট রাতে আমি এসএসসি পরীক্ষার ফলপ্রার্থী ছাত্রদের একটি প্রোগ্রামের জন্য মিরপুর ২ নম্বরে ছিলাম। ফজরের নামাজের পর সেই বাড়ির পাশে একটি মাঠে একজন লোককে দাঁড়িয়ে মুনাজাত করতে দেখে গোলাম সরওয়ার নামের একজন ছাত্র বলল—'ভাইয়া, তাড়াতাড়ি রেডিও খুলেন। বাংলাদেশ বেতার থেকে শুনতে পেলাম এক অবিশ্বাস্য ঘোষণা—আমি মেজর ডালিম বলছি, স্বৈরাচার শেখ মুজিবের পতন ঘটানো হয়েছে।'

তখন বাইরে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষ বিভিন্ন বাড়ির সামনে জটলা করে বাংলাদেশ বেতারের ঘোষণা শুনছে এবং নানা মন্তব্য করছে। আমরা যে বাড়িটিতে ছিলাম, সেখানে সম্ভবত ৩০ জন এসএসসি ফলপ্রার্থী ছাত্র ছিল। পরীক্ষা শেষে বাছাই করা এসব মেধাবী ছাত্রকে এই অবসর সময়ে ইসলাম সম্পর্কে কিছু জরুরি বিষয় শিক্ষাদান ও কুরআন তিলাওয়াতে উৎসাহিত করার জন্য অভিভাবকদের সহযোগিতায় এ কর্মসূচিটির আয়োজন করা হয়। আমার ওপর এ কর্মসূচি পরিচালনার দায়িত্ব ছিল।

দেশের এক ভয়ংকর রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও জরুরি অবস্থার মধ্যে এতগুলো ছাত্রকে নিয়ে এখানে আটকা পড়ায় আমি তখন বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। রেডিওতে জুমার নামাজের জন্য কারফিউ প্রত্যাহার করার ঘোষণা করা

www.pathagar.org

হলে আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। কারফিউ প্রত্যাহার হওয়ার সাথে সাথে ছেলেদেরকে পরপর বাসায় পৌঁছে দেওয়ায় ব্যবস্থা করে মোটর সাইকেলটা নিয়ে হলের দিকে রওনা করলাম। তখন শ্যামলী হয়ে মিরপুর যাতায়াত করতে হতো ঢাকা শহর থেকে। সোবহানবাগের কাছে ৩২ নং সড়কের মাথায় বাধাপ্রাপ্ত হলাম। সেনাক্যাম্প ও চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। সবার পোশাক কালো। মোটরসাইকেল থেকে নেমে ক্যাম্পের সামনে যেতেই আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো পরিচয় কী এবং কোথায় যাচ্ছি? আমার নাম উচ্চারণ করার পর যখনই বলেছি আমি একজন ছাত্র। কথা শেষ হতে না-হতেই সেই সৈনিকটি তার হাতের বেতটি দিয়ে আমার ডান বাহুতে এমন জোরে একটি বাড়ি দিলেন যে, সাথে সাথেই পুরো জায়গাটা লম্বা হয়ে ফুলে উঠল। আমি উহ করে চিৎকার দিয়ে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। সৈনিকটি ধমকের সুরে বললেন—'বোকার মতো এ পথে এসেছ কেন? সামনে গেলে তো বিপদে পড়বে।' এরপর তিনি আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে সোবহানবাগ দিয়ে রাজারবাগ যাওয়ার পথ দেখিয়ে বললেন—'এই পথে চলে যাও।'

ঘটনার আকস্মিকতায় এবং আমার বোকামির জন্য আমি তখন অনেকটাই বিধ্বস্ত। কোনোক্রমে পশ্চিম রাজাবাজার মসজিদের সামনে পৌঁছতেই মনে পড়ল, এখানেই তো মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ মাসুমের বাসা। সিদ্ধান্ত নিলাম সেখানে যাওয়ার। মাওলানা আমাকে দেখেই বুঝতে পারলেন নিশ্চয় কোনো বিপদে পড়েই এসেছি। স্বভাবসুলভ হাসিমুখে তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন। ইশারা করে তার বাড়ির সিঁড়ির নিচের জায়গায় আমার মোটরসাইকেলটি রাখতে বললেন। মাওলানা তার এ নিজস্ব বাড়ির দোতলায় থাকতেন। আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন তার বৈঠকখানায়। বাথরুমে গেলাম এবং ফ্রেশ হলাম। তাকে আমার কাহিনিটা শোনালাম। আমি কিছু বলার আগেই তিনি বললেন—'আজ আর মোটরসাইকেল নিয়ে ঘোরাঘুরি করার দরকার নেই। তুই রাতেও এখানেই থেকে যাবি।' মাওলানার সাহচর্য পেলাম এবং একসাথে আসর, মাগরিব ও এশার নামাজ পড়লাম মসজিদে গিয়ে। মাওলানাই এই মসজিদের ইমাম এবং মসজিদটি বলতে গেলে তার বাড়ির সাথেই লাগোয়া।

বাংলাদেশ বেতার, বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার খবরই তখন দেশের অবস্থা জানার মাধ্যম। মাওলানার সাথে আলাপ-আলোচনার ফাঁকে খবর শুনছিলাম। রাতের খানা শেষ করে ভয়েস অব আমেরিকার রাত দশটায় খবর শুনতে পেলাম। মাওলানার কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না। জন্ম চট্টগ্রামে হলেও

www.pathagar.org

তিনি ঢাকায় অবস্থান করতেন এবং এটাই তার কর্মক্ষেত্র। বড়ো আলেম ছিলেন। বিপ্লবীও ছিলেন এবং খুব কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। ওয়াজ-নসিহত বা বক্তৃতা দিতে গিয়েও খুব রস করে কৌতুক বলতেন। বড়ো সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। তার সাথে আমার সখ্য হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। ১৯৭২ সালে আলেম-উলামায় ভরতি ছিল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার। সৈয়দ মুহাম্মদ মাসুম ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ নামক একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। হয়তো সে কারণেই শেখ মুজিবের সরকার তাকেও গ্রেফতার করে। ৫৪ ধারায় আমাকেও খিলগাঁওয়ের কাছে রাস্তা থেকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছিল।

জেলখানার জেলার নির্মল বাবু আমাকে কিশোর ওয়ার্ডে দেখার পর যখন জানলেন, আমি চারটি বিষয়ে লেটার মার্ক নিয়ে এসএসসি পাশ করে এখন এইচএসসির ছাত্র, তখন আমাকে কিশোর ওয়ার্ড থেকে এনে কেইস টু ফাইল সংলগ্ন একটি ওয়ার্ডে দেন। সেখানে মাওলানা মাসুমসহ অনেক আলেম ও রাজনৈতিক নেতারা ছিলেন। সেইসাথে আমাকে চিফ রাইটারের কাজ করতে নিযুক্ত করেন। সেই সুবাদে আমি পুরো জেলখানায় ঘোরাফেরা করতাম এবং খবরাখবর জানতাম বা জানাতাম। তখনই মাওলানা মাসুম সাহেবের সাথে খুব হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। আমাদের কারও বিরুদ্ধে কোনো মামলা না থাকায় মাওলানা মাসুম আমার আগেই মুক্তি পান এবং তার কিছু পরে আমিও কারাগার থেকে মুক্তি পাই। আবার আমার ডাকনাম ছিল মাসুম।

বলছিলাম ভয়েস অব আমেরিকার সংবাদ শোনার কথা। সেদিন ভয়েস অব আমেরিকায় রাত দশটার বাংলা অনুষ্ঠানে খবর পাঠ করেন মাসুমা খাতুন। খবর শোনার পর মাওলানা খুব মজা করলেন। বললেন—'এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা রে! তুইও মাসুম, আমিও মাসুম, আর খবর পাঠ করল মাসুমা খাতুন। তাও আবার ভয়ংকর খবর শেখ মুজিবের পতন ও সপরিবারে নিহত হওয়ার খবর। এই রাতের এই ঘটনার কথাটা অনেকদিন মনে থাকবে।'

সত্যিই সেই মুহূর্তটিকে আমি আজও ভুলিনি।

(রাত ১১:১৫ টা; ২২ আগস্ট ২০১৩)

www.pathagar.org

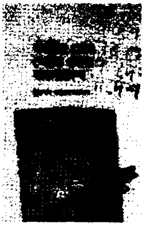

৭ নভেম্বরের গণ-অভ্যুত্থান

খোন্দকার মোশতাক আহমদ ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের পর সামরিক আইন জারি করেন। অর্থাৎ, একজন আওয়ামী লীগ নেতাই শেখ মুজিবের পতনের পর সামরিক শাসন জারি করেন। আওয়ামী লীগাররা উদ্দেশ্যমূলকভাবে জিয়াউর রহমানকে সামরিক শাসনের জন্য দায়ী করে থাকেন, যা সত্য নয়।

মোশতাকের শাসন ছিল ৮২ দিনের। ২ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে তিনি বিদায় নেন এবং বিচারপতি সায়েম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। খালেদ মোশাররফ সেনাবাহিনীতে চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠার কথা বলে ক্ষমতা দখল করে নিজে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সেনাবাহিনীর প্রধান জিয়াউর রহমানকে সেনানিবাসে গৃহবন্দি করা হয়। অভ্যুত্থানকারী মেজরদের পরিবারসহ দেশত্যাগের ব্যবস্থা করা হয়।

২ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি থেকে খালেদ মোশাররফের মায়ের নেতৃত্বে ভারত ও মস্কোপন্থিরা সম্মিলিতভাবে একটি শোক মিছিল বের করে। ৩২ নং সড়ক পর্যন্ত এসে মিছিলটি শেষ হওয়ার পর খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, প্রতিবেশী দেশের আনুকূল্যে দেশে প্রতিবিপ্লব ঘটেছে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে। খালেদ মোশাররফ একজন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের সময় তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকেও সেনা-অভ্যুত্থান ঠেকাতে কোনো ভূমিকাই পালন করেননি। ভারতপন্থি সামরিক অভ্যুত্থানের খবর বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়লে এক চরম সংকটের সৃষ্টি হয় দেশে। বেতার-টিভিতে কোনো খবর নেই, শুধু দেশাত্মবোধক গান-গজল প্রচারিত হচ্ছে। সে এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। ৩ নভেম্বর বিকালে জানা গেল, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এএইচ কামরুজ্জামানকে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনায় আকস্মিকতায় সারা দেশ যেন থমকে গিয়েছিল।

www.pathagar.org

ওদিকে সেনানিবাসে চলে ভিন্ন এক নাটক। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ও গণবাহিনীর পক্ষ থেকে লিফলেট বিতরণ করা হয়। সৈনিকরা রাজপথে নেমে আসে ব্যারাক ছেড়ে। সেনাবাহিনী প্রধান জিয়াউর রহমান বন্দি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। সাধারণ সৈনিকরা জিয়াউর রহমানকে বন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করে আনে। এ সময় জাসদের গণবাহিনীর নেতা কর্নেল তাহের কৌশলে জিয়াউর রহমানকে তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। জিয়াউর রহমান বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ও গণবাহিনীর দাবিদাওয়াগুলো একনজর দেখার পর সিদ্ধান্ত নিলেন, সেনানিবাস থেকে বাইরে না গিয়ে সাধারণ সৈনিকদের শান্ত করা ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার। সৈনিকরা তাদের মুক্ত সেনাপ্রধানকে পেয়ে খুব খুশি হলো, উল্লসিত হলো এবং জিয়াউর রহমান সফলভাবে সেনানিবাসের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলেন।

ওদিকে বঙ্গভবন থেকে ফেরার পথে প্রতিবিপ্লবের নায়ক খালেদ মোশাররফ ফার্মগেটের কাছে এসে সৈনিকদের হাতে আরও কজন সেনা কর্মকর্তাসহ নিহত হলেন। খালেদ মোশাররফের দুর্ভাগ্য যে, একটি মিছিলের প্রতিক্রিয়ায় তিনি ভারতপন্থি বা বাকশালপন্থি হিসেবে বিবেচিত হয়ে তারই সৈনিকদের হাতে নিহত হলেন, অথচ তিনি তার কোনোটাই ছিলেন না। সেনাবাহিনীতে চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনতেই নাকি তিনি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

৭ নভেম্বর ভোর রাতেই সিপাহি জনতার যে অভ্যুত্থান ঘটল রাজপথে, তখন থেকেই স্লোগান উঠল—'নারায়ে তাকবির আল্লাহ আকবার', 'সিপাহি জনতা জিন্দাবাদ, জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ' ইত্যাদি। বিশেষ করে নারায়ে তাকবির ও জিন্দাবাদ এই স্লোগান যে এত শক্তিশালী এক স্লোগান এবং বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের সাথে মিশে আছে এই স্লোগান, তা ৭ নভেম্বর ঢাকার রাজপথ যারা দেখেছেন তাদের উপলব্ধি করার কথা।

জনতার সাথে আমরাও সেদিন রাজপথে একাকার হয়ে গিয়েছিলাম। সেনাবাহিনী কিছু ট্যাংক রাজপথে নামিয়েছিল। জনগণ ফুল ও ফুলের মালা দিয়ে ট্যাংকগুলো কীভাবে সাজিয়ে দিয়েছিল, তা এক দেখার মতো দৃশ্য ছিল। শহীদ মিনারের ওখানে গিয়ে দেখলাম লোকে লোকারণ্য। সেখানে দেখলাম বড়ো হার্ডবোর্ডে লাগানো কর্নেল তাহের, খন্দকার মোশতাক ও জিয়াউর রহমানের ছবি কিছু লোকের হাতে। এমন সময় সেনাবাহিনীর দুটো জিপ এসে

www.pathagar.org

সেখানে থামল এবং জিয়ার ছবিটা রেখে কর্নেল তাহের ও মোশতাকের ছবি তারা নিয়ে চলে গেল। এরপর গেলাম টিএসসির মোড়ে। দেখলাম টিএসসির মোড়ে ট্যাংকের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন আমাদের এক বন্ধু মুহাম্মদ আবদুল মান্নান। পরে জেনেছি, সৈনিকরাই তাকে এ কাজ করতে উৎসাহিত করেছে এবং বেশ কয়েকটি পথসভায়ও তিনি ট্যাংকের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন।

আমাদের এক বড়ো ভাই ভোর রাতেই আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যত পারো তোমাদের বন্ধুদের খবর দাও। স্লোগান হবে একটাই—আল্লাহু আকবর। মিছিলের পর বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেট থেকে বিশাল এক শুকরিয়া শোভাযাত্রা বের হয়ে গুলিস্তান নবাবপুর হয়ে সদরঘাট, ইসলামপুর, পুরান ঢাকা হয়ে দোয়েল চত্বর দিয়ে আবার বায়তুল মোকাররমের সামনে এসে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সারা ঢাকা শহরে সিপাহি-জনতার সম্মিলনে এবং আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে সেদিন ঘোষিত হয়েছিল আমাদের জাতিসত্তার কথা।

(রাত ১:৫০ টা; ২৩ আগস্ট, ২০১৩)

www.pathagar.org

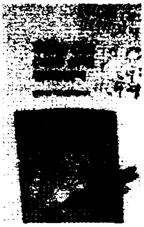

১৫ আগস্ট ট্র্যাজেডির নেপথ্য কারণ

১৫ আগস্ট তরুণ সেনা কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে সংঘটিত সেনা-অভ্যুত্থান এবং স্বাধীনতার স্থপতি জননন্দিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে (শুধু দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও রেহানা বিদেশে থাকায় বেঁচে গিয়েছিলেন) নিহত হওয়ার ঘটনা নিয়ে অনেক বিশ্লেষণ ও আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত হয় আওয়ামী লীগের এক নেতার ছেলে কর্তৃক একজন মেজরের স্ত্রীর অপদস্থ হওয়া থেকে। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর কাছে অভিযোগ করেও নাকি কোনো আশু প্রতিকার পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার সুযোগ নিয়েই আরও নানা কারণে বিক্ষুব্ধ একদল তরুণ সেনা কর্মকর্তা এত বড়ো ঘটনা ঘটায়। এদের মধ্যে সেনাবাহিনীতে চাকরিচ্যুত কর্মকর্তাও সম্পৃক্ত ছিলেন। এসব ব্যাপার যা-ই থাকুক না কেন, রাজনৈতিক কারণকেও খাটো করে দেখার সুযোগ নেই।

এক. অনেকেই মনে করেন, আওয়ামী লীগের লোকদের বেপরোয়া ক্ষমতার অপব্যবহার, লুটপাট, জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ, সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের কারণে মানুষ যারপরনাই আশাহত হয়। আওয়ামী লীগের লোকদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে যে জনগণ তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিল, সেই জনগণের বিপুল অংশকে তারা শত্রুতে পরিণত করে। আওয়ামী লীগ নিজেই এই বিপর্যয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল এবং অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিই এর জন্য দায়ী। সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও লুটপাটের কারণে দলের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছিল। ঘটনার পর মন্ত্রিসভায় যদি আওয়ামী লীগের নেতারা অংশগ্রহণ না করতেন, তাহলে তরুণ সেনা কর্মকতাদের এই অ্যাডভেঞ্চার ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল। আর তাদের পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হতো না। সুতরাং এই ট্র্যাজেডির জন্য দলের দায়দায়িত্ব যে মুখ্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

www.pathagar.org

দুই. সেনাবাহিনীর সমান্তরাল রক্ষীবাহিনী নামক যে এলিট বাহিনী গঠন করা হয়, তার ফলে সেনাবাহিনীর সর্বস্তরেই অসন্তোষ ছিল। মুক্তিযোদ্ধারাও অনেকেই এমন একটি বাহিনীর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারের কারণে বিব্রত ছিল সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরাও। রক্ষীবাহিনী হয়ে উঠেছিল এক আতঙ্কের নাম। দেশের সাধারণ মানুষও রক্ষীবাহিনীর সমালোচনা শুরু করেছিল। রক্ষীবাহিনীকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সেনাবাহিনীর অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে এবং সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে রাখা হচ্ছে বা সেনাবাহিনীর সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হচ্ছে—এমন সমালোচনা ছিল সচেতন মানুষের মুখে মুখে। অথচ অধিকতর নিরাপত্তার জন্য গঠিত হয়েছিল যে রক্ষীবাহিনী, রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর ষড়যন্ত্র ঠেকাতে সে বাহিনী কোনো ভূমিকাই পালন করতে পারেনি।

তিন. দেশের জনগণ স্বাধীনতা চেয়েছিল। কিন্তু পিন্ডির বদলে দিল্লির দাসত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। স্বাধীনতার পর অস্ত্রপাতি, সামরিক যানবাহন, রেলের ইঞ্জিন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক থেকে সোনাদানা এবং বাংলাদেশের প্রচুর সম্পদ ভারতীয় বাহিনী লুণ্ঠন করেছিল। মওলানা ভাসানীর পত্রিকা *হক কথা*-এর হিসাবমতে, সেই সময়ের ৬৫ হাজার কোটি টাকার সম্পদ ভারতীয় বাহিনী অন্যায়ভাবে লুট করে নিয়ে যায়। দেশের মানুষ ভারতীয় বাহিনীর এই লুণ্ঠনে চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল।

বাংলাদেশের ওপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার এবং বাংলাদেশের বাজার দখল, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পাটশিল্প ধ্বংস হয়ে যাওয়া, পাটের গুদামগুলোতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা, এমনকি ভারতীয় সেনাবাহিনীর আদলে রক্ষীবাহিনীর পোশাক ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে মানুষের মন বিগড়ে গিয়েছিল। যার ফলে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশে ভারতবিরোধী সেন্টিমেন্ট চাঙা হতে থাকে। জনমনে প্রশ্ন দেখা দেয়, ভারত কি সত্যিকার অর্থে আমাদের স্বাধীনতার জন্য সাহায্য করেছে নাকি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র ভারতের আজন্ম শত্রুদেশ পাকিস্তান ভাঙার জন্য আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুযোগ গ্রহণ করেছে? আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের মধ্যে বিরূপ মনোভাব তৈরি হওয়ার এটাও একটি কারণ ছিল।

চার. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পরও আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা এবং উপরন্তু ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ২৫ মার্চ কালো রাতে

www.pathagar.org

আকস্মিকভাবে পাক সেনাবাহিনীর হামলার পরিপ্রেক্ষিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহী বাঙালি সেনা, তখনকার ইপিআরের বাঙালি সদস্য ও পুলিশ বাহিনী প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। এরপর ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা করায় সারা দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। শেখ মুজিবুর রহমান পাকসেনাদের হাতে গ্রেফতারি বরণ করেন। প্রায় এক কোটি মানুষ সীমানা পার হয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নেন। তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে প্রবাসী সরকার গঠিত হয়।

এ দেশের জনগণ শোষণের হাত থেকে বাঁচার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। জনগণের এ মুক্তিসংগ্রাম ইসলামের বিরুদ্ধে বা ধর্মের বিরুদ্ধে ছিল না। কিংবা তারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্যও লড়াই করেননি। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাত্র ২৪ বছর আগে উপমহাদেশের মুসলমানদের আজাদি সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করেছিল যে দল মুসলিম লীগ, সেই দলটিসহ সকল ইসলামী দল নিষিদ্ধ করা হলো। যার নামে স্বাধীনতাযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে নয় মাস, সেই শেখ মুজিবুর রহমানও মুসলিম লীগের জানবাজ কর্মী ছিলেন। তার কৈশোর ও ছাত্রজীবন কেটেছে পাকিস্তান আন্দোলনে।

অথচ শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে যে সংবিধান রচনা করা হলো, তাতে আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের কোনো নামগন্ধও রাখা হলো না। এমনকি সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' শব্দটিও সংযোজন করা হয়নি। পক্ষান্তরে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা ও সমাজতন্ত্রের নামে নাস্তিক্যবাদ সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে ধর্মপ্রাণ জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলো। জনগণ তো এজন্য আওয়ামী লীগ বা শেখ মুজিবকে কোনো ম্যান্ডেট দেয়নি।

বাংলাদেশের জনমনে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন সৃষ্টি হয় আরও একটি কারণে। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হওয়ার তিন দিন পর লোকসভায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি ঐতিহাসিক ভাষণ। ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় বলেন—'আজ আমি এই মুহূর্তে আপনাদের একটি সুসংবাদ দিতে চাই। বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার আমাদের কথা দিয়েছেন, তারা বাংলাদেশকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বানাবেন।'

www.pathagar.org

সাড়ে ছয় কোটি মানুষ দেশের ভেতরেই ছিলেন। তারা চরম নিরাপত্তাহীনতা ও বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে জীবন রক্ষার্থে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। যারা পাক বাহিনীর সাথে সহযোগিতা করেছেন বা ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় দিবসের আগপর্যন্ত সরকারি কর্মচারী হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা আদালতের বিচারক হিসেবে যে ভূমিকাই পালন করুন-না কেন, স্বাধীনতার বিরোধিতা করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। মতাদর্শগতভাবে যারা পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার চেষ্টা করেছেন, সেটাও ছিল তাদের একটি রাজনৈতিক মত। এ ধরনের বড়ো ঘটনা যখন কোনো সমাজে ঘটে, তখন দ্বিমত বা মতপার্থক্য হতেই পারে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সবাই তো বাংলাদেশকে মেনে নিয়েছিল। অথচ কোনো বাছবিচার না করে হাজার হাজার আলেম, পীর-মাশায়েখ ও মসজিদের ইমামকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। তারপর ইসলাম ও মুসলিম শব্দ যেসব প্রতিষ্ঠানের সাথে ছিল, সেগুলোর নাম বদলে ফেলা হয়। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল, জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বোর্ডের প্রতীক থেকে কুরআনের আয়াত বাদ দেওয়া হয়। ইসলামিয়া কলেজের নাম পরিবর্তন করে প্রথমে নজরুল ইসলাম কলেজ আবার নজরুল ইসলাম কলেজ থেকে 'ইসলাম' নাম ছেঁটে ফেলে করা হয় কবি নজরুল কলেজ। জিন্নাহ হলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হলো সূর্যসেন হল।

এ সমস্ত কারণে দেশের সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের ধারণা হলো যে, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সরকার ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

পাঁচ. ১৯৭৪ সালের ভয়াল দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনে, সরকারি আনুকূল্যে লাইসেন্স পারমিট নিয়ে ব্যবসা ও বাণিজ্যের নামে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আওয়ামী লীগের দলীয় লোকেরা। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সরকার দুর্ভিক্ষ ঠেকাতে যে ধরনের পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ছিল, তা নিতে পারল না। এ দুর্ভিক্ষ ছিল মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করা হলেও প্রতিবেশী ভারত বা মিত্রদেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন তো বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ায়নি। দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় যেভাবে সর্বদলীয় উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল এবং ত্বরিত গতিতে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে খাদ্যসাহায্য পৌঁছানো দরকার ছিল, সরকারের অযোগ্যতা ও অদক্ষতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। এ দুর্ভিক্ষে দেড় লাখের

www.pathagar.org

অধিক মানবসন্তান মারা যায়। এটা ছিল শেখ মুজিবের সরকারের জন্য বিরাট এক আঘাত। মানুষ সরকারের ব্যাপারে একেবারেই হতাশ হয়ে পড়ে। সরকারি দলের লোকদের শানশওকতের কোনো অভাব ছিল না। জাতির দুর্ভাগ্য যে, এই দুর্ভিক্ষের বছরই শেখ সাহেবের বড়ো ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠান হয় মাথায় সোনার মুকুট পরিয়ে মহা শানশওকতের সাথে ।

ছয়. দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি ও আত্মীয়করণের ফলে প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছিল। জনপ্রশাসন জননিপীড়নের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ সব জায়গায় দলীয় লোকজন বা আত্মীয়স্বজনদের বসানো হয়েছিল। যোগ্য কর্মকর্তাদের প্রশাসন থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। দলীয় পরিচিতিই সরকারি চাকরি লাভের জন্য একমাত্র যোগ্যতা বলে বিবেচিত হয়েছিল। ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। এমন এক পরিস্থিতিতে বিখ্যাত সাংবাদিক নির্মল সেন লিখেছিলেন—'স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই।'

সাত. প্রথমে জরুরি আইন ও বিশেষ ক্ষমতা আইন দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে একপর্যায়ে শেখ মুজিব মস্কোপন্থি কমিউনিস্টদের পরামর্শে ও সহযোগিতায় একদলীয় বাকশাল কায়েম করলেন। এটাই ছিল শেখ মুজিবের শাসনের কফিনে শেষ পেরেক। এটা তিনি নিজেই ঠুকেছিলেন। দেশের ভেতরে বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শেখ মুজিবের মতো কিংবদন্তি নেতার পতনের কারণ বিশ্লেষণ করে যত পর্যালোচনা বা অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে, তাতে একদলীয় শাসন এবং 'এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' এই তত্ত্বকেই প্রধানত দায়ী করা হয়েছে। বাকশাল কায়েম করে সব দল ও সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করে মৌলিক অধিকার হরণ করে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণেই ১৫ আগস্টের মতো ট্র্যাজিক ঘটনা ঘটতে পেরেছিল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বহাল থাকলে এমন ঘটনা ঘটত না। এক ব্যক্তির হাতে দেশের নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগসহ সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণেই ঘটেছিল এমন মর্মান্তিক সেনা-অভ্যুত্থান।

প্রখ্যাত সাংবাদিক এ জেড এম এনায়েতুল্লাহ খান তার লেখা *শেখ মুজিবের উত্থান ও পতন* শীর্ষক এক অনবদ্য নিবন্ধে লিখেছিলেন—

> "রাজনীতির বরপুত্র ও মুকুটহীন সম্রাট শেখ মুজিবুর রহমান সত্যিকার মুকুটের ভার সইতে পারলেন না।"

www.pathagar.org

প্রিয় ওয়ামী, হাফেজ মুনিরউদ্দিন কর্তৃক সংকলিত '৭২-৭৫' শীর্ষক একটি গ্রন্থে এই নিবন্ধটি আছে। আমার বইয়ের আলমারিগুলোর যেটাতে বাংলাদেশ-সম্পর্কিত বইগুলো রাখা আছে, সেখানে বইটি পাবে। এই বইটিতে বিদেশি সাংবাদিকের দৃষ্টিতে শেখ মুজিবের পতনসংক্রান্ত অধ্যায়ে এ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবে।

আট. শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ১৫ আগস্টের সেনা-অভ্যুত্থান ও সপরিবারে তার নিহত হওয়ার ঘটনায় ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। আওয়ামী লীগ এ সম্পর্কে যেসব ব্যাখ্যা দিচ্ছে বা যাদের দায়ী করছে, এ সম্পর্কে রহস্য ও সত্য উদ্‌ঘাটন একদিন অবশ্যই হবে।

এ বিষয়ে একটি বড়ো প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে ভারত সম্পর্কে। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার কাছে এমন তথ্য ছিল যে, সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ আছে বা নানা ঘটনাপ্রবাহের কারণে শেখ মুজিবের জীবনের ওপর আঘাত আসতে পারে। ১৯৭১ সালের পর থেকেই বাংলাদেশে ভারতীয় গোয়েন্দাদের কঠোর নজরদারি ছিল। বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'র'-এর বা ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার অনুপ্রবেশ বা এজেন্টদের কথা কারও অজানা ছিল না।

১৫ আগস্ট রাতে কী ঘটতে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে ভারতীয় গোয়েন্দাদের না জানার কথা নয়। সন্ধ্যা থেকে তৎপরতা শুরু হয়ে বিভিন্ন অবস্থানে ট্যাংক ও সেনা মোতায়েনসহ ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়ি ঘেরাও করে অপারেশন চালাতে যথেষ্ট সময় লেগেছে। ভারত তো চাইলে শেখ মুজিবকে বাঁচাতে এগিয়ে আসতে পারত। আর সেটা তো মাত্র ৩০ মিনিটের ব্যাপার ছিল। ভারত কেন নীরব ভূমিকা পালন করল? আনুষ্ঠানিকভাবে খবর জানার পর এটাকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ঘটনা বলে মন্তব্য করা হয় ভারত সরকারের পক্ষ থেকে। উপরন্তু খন্দকার মোশতাকের সাথে সাক্ষাৎ করে ভারতীয় হাইকমিশনার তার সরকারের পক্ষ থেকে মোশতাককে আশ্বস্ত করেন এবং তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করেন, কয়েকটি কারণে ভারত সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর অসন্তুষ্ট ছিল।

ক. বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তান থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করে দেশের মাটিতে পা রেখেই শেখ মুজিব বাংলাদেশকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে ঘোষণা করলেন। ভারত এটাকে ভালোভাবে নেয়নি।

www.pathagar.org

কারণ, বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার ইন্দিরা গান্ধীর কাছে অঙ্গীকার করেছিল যে, বাংলাদেশকে একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র করা হবে।

খ. ভারতের অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। কারণ, প্রবাসী সরকারের সাথে যে গোপন ৭ দফা চুক্তি ছিল, তাতে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সাথে অসংগতিপূর্ণ কোনো নীতি বাংলাদেশ গ্রহণ করতে পারবে না বলে শর্তারোপ করা হয়েছিল। কথিত আছে যে, এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। লাহোরে ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করাটা ভারত কোনোক্রমেই মেনে নিতে পারেনি।

গ. পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার ভুট্টোর ঢাকা সফর, তাকে লালগালিচা সংবর্ধনা প্রদান এবং তার সফর উপলক্ষ্যে ঢাকায় রাজপথে জনতার ঢল ভারতের মোটেও পছন্দের ছিল না।

ঘ. ভারতের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে পরিচিত প্রবাসী সরকারের তথা বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের প্রতি উপেক্ষা এবং শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিব কর্তৃক তাকে মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ করাটা ভারত সরকার খুব অপছন্দ করেছে এবং বলা যায় ক্ষুব্ধ হয়েছে।

ঙ. মওলানা ভাসানী কর্তৃক প্রকাশ্যে ব্যাপক ভারতবিরোধী প্রচার অভিযান পরিচালনা ভারতের জন্য ছিল খুবই বিব্রতকর। ভারতের সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে ভারতবিরোধী সেন্টিমেন্ট তীব্র হওয়ায় পেছনে মওলানা ভাসানীর অবদানই ছিল সবচেয়ে বেশি ও কার্যকর। শেখ মুজিব গোপনে মওলানা ভাসানীর সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রাখতেন। এ ব্যাপারটাকেও ভারত সরকার ভালোভাবে নেয়নি। উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার পরপরই মওলানা ভাসানী মুসলিম বাংলার পক্ষে প্রচার শুরু করেন।

চ. ভারতের রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও কূটনৈতিক মহলে শেখ মুজিব সম্পর্কে একধরনের মূল্যায়ন রয়েছে, যার প্রতিফলন ঘটেছে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের সাবেক হাইকমিশনার কর্তৃক লেখা *Liberation and Beyond : Indo-Bangladesh Relations* গ্রন্থে।

www.pathagar.org

ব্রিটেন থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য ভারত কর্তৃক এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ না করে শেখ মুজিব ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিমানে দিল্লি হয়ে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। শেখ মুজিবের অন্য সহকর্মীরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করলেও শেখ মুজিব পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে গ্রেফতারি বরণ করেছিলেন। শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারেও ইন্দিরা গান্ধীর সংশয় ছিল, যে কারণে প্রথম সাক্ষাতেই এ সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন করেন। তা ছাড়া আমেরিকায় কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত ভাষণে ১৯৭১ সালের ৬ নভেম্বর ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন—'আমি যতদূর জানি, এখনও পর্যন্ত শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি।' ভারতীয় নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবকে পাকিস্তান আন্দোলনের একজন অত্যন্ত সক্রিয় কর্মী হিসেবেই মূল্যায়ন করেন।

নয়. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও শেখ মুজিবের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব সফর করেছিলেন। ভারত শেখ মুজিবের কর্মকাণ্ডে এই বার্তাটি খুব ভালোভাবেই পেয়েছিল যে, বাংলাদশের স্বাধীনতা অর্জনে সর্বাত্মক সাহায্য করা সত্ত্বেও অন্তত্পক্ষে জাতীয়তাবাদী অসাধারণ জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিব একটি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতিই শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করবেন। শেখ মুজিব নিজেও বলতেন—'আমার জনগণের স্বার্থেই মুসলিম বিশ্ব ও আমেরিকাসহ অন্যান্য বড়ো রাষ্ট্রের সাথে আমাকে সম্পর্ক রাখতে হবে।' আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একজন জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে বাংলাদেশ একটি ছোটো ও নবীন রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্ব একটি উচ্চতর পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। ফিদেল ক্যাস্ট্রোর মতো একজন বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী নেতাও শেখ মুজিবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

অনেকেই মনে করেন, কেউ কেউ শেখ মুজিবের এমন অবস্থানকে ঈর্ষার চোখে দেখতেন। শেখ মুজিব নেতা হিসেবে যে উচ্চতায় পৌছেছিলেন, সেই পর্যায়ের একজন নেতাকে নিয়ন্ত্রণ করাটা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না।

আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে উল্লিখিত কারণেই শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত খুব একটা সিরিয়াস ছিল না। অন্যথায় ১৫ আগস্টের ঘটনা প্রতিরোধে ভারত সরকার অবশ্যই

www.pathagar.org

কোনো একটা পদক্ষেপ নিতে পারত। শেখ মুজিব নৃশংসভাবে নিহত হওয়ার পর ভারতের যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, তাতেও মনে হয় না যে ভারত এ হত্যাকাণ্ডে খুব একটা অখুশি হয়েছে।

অনেকেই মনে করেন, ১৫ আগস্ট ট্র্যাজেডির জন্য আওয়ামী লীগই দায়ী এবং আওয়ামী লীগের লুটপাট, দুর্নীতি অযোগ্যতা, অদক্ষতার খেসারত দিতে হয়েছে শেখ মুজিবকে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলাদেশ।

আবার অনেকে মনে করেন, নাস্তিক মস্কোপন্থি কমিউনিস্টদের খপ্পরে পড়ে একদলীয় বাকশালী শাসন জাতির ওপর চাপিয়ে দেওয়ার কারণেই এই মর্মান্তিক পতনের ঘটনা ঘটেছে। অনেকের ধারণা, এটাই হওয়ার ছিল এবং এটা ছিল এক ঐতিহাসিক অনিবার্যতা।

(রাত ১২:০০ টা; ২৩ আগস্ট, ২০১৩)

www.pathagar.org

শেখ মুজিবের পতনে ক্ষতি হয়েছে বাংলাদেশের

কলম হাতে নিয়ে এক ঘণ্টার বেশি সময় চিন্তা করেছি, শেখ মুজিবের এই মর্মান্তিক পতন নিয়ে। তবে সম্প্রতি প্রকাশিত শেখ মুজিবের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* পাঠ করে আমার ধারণা আরও মজবুত হয়েছে যে, শেখ মুজিবের পতনে বাংলাদেশেরই ক্ষতি হয়েছে।

আমার মনে হয়েছে, একপর্যায়ে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারতেন এবং একদলীয় শাসন থেকে হয়তো ফিরে আসতেন। যে বাস্তবতার কারণে তিনি পাক বাহিনীর সাথে যারা সহযোগিতা করেছিল এবং যাদের বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ ছিল না, তাদের সাধারণ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং পাকিস্তানের ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকেও ক্ষমা করে মুক্তি দিয়েছিলেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, সেই বাস্তবতার কারণেই হয়তো পুনরায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তিনি নিজেই ফিরে আসতেন। সেইসাথে জাতীয় ঐক্য সুসংহত করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। আজ বিভিন্ন ইস্যুতে জাতি বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, প্রতিহিংসা ও হানাহানির রাজনীতি জাতিকে গ্রাস করছে, সে দৃশ্য হয়তো আমাদের দেখতে হতো না।

তার নিজ দলের লোকেরাই যে দুর্নীতি করেছে, চুরি করেছে এমনকি রিলিফের মালামাল পর্যন্ত আত্মসাৎ করেছে—সে কথা তো নিজেই বলে গিয়েছেন। আজ দেশের রাজনীতিতে বিভিন্ন ইস্যুতে যত বিপরীতমুখী কথাবার্তা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে এবং ৪২ বছর পরও জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ ও বিপক্ষ বা স্বাধীনতাপক্ষ ও বিপক্ষ শক্তি বলে বিভাজন রেখা টেনে নেহায়েত ক্ষমতার রাজনীতি করা হচ্ছে—তেমনটি হতো না। যে মেরুদণ্ডহীন পররাষ্ট্রনীতির

www.pathagar.org

কারণে জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন হচ্ছে, শেখ সাহেবের অকাল পতন না হলে হয়তো-বা তা হতো না। তিনি যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে পাকিস্তান থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের দিনই প্রথম সাক্ষাতেই ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহারে ইন্দিরা গান্ধীকে সম্মত করে কথা আদায় করেছিলেন, তাতে এটা সুস্পষ্ট যে, তিনি একটি স্বাধীন জাতির নেতা হিসেবে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতেন। ভারত এখন যেভাবে বিগ ব্রাদারসুলভ আচরণ করে, তেমনটি হতো না।

সার্বিক বিবেচনায় তার মাপের একজন নেতার দুর্ভাগ্যজনক পতন বাংলাদেশের জন্য যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, তা অনস্বীকার্য। শেখ মুজিবের একদলীয় শাসন চালু করার সমালোচনা অনেকে করতে পারেন, কিংবা তার প্রশাসনিক ব্যর্থতারও সমালোচনা করতে পারেন; কিন্তু বাংলাদেশ সৃষ্টিতে তার অবদান এবং তার অবস্থান নিয়ে কেউ মতপার্থক্য করতে পারেন না বা করেন না। স্বাধীনতাযুদ্ধে যার যা অবদান আছে, তার স্বীকৃতিও তিনি যথার্থই দিতেন। যে জিয়াউর রহমানকে এখন আওয়ামী লীগরা পাকিস্তানের চর বলে গালি দিচ্ছেন, তার যথার্থ মর্যাদার কারণেই শেখ সাহেব তাকে সেনাবাহিনীর উপপ্রধান করেছিলেন। আজ আওয়ামী লীগ থেকে ড. কামাল বা আব্দুল কাদের সিদ্দিকীসহ অনেকেই ছিটকে পড়েছেন, তিনি থাকলে হয়তো-বা তা হতো না।

(রাত ৯:০০ টা; ২৪ আগস্ট, ২০১৩)

www.pathagar.org

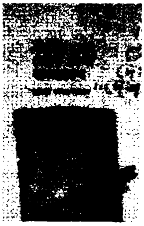

মেজর জিয়া থেকে রাষ্ট্রপতি জিয়া

গতকাল কিছু লিখিনি। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে আমি দারুণভাবে উদ্‌বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক অবক্ষয়, জনদুর্ভোগ এবং দেশের ভবিষ্যৎ এবং সেইসাথে এ দেশে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ—এসব বিষয় নিয়ে না ভেবে পারছি না। বিশেষ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের কী কর্মপন্থা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত, আমার ক্ষুদ্র চিন্তায় এর আগে যা লিখেছিলাম, তার একটি ফলোআপ লেখা প্রস্তুত করেছি। এ ব্যাপারে সাক্ষাতে তুমিও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলে।

ফাঁসির সেলে বসে এই লেখা। আমাদের ফাঁসির সেল থেকে মাত্র ১৫-২০ ফুট দূরেই একটি ফাঁসির মঞ্চ আছে। সেলটির দক্ষিণ পাশে এই ফাঁসির মঞ্চ। এখানেই জেএমবির শায়খ আবদুর রহমানের ছোটো ভাই মনির ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মামলায় ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি মুফতি আবদুল হান্নানও এখানেই আছেন। ৪০ সেলে গড়ে প্রায় ৯০ জন ফাঁসির আসামি বসবাস করেন। আমরা কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ আসামিই বয়সে নবীন বলা যায়। বেশিরভাগের বয়স ৪০ বছরের নিচে। ২০-২৫ বছর বয়সি তরুণও আছে অনেকে। নিম্ন আদালতে ফাঁসি হয়েছে এবং অধিকাংশের মামলাই হাইকোর্টের শুনানির জন্য অপেক্ষমাণ।

যাহোক, ফাঁসির সেলে বসে যে প্রস্তাব লিখেছি; আশা করা যায়, তা বর্তমান প্রজন্মের ইসলামী আন্দোলনের জন্য কাজে আসবে। এ প্রস্তাব হচ্ছে আন্দোলনের কর্মকৌশল বা কর্মপরিকল্পনা; এটা আম পাঠকদের জন্য নয়। আন্দোলনের একটি কাঠামো আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা তার বিভিন্ন ভাষণ ও কর্মসূচির মাধ্যমে দিয়ে গিয়েছেন। নতুন কিছু আমি দিয়েছি এমনটি নয়। আমি কেবল বিষয়গুলোকে সমন্বিত করে তা বাস্তবায়নের ওপর জোর দিয়েছি।

www.pathagar.org

গতানুগতিক ধ্যানধারণার পরিবর্তন করে বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করা সমীচীন বলে আমার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়েছে, তা-ই লিপিবদ্ধ করেছি। আমাদের তরুণদের মধ্যে অনেকে আছেন, যারা এটাকে আরও পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করে একটি মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করতে সক্ষম এবং এমন মেধা ও দূরদৃষ্টি তাদের মধ্যে আছে বলে আমার বিশ্বাস। চিন্তাচেতনায় ও বুদ্ধিমত্তায় ওরা আমার চেয়ে অনেক অগ্রসর ও গতিশীল। আশা করা যায়, তারা একটি টেকসই ও যুগোপযোগী কর্মকৌশল গ্রহণ করে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হবেন, ইনশাআল্লাহ। আশা করি, খুব শীঘ্রই প্রস্তাবটা তোমাদের হাতে পৌঁছবে।

ইতিহাসের অনেক ঘটনাপ্রবাহ অনেক মানুষকে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এনে দেয়। ঘটনাপ্রবাহ অনেককে নেতৃত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। অনেক সময় ব্যক্তির নিজস্ব পরিকল্পনা ছাড়াই এমনটি ঘটে যায়। জিয়াউর রহমানের সৌভাগ্য যে, বাংলাদেশের ইতিহাসে ঘটনাপ্রবাহ তাকে দুটি সময়ে বড়ো দায়িত্ব পালনের সুযোগ করে দিয়েছে।

১৯৭১ সালে জাতীয় জীবনের এক সংকট-সন্ধিক্ষণে 'আমি মেজর জিয়া বলছি' বলে তিনি যে ঘোষণাটা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, সেটা জিয়াউর রহমানকে ইতিহাসে স্থান করে দিয়েছে। তিনি স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকেই ঘোষণাটি দিয়েছিলেন এটা ঠিক। তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন বিদ্রোহী বাংলাভাষী সেনা কর্মকর্তা হিসেবে তার এই ঘোষণা সেদিন মুক্তিযুদ্ধের জন্য এক বিরাট দিকনির্দেশনার কাজ করেছে। শেখ সাহেব পাকিস্তানি মিলিটারিদের হাতে গ্রেফতারি বরণ করেছিলেন ২৫ মার্চ মধ্যরাতের আগেই। তার পক্ষ থেকে কোনো দিকনির্দেশনা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি তার ঘনিষ্ঠ কাউকেই এ সম্পর্কে কিছু বলে যেতে পারেননি বা বলেননি। সেই মুহূর্তে জিয়াউর রহমানের ঘোষণা মুক্তিযুদ্ধকে সংহত করতে বিরাট অবদান রেখেছিল। এখন আওয়ামী লীগাররা এ বিষয়ে যত কূটতর্ক বা জিয়াকে একজন রেডিওর ঘোষকমাত্র উল্লেখ করে যতই অবমূল্যায়ন করুক-না কেন, তখন কিন্তু 'আমি মেজর জিয়া বলছি' কথাটি মানুষের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই একজন অপরিচিত মেজর মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিলেন।

www.pathagar.org

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর। সিপাহি জনতার এই অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমান চলে এলেন রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে। ১৯৭৫ সালে মার্শাল ল' বা সামরিক আইন জারি করেছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদ। জিয়াউর রহমান কোনো মিলিটারি ক্যু বা সামরিক অভ্যুত্থান করে ক্ষমতায় আসেননি। ৭ নভেম্বর গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসেন। সে সময়টার মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলেন বিচারপতি সায়েম। কোনো পরিকল্পনা করে তিনি আসেননি, ঘটনাই তাকে সামনে এনেছে। ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়েই তিনি মেজর জিয়া থেকে রাষ্ট্রপতি জিয়া হয়েছেন।

রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনলেন জিয়া

একদলীয় বাকশালী শাসন কায়েমের ফলে বাংলাদেশের জনগণ মৌলিক নাগরিক অধিকার হারিয়ে যে হতাশার অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, জিয়াউর রহমান তাদের আলোর পথ দেখালেন। তিনি সাংবিধানিক সংস্কারের জন্য গণভোট করে জনগণের ম্যান্ডেট নিলেন। সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে কুখ্যাত ৪র্থ সংশোধনী বাতিল করে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করেন। ইতিহাসের কী পরিহাস যে, গণতান্ত্রিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমান গণতন্ত্র হত্যা করলেন আর একজন সামরিক নেতা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করলেন।

গণভোটের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে পরিবর্তন আনলেন। ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও পূর্ণ বিশ্বাস' এবং সমাজতন্ত্র শব্দের ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার প্রতিস্থাপন করলেন। সেইসাথে সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সংযোজন করলেন। এটা ছিল জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদ (২)-এ পরিবর্তন আনা হলো—"বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলিয়া পরিচিত হইবেন।"

অনুচ্ছেদ ৮ এর (১ক)-তে সংযোজন করেন—"সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলির ভিত্তি।" ৯ নং অনুচ্ছেদে পরিবর্তন এনে স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন এবং ১০ নং অনুচ্ছেদে জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।

www.pathagar.org

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৫ (২) সংযোজন করেন। এতে বলা হয়—"রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করিতে সচেষ্ট হইবে।"

সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে মৌলিক অধিকার বলবৎ করেন। "(১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।"

মোদ্দাকথা, একদলীয় স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে জিয়া রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনেন।

(রাত ১১:০০ টা; ২৬ আগস্ট, ২০১৩)

www.pathagar.org

আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন পুরোনো দল পুনরুজ্জীবিত হলো

জিয়াউর রহমান পর্যায়ক্রমে আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দলকে পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করেন। পিপিআর বা Political Parties Regulations-এর আওতায় মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, জাসদ প্রভৃতি দল পুনরুজ্জীবিত হলো।

১৯৭৫-এর পট পরিবর্তনের পর আওয়ামী লীগের বেশ কিছু নেতাকে দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছিল। জিয়াউর রহমান তাদের সবার মুক্তির ব্যবস্থা করেন। এভাবে আওয়ামী লীগের পুনর্জন্ম হলো জিয়াউর রহমানের হাতে। এ সময় জিয়াউর রহমান বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সমন্বয়েই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেন। অন্য কথায় তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি গঠন করলে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও মুসলিম লীগের অনেক নাম করা নেতা বিএনপিতে যোগদান করেন। অর্থাৎ, বিএনপি = আওয়ামী লীগ + ন্যাপ + মুসলিম লীগ।

১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বিএনপি ছাড়াও দেশের পুরোনো দলগুলোসহ সকল দল অংশগ্রহণ করে। জিয়াউর রহমানের কৃতিত্ব যে, দীর্ঘদিন যারা আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতি করছিলেন এবং নির্বাচনের বিরোধিতা করে আসছিলেন, তাদেরও তিনি প্রকাশ্য নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে আনতে সক্ষম হন। যার ফলে মোহাম্মদ তোয়াহার মতো কমিউনিস্ট নেতা প্রকাশ্য রাজনীতিতে এসে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৭৯ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩৯টি আসনে নির্বাচিত হয়ে প্রধান বিরোধীদলের আসনে বসে। মুসলিম লীগ ও জামায়াত (আইডিএল নামে) সম্মিলিতভাবে ২০টি আসনে জয়ী হয়। মুসলিম লীগ খান সবুরের নেতৃত্বে

www.pathagar.org

১৪টি আসন এবং জামায়াত মাওলানা আবদুর রহীমের নেতৃত্বে ছয়টি আসন লাভ করে। সবুর খান ও সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী দুটি করে আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। জাসদের শাজাহান সিরাজও এ নির্বাচনে বিজয়ী হন। বিরোধীদলের নেতা নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগের আসাদুজ্জামান খান। আওয়ামী লীগ মিজান গ্রুপ থেকে মিজানুর রহমান চৌধুরী এবং আরও তিনজন নির্বাচিত হন। বাকশালের মহিউদ্দিন আহমদও নির্বাচিত হয়েছিলেন মঠবাড়িয়া থেকে। শাহ আজিজুর রহমান প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা লিডার অব দ্য হাউজ এবং মির্জা গোলাম হাফেজ স্পিকার নির্বাচিত হয়েছিলেন। ন্যাপ নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমদকেও নির্বাচিত করে নিয়ে এসেছিলেন জিয়াউর রহমান।

১৯৭৯ সালের সংসদ যদিও-বা প্রেসিডেন্টশাসিত ব্যবস্থার সংসদ ছিল, কিন্তু বিভিন্ন দলের সিনিয়র ও তারকা রাজনীতিকদের সমাবেশ ঘটায় এই সংসদ ছিল খুবই প্রাণবন্ত। বিশেষ করে সবুর খান, শাহ আজিজ, মিজান চৌধুরী, আসাদুজ্জামান খান, মহিউদ্দীন আহমদ প্রমুখের সংসদে বিতর্ক ও আলোচনায় ছিল খুবই উপভোগ্য। তরুণদের মধ্যে কে এম ওবায়দুর রহমান, সালাহউদ্দীন কাদের চৌধুরী, কর্নেল আকবর, শাজাহান সিরাজের বক্তব্যও ছিল আকর্ষণীয়। মোদ্দাকথা, সংসদ ছিল বেশ জমজমাট ও সক্রিয়। আমরা প্রায়ই দর্শক গ্যালারিতে বসে প্রাণবন্ত বিতর্ক উপভোগ করতাম। বিশেষ করে সংসদে সবুর খানের বক্তৃতা যখন হতো, তখন পিনপতন নীরবতায় সংসদ সদস্যগণ তার বক্তৃতা শুনতেন। তার ভাষা, শব্দচয়ন ও বক্তৃতার স্টাইল ছিল এককথায় অসাধারণ। শাহ আজিজের অনবদ্য ইংরেজি বক্তৃতা আমাদের আকর্ষণ করত এবং বাংলাতেও তিনি চমৎকার বক্তৃতা রাখতেন। তবে তিনি যেসব দলিলপত্র ও বইপুস্তকের রেফারেন্স দিতেন, যে সম্পর্কে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করতেন। তিনি নাকি মনে করতেন, সংসদ সদস্যদের অনেকেই লেখাপড়া করেন না বা এসব যাচাই-বাছাই করতে যাবে না, তাই তার বক্তব্য জোরালো করার জন্য নানা রেফারেন্স তিনি ব্যবহার করতেন। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কোনো সুযোগ আমার হয়নি। তবে অনেকেই তার সাথে রসিকতা করতেন।

মাওলানা আবদুর রহীম প্রথমবারের মতো নির্বাচিত হয়ে সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। তিনি একজন অত্যন্ত বড়ো মাপের আলেম ছিলেন এবং তার

www.pathagar.org

কণ্ঠস্বর ছিল অসাধারণ গম্ভীর। বাংলা ভাষার ওপর তার দখল ছিল ঈর্ষা করার মতো। ফলে কোনো আলোচনা বা বিতর্কে যখন অংশ নিতেন, তা সংসদ সদস্যদের চিন্তায় খোরাক জোগাত। মিজানুর রহমান চৌধুরী অত্যন্ত সাবলীল ও রসিক বক্তা ছিলেন। অনেক সদস্যের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না, যারা সংসদে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখতেন এবং যার সাথে বর্তমান সংসদের কোনো তুলনাই চলে না।

(রাত ২:০০ টা। ২৯ আগস্ট, ২০১৩)

www.pathagar.org

স্বনির্ভর ও আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার জিয়া

একদলীয় শাসনের জিঞ্জির থেকে বাংলাদেশকে উদ্ধার করে জনগণের আকাঙ্ক্ষিত বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে সৈনিক জিয়ার এক ঐতিহাসিক অবদান। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিনি যে সংস্কার ও পরিবর্তন আনেন এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব যুগান্তকারী কর্মসূচি গ্রহণ করেন, তার কিছুটা আলোকপাত না করা হলে অন্যায় হবে।

জিয়াউর রহমান স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলার যে কর্মসূচি গ্রহণ করেন, তা দেশের জন্য সুদূরপ্রসারী ফল বয়ে আনে। তার ৯ দফা কর্মসূচি দেশকে উৎপাদনমুখী রাজনীতির পথে এগিয়ে দেয়। খালকাটা কর্মসূচিতে নিজে কোদাল নিয়ে মাঠে নেমে জনগণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেন জিয়া। বাংলাদেশের নদীমাতৃক অর্থনীতিতে আমাদের খাল-বিলগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমাদের নদী ও খালগুলো ভরাট হয়ে প্রাকৃতিক পানি সরবরাহে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। সেসব নদী-খাল খননের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। সারা দেশে অসংখ্য খাল স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে খনন ও সংস্কার করা হয়। সেইসাথে বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, অনাবাদি জমি চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসা, বনায়ন কর্মসূচি, খাদ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে দেশকে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যান তিনি। গ্রাম-সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন জিয়া।

এ সময় জিয়াউর রহমানের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা একান্ত জরুরি মনে করি। জিয়াউর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলে ছাত্রদের একটি অংশ তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। জিয়া জিপ থেকে নেমে বিক্ষোভরত ছাত্রদের দিকে এগিয়ে যান। ছাত্ররা তার ওপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করছিল এবং এর মধ্যেই তিনি তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলেন—'তোমাদের কী কথা আছে,

www.pathagar.org

আমাকে বলো।' একজন সামরিক শাসকের এই সাহস ও সরলতা ছাত্রদের মুগ্ধ করে এবং তারা বিক্ষোভ বন্ধ করে জিয়ার সাথে কথা বলেন। এ ঘটনার মাধ্যমে তিনি আসলে সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জয় করেন। এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রদের বিপুল অংশ জিয়ার রাজনৈতিক কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত হয়। এই প্রথম আমরা দেখলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মাঝে সরকার সমর্থকদের পাল্লা ভারী হতে। সাধারণত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সরকারবিরোধী ভূমিকাই পালন করে। কিন্তু জিয়াউর রহমানের ব্যাপারে তার বিপরীত হয়েছিল।

জিয়াউর রহমান বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে জাতীয় ছাত্র শিবিরের আয়োজন করেন মৌচাকে। এখানে ছাত্রদের দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত করার জন্য নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়। জিয়াউর রহমান জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নামে যে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন, তাতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের বিপুলসংখ্যক ছাত্র অংশগ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে জিয়ার দল বিএনপির প্রধান বা মূল শক্তিতে পরিণত হয়েছিল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। আমি যখন এ লেখাটি লিখছি, তখন কিন্তু ছাত্রদল আগের সেই ঐতিহ্য হারিয়ে বসেছে। বামপন্থিদের অনুপ্রবেশ, ক্ষমতার রাজনীতির নেতিবাচক প্রভাব এবং জিয়া-উত্তর বিএনপির রাজনীতিতে জিয়াপ্রবর্তিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, ওয়ার্কশপ ও ছাত্রদের উপযোগী কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সংগঠনটি জিয়ার সময়ের ভাবমর্যাদা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। অবশ্য অতিসম্প্রতি জিয়াউর রহমানের সময়ে গৃহীত কর্মসূচির পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে ছাত্রদলকে পুনর্গঠিত ও উদ্দীপ্ত করার কাজ কিছুটা হলেও শুরু হয়েছে। অছাত্র ও বয়স্কদের হাত থেকে নিয়মিত ছাত্র ও মেধাবীদের হাতে নেতৃত্ব তুলে দিতে পারলে ছাত্রদল আগের অবস্থায় ফিরে যেতে সক্ষম হবে। কারণ, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, খুনখারাবিতে লিপ্ত বেপরোয়া ছাত্রলীগের ওপর সাধারণ ছাত্রদের কোনো আস্থা নেই। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে পড়ে গেলে ছাত্রলীগ অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। সার্বিক বিবেচনায় ছাত্রদলের জন্য ময়দানে একটা ইতিবাচক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আদর্শিক নিষ্ঠা ও সততার সাথে একে কাজে লাগাতে পারলে সাধারণ ছাত্রদের সমর্থন পাওয়া অসম্ভব হবে না।

জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি থাকাকালে দেশের সকল ছাত্রসংগঠনের নেতাদের নিয়ে একটি জাতীয় সম্মেলন করেছিলেন। পুরোনো সংসদ ভবনে (বর্তমানে

www.pathagar.org

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও কনফারেন্স সেন্টার) এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সকল ছাত্রসংগঠনের সভাপতিগণ সেই সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এবং শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের প্রস্তাব ও পরামর্শ পেশ করেন। রাষ্ট্রপতি জিয়ার সভাপতিত্বে এই সম্মেলনে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম সংগঠন হিসেবে ইসলামী ছাত্রশিবিরকেও সেই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে ছাত্রশিবিরের কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের নিয়ে আমি সেই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করি। আমার বক্তব্য রাখার সময় হলে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাই এবং অন্যদের মতোই রাষ্ট্রপতি জিয়ার পাশে স্থাপিত স্পিকার স্ট্যান্ডে গিয়ে বক্তব্য দিই। আমি শিক্ষাব্যবস্থায় আদর্শিক সংকট সম্পর্কেই বেশি কথা বলি। শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে সৎ ও চরিত্রবান নাগরিক সৃষ্টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ভিনদেশ থেকে ধার করা ধর্মনিরপেক্ষতা বা তথাকথিত সমাজতন্ত্র আমাদের সমস্যার সমাধান নয়। জাতীয় আদর্শকে অবলম্বন করে শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং এজন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানাই। আমার বক্তব্যের মধ্যে লক্ষ করছিলাম রাষ্ট্রপতি জিয়া নিজেই নোট নিচ্ছেন। অবশ্য বক্তব্য রেকর্ড করারও ব্যবস্থা ছিল। আমার বক্তব্য শেষ করে রাষ্ট্রপতি জিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আমাদের একটি শিক্ষা সেমিনার স্মারকের দুটি কপি উপহার দিই এবং বলি—'এই স্মারকে শিক্ষাব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপ ও বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেক মূল্যবান নিবন্ধ সংকলিত আছে। শিক্ষানীতি প্রণয়নে এটা অনেক কাজে লাগবে।' একমাত্র আমরাই এই ধরনের লিখিত দলিল সেদিন রাষ্ট্রপতি জিয়ার সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। শিক্ষা সম্মেলন স্মারকের জন্য জন্য রাষ্ট্রপতি জিয়া আমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

বক্তব্য দিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে আসার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ইসলামী ছাত্রশিবিরের তখনকার সভাপতি আবুল কাশেম হায়দার (বর্তমানে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি) অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন এজন্য যে, আমি কেন সরাসরি ইসলামী শিক্ষার কথা বললাম না। যেহেতু সকল মতের ছাত্রসংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছিলেন সেখানে, তাই আমি ইচ্ছা করেই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার কথা সরাসরি বলিনি। কিন্তু আমি যা বলেছি এবং ঘোষণা দিয়ে ইসলামী শিক্ষা সেমিনার স্মারক রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের বক্তব্য

www.pathagar.org

যথার্থভাবেই তুলে ধরেছি। তা ছাড়া অনেকেই ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে আছেন অথবা কারও কারও এলার্জি আছে। এটা নিয়ে কোনো অর্থহীন বিতর্ক হোক, সেটাও আমি চাইনি। আমাদের পরিবারের সদস্যগণও বিষয়টি পরে অনুধাবন করেছেন।

(রাত ১২:০০ টা; ৩০ আগস্ট, ২০১৩)

www.pathagar.org

জিয়ার সমন্বয়ের রাজনীতি ও জাতীয় ঐক্য গড়ার প্রয়াস

বাংলাদেশের সব দল-মতের লোকদের এক ব্যাপক সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন জিয়া। দেশকে স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ এভাবে বিভাজনের রাজনীতির পরিবর্তে সব মত ও পথের রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, আইনজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের সমন্বয়ে দল গঠন করেছিলেন তিনি। ফলে তার দলে গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী, ইসলামপন্থি এমনকি বিপ্লবী রাজনীতিতে বিশ্বাসী এবং অনেক অরাজনৈতিক পেশাজীবীর সমাবেশ ঘটে। বিভিন্ন উৎস থেকে খবর নিয়ে নিজে সরাসরি যোগাযোগ করে তার দলে এসব লোককে অন্তর্ভুক্ত করেন তিনি। এজন্য রাতদিন কঠোর পরিশ্রমও করেছেন জিয়া। তুলনামূলক যোগ্য, দক্ষ, কর্মঠ ও সমাজে পরিচ্ছন্ন ইমেজের লোককেও তার দলে আনতে সক্ষম হন। আওয়ামী লীগের প্রতি আশাহত হয়েও অনেকে জিয়ার সাথে সহযোগিতা করেন এবং তার দলের সাথে সম্পৃক্ত হন। বিরোধীরা যত সমালোচনাই করুন না কেন, জিয়ার সততার কারণে তিনি দেশবাসীর আস্থা অর্জন করেন।

পাকিস্তানপন্থিদের রাজনীতিতে পুনর্বাসনের জন্য জিয়াকে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে সেটাই ছিল রাজনৈতিক বাস্তবতা। অতীতে তো এ দেশের সব মানুষই পাকিস্তানপন্থি ছিলেন। রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগের সকল নেতা পাকিস্তানপন্থি ছিলেন। শেখ মুজিব নিজে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' স্লোগান দিয়ে দেশব্যাপী বক্তৃতা করেছেন। তিনি নিজে তার *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*-তে উল্লেখ করেছেন 'পাকিস্তান কেন চাই' সে সম্পর্কিত লেখা বই ও *আজাদ* পত্রিকার বিভিন্ন কাটিং তার সাথেই থাকত এবং এসব যুক্তি তিনি তুলে ধরতেন তার বক্তৃতায়।

www.pathagar.org

পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেকেই রাজনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন করেন। যারা আন্দোলন করে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র বানিয়েছিলেন, তাদেরই একাংশ সংগ্রাম করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেন। সুতরাং অতীতে পাকিস্তানপন্থি ছিলেন যারা, তারা আওয়ামী লীগ করলে দেশপ্রেমিক বনে যান এবং অন্যরা স্বাধীনতাবিরোধী হয়ে যান—এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭১ সালেও যারা পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন, তারাও বাংলাদেশের বাস্তবতা মেনে নিয়ে তাদের রাজনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন করেছেন। আগে তারা পাকিস্তানের জন্য কাজ করেছেন এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর এখন বাংলাদেশের জন্য কাজ করছেন তারা। পাকিস্তানপন্থি যারা অতীতে ছিলেন, তারা আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ সব দলেই আছেন। সুতরাং এ বিষয়টা নিয়ে জাতিকে বিভক্ত করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। জাতির স্বার্থে সবাই একসাথে মিলে কাজ করা প্রয়োজন। সংঘাত, সংঘর্ষ ও বিভাজন জনগণের কাম্য নয়। কারণ, সংঘাত ও বিভাজন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বিরাট অন্তরায়।

জিয়াউর রহমান বিভিন্ন পথ ও মতের সম্মিলন ঘটিয়ে একটি জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আর এখানেই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জিয়া একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর সম্ভবত এ কারণেই আওয়ামী লীগের একদেশদর্শী রাজনীতির মোকাবিলায় দেশের মানুষ জিয়াউর রহমানকে গ্রহণ করেছিলেন। জিয়াউর রহমান যে পরিবর্তনটা রাজনীতিতে নিয়ে আসেন, তাতে জাতির সমর্থন ও উৎসাহ ছিল পুরোমাত্রায়।

জিয়ার আবেদনে সাড়া দিতে পারলাম না

এখানে আমার সাথে রাষ্ট্রপতি জিয়ার একটি ব্যাপার ঘটেছে, যা উল্লেখ না করলেই নয়। ১৯৭৯ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিজয় এবং একই বছর ঢাকার রমনায় ছাত্রশিবিরের বিশাল সম্মেলনের পর রাজধানীতে যে বিশাল ছাত্র শোভাযাত্রা বের হয়, তা জিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

www.pathagar.org

১৯৭৯ সালের অক্টোবরে হোটেল ইডেনে শিবিরের সদস্য সম্মেলনে নতুন সভাপতি আবু তাহের ভাইকে দায়িত্ব দিয়ে আমি শিবির থেকে যেদিন বিদায় নিই, সেদিনই জিয়াউর রহমান আমার কাছে জাসাসের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম তালুকদারকে পাঠান। রেজাউল করিমের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল ময়মনসিংহে যখন পড়াশোনা করি তখন। আমাকে রেজাউল জানালেন—'প্রেসিডেন্ট আপনাকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং আপনাকে তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।' আমি বললাম—'এই মুহূর্তে আমি ব্যস্ত; আপনি আগামীকাল আসুন, কথা বলব আপনার সাথে।'

পরদিন লাঞ্চের সময় রমনা রেস্তোরাঁয় রেজাউল ভাইয়ের সাথে আমার আলাপ হলো। তিনি রাষ্ট্রপতি জিয়ার ইচ্ছার কথা জানালেন এবং বললেন—'আপনি চাইলে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে এ সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে। তিনি চান আপনি তার যুব সংগঠনে কাজ করে তাকে সহযোগিতা করুন।'

আমার পক্ষে সারা জীবন ইসলামী আন্দোলন করে এসে হঠাৎ করে একটি ক্ষমতাসীন দলের সাথে জড়িয়ে পড়া সম্ভব নয় বলে অনেক যুক্তি দিয়ে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। রেজাউল যেহেতু নিজে জিয়ার রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি আমার যুক্তি খণ্ডন করে অনেক পালটা যুক্তি দিলেন। তিনি আরও বললেন—'প্রেসিডেন্ট সাহেব মনে করেন, আপনি দেশের ৮-১০ জন যুবকের মধ্যে একজন।' আমার অনেক প্রশংসার কথা তিনি জানালেন। আসলে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া নিছক রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যেহেতু আমার লক্ষ্য নয়, তাই এই মুহূর্তে সরাসরি রাজনীতি করার ইচ্ছা নেই বলে তাকে বিদায় দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

তিনি বললেন—'আপনি যেহেতু সাংবাদিকতাই করতে চান, তাই আরেকটা প্রস্তাব আছে। *দৈনিক দেশ* পত্রিকায় সানাউল্লাহ নূরীকে সম্পাদক করা হয়েছে এবং আপনি চাইলে সেখানেও আপনাকে একটা ভালো পজিশন দেওয়া হবে। আপনি চিন্তা করে জানান।'

আমি বললাম—'দৈনিক পত্রিকায় সাংবাদিকতা করার ইচ্ছা এই মুহূর্তে আমার নেই। কারণ, আপনি জানেন, কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমার ওপর অনেক ধকল গিয়েছে। আমার একটু বিশ্রাম দরকার এবং নিজেকে একটু গুছিয়ে নেওয়াও প্রয়োজন।'

www.pathagar.org

যাহোক, সদাহাস্য রেজাউল ভাইকে অনেক করে বুঝিয়ে বিদায় দিলাম এবং লক্ষ করলাম, বিদায় নেওয়ার সময় তার মুখে সেই পরিচিত হাসিটা নেই। শুধু বললেন—'জামান ভাই, আপনি বোধ হয় ভুল করলেন। এটা আপনার জন্য একটি বড়ো সুযোগ ছিল।'

পরদিন আমার বাসায় একজন আগন্তুক এলেন। আমি তখন আজিমপুর ছাপড়া মসজিদের পেছনে দেড় কক্ষের এক টিনশেড বাসায় ভাড়াটে হিসেবে থাকি। ভদ্রলোক যুবক এবং বয়স আমার চাইতেও কম। আমারই আরেক ঘনিষ্ঠ জুনিয়র বন্ধুর সহযোগিতায় আমার বাসার ঠিকানা সংগ্রহ করে তিনি এসেছেন। তিনি এলেন এবং সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর তার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। প্রথমেই তিনি খুব আক্রমণাত্মক ভাষায় আমাদের রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলা শুরু করলেন। রাজনীতি সম্পর্কে তার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ আমাকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে তিনি বাধ্য করলেন। মনে হয় তার সেই যোগ্যতাও ছিল, কথা বলেন বেশ গুছিয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, তার কথা বলার স্টাইল, ভাষা, শব্দচয়ন আমার খুবই ভালো লেগেছে। তিনি নিজেকে একজন সচিবের ছেলে বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি বলছিলেন—'দূর থেকে আমি আপনাকে ভালোবাসি, আপনার ভালো চাই এবং এজন্যই ঘটনাটি জানার পর আমি নিজস্ব উদ্যোগেই এসেছি। আপনি প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করার প্রস্তাব গ্রহণ না করে বড়ো একটা ভুল করেছেন। আপনি এটা কারেকশন করুন। আপনার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে এতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। আপনার মেধা ও প্রতিভাকে দেশসেবার কাজে এমনকি ইসলামের খেদমতে কাজে লাগাতে পারবেন। আমরা বেশ কিছু লোক চাই যে, প্রেসিডেন্টের আশেপাশে শক্ত কিছু ইসলামপন্থি লোক থাকা দরকার। তিনি খুব সৎ ও খোলামেলা লোক। দেশ ও কাজ ছাড়া কিছু বোঝেন না। আপনারা তার সঙ্গে থাকলে তিনি উপকৃত হবেন এবং আপনারাও উপকৃত হবেন। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, দেশ উপকৃত হবে।'

যাহোক, তার প্রচেষ্টায়ও বরফ গলেনি। তাকেও সাত-পাঁচ বুঝিয়ে কোনোমতে বিদায় দিয়েছি। ঘটনা এজন্য উল্লেখ করলাম যে, জিয়াউর রহমান তার দলে লোক সংগ্রহ করার ব্যাপারে কতটা সিরিয়াস ও উদ্যোগী ছিলেন, তা বোঝানোর জন্য। সুযোগসন্ধানীরা ক্ষমতার লোভে তার কাছে গিয়ে ভিড় জমিয়েছিলেন ব্যাপারটা এরকম নয়; বরং তিনিই খুঁজে খুঁজে লোকজনদের তার

www.pathagar.org

দলে নিয়ে এসেছেন। আর এ কারণেই যোগ্য, দক্ষ ও কর্মঠ লোকদের একটি টিম তিনি রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে খুব কম লোকের বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ করেছে। নবীন ও প্রবীণ লোকদের তিনি সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। বিচারপতি আবদুস সাত্তারের মতো প্রবীণ ব্যক্তি, বি. চৌধুরীর মতো দক্ষ চিকিৎসককে তিনি তার দলের সাথে সম্পৃক্ত করতে পেরেছিলেন। মশিউর রহমান যাদু মিয়া, শাহ আজিজ, এস এ বারী এটির মতো প্রবীণ রাজনীতিকদের তার সাথে নিয়েছিলেন।

জিয়ার অতি অল্প সময়ে পাঁচমিশালি লোকদের নিয়ে একটি বড়ো দল গঠন করতে সক্ষম হন। অনেকে মনে করেছিলেন, জিয়ার পর হয়তো এই দল টিকবে না। কিন্তু বাস্তবে তার উলটোটাই হয়েছে। জিয়ার প্রতিষ্ঠিত দল এখন দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল। জিয়ার মর্মান্তিকভাবে নিহত হওয়ার পরও তার প্রতিষ্ঠিত দল বারবার ক্ষমতায় গিয়েছে এবং রাজনীতিতে বিকল্প শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। জিয়ার যে আদর্শ ও সততার কারণে তিনি সফল হয়েছিলেন, তার দল যদি সত্যিকারার্থেই তা ধরে রাখতে পারে, তাহলে ভবিষ্যতেও এই দল ভালো করবে এটা আশা করা যায়।

(রাত ১২:৩০ টা; ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৩)

www.pathagar.org

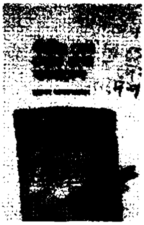

দিল্লি থেকে ফিরলেন শেখ হাসিনা আর সে মাসেই নিহত হলেন জিয়া

আমি আগেই বলেছি, ফাঁসির মঞ্চের সন্নিকটে একটি সেলে বসে আমি যখন লিখছি, তখন আমার পাশে নেই কোনো রেফারেন্স বইপুস্তক। স্মৃতির পাতায় যখন যা সামনে আসছে, তা-ই লিখছি। গতকাল বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ছিল। সংবাদপত্রে ও রেডিওতে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনের খবর দেখে এবং জিয়ার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র হরণের অভিযোগ তুলে শেখ হাসিনার দেওয়া বক্তৃতা শুনে মনে পড়ল তখনকার পরিস্থিতির কথা।

জিয়াউর রহমান কর্তৃক বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করার এবং দুর্নীতির দায়ে আওয়ামী লীগের যেসব নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাদের মুক্তি দেওয়ার পর ১৯৭৯ সালে সকল দলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩৯টি আসনে জয়লাভ করে প্রধান বিরোধীদলের আসনে বসে। এই অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগে যখন নেতৃত্বের সংকট চলছিল, তখন ড. কামাল হোসেনসহ আওয়ামী লীগ নেতাদের একটি অংশ দিল্লিতে অবস্থানরত মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের বড়ো মেয়ে শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরত আনেন।

শেখ হাসিনা নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর তত্ত্বাবধানে সরকারি কর্মচারীদের আবাসিক এলাকায় একটি ফ্লাটে অবস্থান করছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিজে তার খোঁজখবর নিতেন এবং শুনেছি, তাকে রাজনীতির জন্য উপযুক্ত করে তোলার জন্য নিয়মিত ক্লাস নিতেন। ঘটনাক্রমে ১৯৯২ সালে আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামীর শুভেচ্ছা প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে আমাদের দিল্লি সফরের সময় বাংলাদেশ হাইকমিশনে কর্মরত পলিটিক্যাল কাউন্সিলের বাসায় আমরা একটি লাঞ্চের

www.pathagar.org

দাওয়াতে গিয়েছিলাম। তিনিই আমাদেরকে জানিয়েছিলেন, এখানকারই একটি ফ্লাটে থাকতেন শেখ হাসিনা, ভারত সরকারের ব্যবস্থাপনায় তথা গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে।

রাষ্ট্রের স্থপতির রক্তাক্ত ও ট্রাজিক বিদায়, বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফের ব্যর্থ অভ্যুত্থান, ৭ নভেম্বরের সিপাহি-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশে নেতৃত্বের হাল ধরেন একজন জেনারেল জিয়াউর রহমান। গণ-অভ্যুত্থানের পর গণভোটের মাধ্যমে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়েই তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করেন। তার নেতৃত্বে বিপর্যস্ত বাংলাদেশ যখন ঘুরে দাঁড়িয়েছিল এবং দৃশ্যমান হয়েছিল সম্ভাবনার আলো, দেশ এগিয়ে চলছিল উৎপাদন ও উন্নয়নের দিকে, কৃষি ও শিল্পে সূচনা হয়েছিল নবজাগরণের এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো জেগে উঠেছিল নব-উদ্দীপনায় এবং শিক্ষার আঙিনায় সৃষ্টি হয়েছিল সুন্দর শিক্ষার পরিবেশ ও সর্বোচ্চ সহনশীলতা, ঠিক এমনই একসময়ে পিতৃহত্যার পর দিল্লি থেকে প্রথমবারের মতো দেশে ফিরে এলেন শেখ মুজিবতনয়া শেখ হাসিনা।

১৯৮১ সালের ১৭ মে দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন শেখ হাসিনা এবং অনেকটা কাকতালীয়ভাবে এ মাসেরই ৩১ তারিখে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে এক ব্যর্থ অভ্যুত্থানে নৃশংসভাবে নিহত হন রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান। সেদিন শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ কুমিল্লায় ছিলেন। ব্যর্থ অভ্যুত্থান ও জিয়ার হত্যাকাণ্ডের খবর জানার পর শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ নেতারা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে পুলিশের হাতে আটক হন। পরে তাদের ঢাকায় ফেরত পাঠানো হয়। এ ঘটনার কারণে তখন কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছিল।

বিচারপতি আবদুস সাত্তার ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং জেনারেল এইচ এম এরশাদ তখন সেনাপ্রধান ছিলেন। চট্টগ্রামের জিওসি জেনারেল এম এ মঞ্জুর জিয়ার বিরুদ্ধে ব্যর্থ অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন। তিনি একজন চৌকশ মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তা ছিলেন। সম্ভবত জেনারেল এরশাদ তাকে সিজিএম পদ থেকে সরিয়ে চট্টগ্রাম ডিভিশন কমান্ডার করে পাঠান। এরশাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাদের সরিয়ে পাকিস্তানফেরত সেনা অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে বসানো হচ্ছে। এরশাদ নিজেও একজন পাকিস্তানফেরত

www.pathagar.org

অমুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তা। ওদিকে জুনিয়র মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাদের প্রমোশন দিয়ে সিনিয়রদের ওপর বসানোর কারণে পাকিস্তানফেরত সিনিয়র সেনা কর্মকর্তাদেরও ক্ষোভ ছিল। তাদের যুক্তি ছিল, তারা পশ্চিম পাকিস্তানে না থেকে বাংলাদেশ অবস্থান করলে তো তারাও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতেন। অপারগতার জন্য তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। এজন্য তাদের জুনিয়র কর্মকর্তাদের একাধিক প্রমোশন দিয়ে তাদের ওপর বসিয়ে দেওয়াটাকে তারাও মেনে নিতে পারেননি। আর এদিকে জীবন বাজি রেখে যারা রণাঙ্গনে লড়াই করেছেন, তাদের আবেগ ও দাবিও অগ্রাহ্য করার মতো ছিল না।

মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তানফেরত সেনা কর্মকর্তাদের এই বিভাজন সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি করে। মেজর জেনারেল মঞ্জুরকে জিয়ার বিরুদ্ধে কেউ উসকিয়ে দিয়েছিলেন কি না অথবা মঞ্জুর একটি সেনা-অভ্যুত্থান ঘটিয়ে জিয়াকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন অথবা মুক্তিযোদ্ধাদের দাবি আদায়ের জন্য পদক্ষেপ নিতে গিয়েই এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটানো হয়েছিল কি না, তা সুস্পষ্ট নয়। সেনা সদর দফতর বা সেনাপ্রধানের সমর্থন ছাড়া চট্টগ্রামে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তা সফল করা সম্ভব নয়, তা বোঝার জন্য খুব বড়ো সামরিক বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। মেজর জেনারেল মঞ্জুর এমন একটি অপরিপক্ব পদক্ষেপ নিতে গেলেন কেন?

গ্রেফতারের পর মেজর জেনারেল মঞ্জুরকে হত্যা করে ফেলায় কোনো রহস্য উদ্‌ঘাটনই সম্ভব হয়নি। অনেকে মনে করেন, সেনাপ্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ অত্যন্ত কৌশলী ভূমিকা পালন করে থাকতে পারেন। আমি যখন এ লেখাটি লিখছি, তখনও মঞ্জুর হত্যা মামলাটি রায়ের জন্য আদালতে অপেক্ষমাণ। জেনারেল এরশাদকে এক নম্বর আসামি করে মামলাটির দীর্ঘ শুনানির পর এখন রায়ের অপেক্ষায়।

চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে ব্যর্থ সেনা-অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত হওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার। পরদিন বঙ্গভবনে সকল রাজনৈতিক দলের এক সভা আহ্বান করা হলে আওয়ামী লীগ, জামায়াত, মুসলিম লীগ, জাসদ, ন্যাপ, সিপিবিসহ সকল রাজনৈতিক দলের নেতারা এতে যোগ দেন এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সাথে সংহতি ঘোষণা করে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার পক্ষে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। ওদিকে সেনাবাহিনীও

www.pathagar.org

সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার পক্ষে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করে। জেনারেল মঞ্জুর চট্টগ্রামে সামরিক অভ্যুত্থানের ঘোষণা দিয়ে কিছু ফরমান জারি করেছিলেন। মঞ্জুরের বাহিনীতে কিছু সৈনিক শুভপুর সেতু পর্যন্ত অবস্থান নিলেও শেষ পর্যন্ত টিকতে পারেননি। একটি চা বাগান থেকে মঞ্জুরকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর চট্টগ্রামে আনা হলে বিক্ষুব্ধ সৈনিকরা তাকে হত্যা করে। তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো গেলে জিয়া হত্যার সকল রহস্য উদ্ঘাটিত হতো। জিয়া হত্যার ষড়যন্ত্রে যারা পেছন থেকে কলকাঠি নেড়েছিল, তারাই আসলে মেজর জেনারেল মঞ্জুরকে হত্যা করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজটা করেছে।

জিয়ার জানাযা

জিয়াউর রহমানের লাশ রাঙ্গুনিয়ার এক পাহাড়ের পাদদেশে দাফন করা হয় খুব দ্রুততার সাথে। পরে অবশ্য সেনাবাহিনী তার লাশ উদ্ধার করে ঢাকা পাঠায়। ঢাকায় জিয়ার কফিন আনার পর রাজধানীতে অভূতপূর্ব এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সেদিন ঢাকার পত্রিকাগুলোর প্রধান শিরোনাম ছিল— "কাঁদো বাংলাদেশ কাঁদো"।

মানিক মিয়া এভিনিউতে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে লাশ এনে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সামনে কিছুক্ষণ রাখা হয়। *দৈনিক সংগ্রাম*-এর তখনকার জেনারেল ম্যানেজার নাজির আহমদ ভাই ও আমি গিয়েছিলাম সেখানে। তবে লাশ কাউকে দেখানো হয়নি। গুলিতে এতটাই বিধ্বস্ত হয়েছিল জিয়ার লাশ, যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। খুব কাছে থেকে ব্রাশফায়ার করে জিয়াকে হত্যা করা হয়েছিল। মানিক মিয়া এভিনিউ, আসাদ গেট থেকে ফার্মগেট, গোটা সংসদ ভবন, উত্তর ফার্মগেট সংলগ্ন সকল রাস্তা জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও আমরা ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল থেকে আর সামনে যেতে পারিনি। বিশ্ব ইতিহাসে এত বড়ো জানাযার নজির নেই। সাধারণ মানুষের হৃদয়ে জিয়া কতটা স্থান করে নিয়েছিলেন, জানাযায় লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতি তার প্রমাণ। চোখের পানি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় দেশের মানুষ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াকে সেদিন বিদায় জানিয়েছিল। সংসদ ভবনের উত্তরে ক্রিসেন্ট লেকের পাশের উদ্যানে জিয়াকে সমাহিত করা হয়।

www.pathagar.org

প্রিয় ওয়ামী, ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ তারিখ তোমার জন্মের পরদিন অর্থাৎ ৮ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি জিয়ার সাথে আমার শেষ দেখা হয় মৌচাকে। WORLD ASSEMBLY OF MUSLIM YOUTH-ওয়ামীর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে রাষ্ট্রপতি জিয়া এসেছিলেন মৌচাকে। সেদিন ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারও ছিলেন তার সাথে। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি ও ওয়ামীর বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসেবে আমি ছিলাম এই সম্মেলনের প্রধান সংগঠক। যুব মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে আমরা এই যুব সম্মেলনের আয়োজন করি। যুব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল মন্ত্রী প্রখ্যাত কলামিস্ট খোন্দকার আবদুল হামিদের পৃষ্ঠপোষকতায় সরকারের সচিব সফদর সাহেব, কমোডর আতাউর রহমান ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক যুগ্মসচিব এ এফ এম ইয়াহিয়া ও আমি ছিলাম সম্মেলন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য। এশিয়ার ১৬টি দেশ থেকে বিভিন্ন ইসলামী যুব ও ছাত্রসংগঠনের বাছাই করা প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলন শুরুর আগের দিন মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি দুনিয়ায় বুকে এসেছ। সৈয়দা ফিরোজা বেগমের লালমাটিয়ার ক্লিনিকে ৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৮০) ঠিক মাগরিব নামাজের সময় তোমার জন্ম হয়। ওয়ামীর কিছু প্রতিনিধি ক্লিনিকে তোমাকে দেখতে এসে তোমার নাম দিয়েছিলেন ওয়ামী। সেই থেকেই তোমার নাম হয়ে যায় ওয়ামী। তখন আজিমপুরের ছাপড়া মসজিদের পাশে একটি ছোট্ট টিনশেডের বাসায় আমরা থাকতাম। তোমার জন্মের সময়ও আমি কিন্তু প্রচণ্ড ব্যস্ত ছিলাম। কারণ, সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে প্রতিদিন আমাকে মৌচাকে যেতে হতো। ঢাকা থেকে মৌচাক প্রায় ৫০ কিলোমিটার পথ।

যাহোক, জিয়াউর রহমানের নিহত হওয়ার পরদিন সকালে আমি ভেসপা মোটরসাইকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছিলাম আমাদের বন্ধু চিকিৎসাধীন বন্দি আমিনুল হককে দেখতে। তিনি ঢাকা মেডিকেলের কেবিন ব্লকে ভর্তি ছিলেন। সেখানে তার চিকিৎসায় নিয়োজিত ডা. খুরশিদের অফিসেই মনে হয় দশটার দিকে জানতে পারলাম, গতরাতে রাষ্ট্রপতি জিয়াকে চট্টগ্রামে একদল সেনাসদস্য হত্যা করেছে। রেডিওতে এই খবর শোনার পর আজিমপুরের ফারুক বলল—'জামান ভাই, এখন আপনার এখান থেকে চলে গিয়ে খোঁজখবর নেওয়া দরকার।' সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আমি ও ফারুক সোজা মগবাজারে *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*-র কার্যালয়ের দিকে রওনা করি।

www.pathagar.org

রমনা থানার পাশ দিয়ে কাজী অফিসের গলি অতিক্রম করার সময় দেখলাম, সংগ্রামের জেনারেল ম্যানেজার আমাদের নাজির ভাই (নাজির আহমদ, বগুড়া) তার লাল ডাটসন গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে দ্রুত গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেলেন। পাশে বসা অধ্যাপক গোলাম আযম। পরে জানলাম—দেশের এই পরিস্থিতিতে কী ঘটে এবং পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, তাই অধ্যাপক সাহেবের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তিনি তাকে নিয়ে তার নিজের বাসা মোহাম্মদপুরে রেখেছিলেন। আমি লক্ষ করেছি, সব সংকটময় সময়ে এই লোকটা খুবই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। আমাদের ছাত্রজীবনেও যখন কোনো ঘটনা ঘটেছে, দেখতাম কোথা থেকে যেন এসে হাজির হয়েছেন এবং পরামর্শ দিয়ে সাহস জুগিয়েছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নাজির ভাই এই দায়িত্বটা পালন করে গিয়েছেন।

(রাত ১১:৩০ টা; ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩)

www.pathagar.org

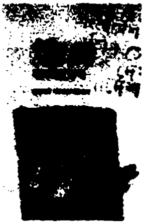

ক্ষমতাসীনরা যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে

৩ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর ফাঁসির সেলে আমার জন্য ছিল অত্যন্ত কঠিন কয়েকটি দিন। কারাজীবনের কষ্টের মধ্যে এর চাইতে কঠোর আর কোনো দিন ছিল না। একটি ভুল তথ্যের ভিত্তিতে কারাকর্তৃপক্ষ আমার লেখার খাতা-কলম নিয়ে যায়। ব্যাপারটা ২-৩ দিনের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যায়। তারা যে বিষয়ে আশঙ্কা করেছিল, তাতে আমার কোনো সংশ্লিষ্টতা তারা পায়নি। কিন্তু তারপরও ১৬টি দিন চলে যায় আমার খাতা ফেরত দিতে। সব খাতা দেয়নি। মাত্র একটি খাতা দিয়েছে আমার লেখার জন্য। তবুও ধন্যবাদ জানাই। না দিলে তো কিছুই করার ছিল না। কারণ, কারাগারে বন্দিরা বড়ো অসহায়। এই দিনগুলো আমার জন্য এতই কষ্টকর ছিল যে, তা প্রকাশ করার ভাষা আমার জানা নেই। কারণ, ফাঁসির সেলে আসার পর আমার সময় কাটানোর সবচাইতে বড়ো উপায় ছিল লেখালিখি করা।

ডিভিশনে থাকতে পড়াশোনা করেছি বেশি সময় এবং বই পাওয়ার সুযোগও ছিল সেখানে বেশি। আমার নিজের বই ছাড়াও অন্যদের কাছে অনেক বই ছিল। বিশেষ করে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী। মির্জা সাহেবের দু-বার কাশিমপুর কারাগারে অবস্থানের কারণে তার কাছ থেকেও রাজনীতির অনেক ভালো বই পড়তে পেরেছি। সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর কাছেও আইন ও সংবিধানসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বই ছিল। ক্যাপ্টেন রাজিবকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারেও দেখেছি অনেক বই পড়তে এবং কাশিমপুর কারাগারেও সেই বই পড়ে সময় কাটান। তার কাছ থেকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই পড়েছি। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বাংলাদেশি আমেরিকান আনসারী সাহেবও আমাকে অনেক বই পড়তে দিয়েছেন। এ দুজনের কাছে বেশ কিছু ইংলিশ ফিকশনও পড়েছি। তা ছাড়া তোমরাও তো বই পাঠিয়েছ অনেক।

www.pathagar.org

ফাঁসির সেলে বই পাওয়ার সুযোগ কম। তাই লেখার ওপরই আমি বেশি জোর দিয়েছিলাম। বেশ কিছু লেখাও হয়েছে। এখন শঙ্কিত আছি, কারাকর্তৃপক্ষ যেসব লেখার খাতা নিয়ে আটকে রেখেছে, তা ফেরত পাব কি না। তবে কর্তৃপক্ষ বলেছে, সেগুলো নষ্ট হবে না, সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে। তাই বিগত ১৬টি দিন আমার জন্য ছিল অনেক বেশি লম্বা। নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত ও শুয়ে-বসে সময় কাটিয়েছি। রেডিওর খবর শুনেছি। মাঝেমধ্যে বিটিভির অনুষ্ঠানও অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেখতে হয়েছে।

প্রিয় ওয়ামী! ১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর এ দুদিন ছিল খুবই যাতনাদায়ক ও কষ্টকর। আবদুল কাদের মোল্লা ভাইয়ের আপিলের রায় হলো ১৭ তারিখ। আগের দিন খবর পাওয়ার পরই মনটা বেশ খারাপ হয়ে যায় অজানা আশঙ্কায়। ১৭ তারিখ সকাল দশটায় এবিসি রেডিওর খবরে জানতে পারলাম, তোমার মোল্লা চাচার ট্রাইবুনালে দেওয়া যাবজ্জীবনের সাজা বাড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আপিল বিভাগ। হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ, এটা ইতিহাসে নজিরবিহীন। আপিল বিভাগ সাধারণত দণ্ড বহাল রাখে অথবা কমায়। তবে নিম্ন আদালতের অধিকাংশ মৃত্যুদণ্ডের রায়ই যাবজ্জীবন হয় বা খালাস হয় হাইকোর্টে বা পরে আপিল বিভাগে। নিম্ন আদালত থেকে আপিল বিভাগে আসতে মাঝখানে হাইকোর্টের বেঞ্চে আরেক দফা শুনানি হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দণ্ড কমে বা আসামি বেকসুর খালাস পায়। বেশ কিছু ক্ষেত্রে সাজা বহাল থাকে। তবে মৃত্যুদণ্ডের সাজা বহাল থাকে ওইসব মামলায়; যাদের দেখার, তদবির করার বা টাকা-পয়সা খরচের কেউ নেই। তারপর আপিল বিভাগের মামলা সিরিয়ালে আসতে অনেক সময় লাগে। এ ব্যাপারে বছরের পর বছর চলে গেলেও অনেক মামলা সিরিয়ালে আসে না। সরকারের আগ্রহের মামলাগুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আপিল বিভাগে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়। এখানে সরকার নীতি-নৈতিকতা রক্ষা করে না; বরং প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে রাজনৈতিক (প্রতিপক্ষের) মামলাগুলোকেই দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি করে থাকে।

মামলাবাজ হিসেবে আওয়ামী লীগ এসব ব্যাপারে খুবই অগ্রসর। মামলা দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ তুলনাহীন। তা ছাড়া আওয়ামী লীগ উচ্চতর আদালতকে খুবই সফলভাবে দলীয়করণ করেছে। বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, তাতে আগামী ২৫ বছর পর্যন্ত আওয়ামী

www.pathagar.org

লীগাররাই প্রধান বিচারপতি হবেন এবং উচ্চতর আদালতে দলীয় প্রাধান্য বহাল থাকবে। আওয়ামী লীগ যাদের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে, তারা কেবল দলীয় অনুগতই নন; বরং চরম প্রতিহিংসাপরায়ণ দলবাজ।

সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক আওয়ামী লীগের পক্ষে যেসব ঐতিহাসিক রায়গুলো দিয়ে গিয়েছেন, তা বাংলাদেশের রাজনীতির ওপর দারুণ প্রভাব ফেলেছে। এ এইচ এম শামসুদ্দীন চৌধুরী মানিকের মতো নিকৃষ্ট দলীয় পান্ডাকে ৪০ জন বিচারপতিকে ডিঙিয়ে আপিল বিভাগে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই আপিল বিভাগ থেকে জামায়াতে ইসলামীর বা আওয়ামী-বিরোধীদের সুবিচার পাওয়ার প্রশ্নই অবান্তর। মোল্লা সাহেবকে খুবই অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আপিল বিভাগ। বিচার বিভাগের ইতিহাসে এটি একটি বড়ো ধরনের কলঙ্ক হয়ে থাকবে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও ক্ষমতার লোভে এ ধরনের অবিচারের কথা ইতিহাসে পড়েছি, কিন্তু আজ তা নিজের সামনেই দেখতে পেলাম।

অতীতে ইসলামী আন্দোলনের অনেক নেতাকর্মীর ওপর রাজশক্তির অকথ্য জুলুম ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। রাজনীতির দাবার গুটি হিসেবে এ ধরনের জঘন্য হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। আমরা তো সাধারণ মানুষ, ইতিহাসে দেখা যায়—সম্পূর্ণ বিনা কারণে ক্ষমতাসীন শক্তিধররা অনেক নবি-রাসূলের ওপর পর্যন্ত নির্যাতন চালিয়েছে। আল্লাহর প্রেরিত নবি-রাসূলকে ঠাট্টাবিদ্রুপ করেছে এবং হত্যা পর্যন্ত করেছে। মহানবি মুহাম্মাদ সা.-এর ওপর চালানো হয়েছে কঠোর নির্যাতন। তাঁকে পাগল ও জাদুকর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাঁকে জন্মভূমি ত্যাগে (হিজরত) বাধ্য করা হয়েছে এবং তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। যুগে যুগেই আল্লাহর দুশমনরা ইসলামপন্থিদের ওপর নির্যাতন করেছে। নির্যাতনের এই ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত রয়েছে।

(রাত ২:০০ টা; ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩)

বিশ্বনবি মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর সঙ্গীসাথি সাহাবিদের ওপর যে নজিরবিহীন জুলুম ও নির্যাতন চালানো হয়েছে, তা তো ইতিহাসেই লিপিবদ্ধ আছে। এরপর বিগত দেড় হাজার বছরে সব যুগেই ইসলামপন্থিদের ওপর ক্ষমতাসীন

www.pathagar.org

রাজশক্তি নিপীড়ন চালিয়েছে। বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় যেসব মহাপুরুষ ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছেন, কায়েমি স্বার্থবাদী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ও তাদের দোসররা ওইসব মহামানবের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে। অনেককে হত্যা করা হয়েছে, বিনা কারণে কারারুদ্ধ বা দেশান্তর করা হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী আন্দোলনের ওপর নির্যাতনের সবচেয়ে বড়ো হৃদয়বিদারক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মিশরে। মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল বান্নাকে আততায়ী দিয়ে হত্যা করা হয়। জনপ্রিয় এই নেতা তরুণ বয়সেই দ্যুতি ছড়ান। অসাধারণ বাগ্মী ও বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী এই নেতা অতি অল্প সময়ে মুসলিম ব্রাদারহুডকে গোটা আরববিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। গোটা মুসলিম বিশ্বব্যাপী মুসলিম ব্রাদারহুডের আন্দোলনের সুনাম-সুখ্যাতির বিস্তার ঘটে। নবচেতনা জাগ্রত হয় মুসলিম যুবসমাজের মাঝে। ক্ষমতাসীনরা যখন বুঝতে পেরেছে, মুসলিম ব্রাদারহুড তাদের ক্ষমতার জন্য একসময় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করবে। আর তাই মুসলিম ব্রাদারহুডকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা এক ক্ষণজন্মা প্রতিভাকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য হত্যা করা হয়।

একটি যুব সম্মেলনে বক্তৃতা শেষে ফেরার পথে তাকে গুলি করা হয়। শায়খ হাসান আল বান্নার জানাযায় জনগণকে যোগদান থেকে বিরত রাখার জন্য কারফিউ জারি করা হয়। হাসান আল বান্নার পিতা ছিলেন দেশের অন্যতম বড়ো আলেম ও পণ্ডিত। বৃদ্ধ পিতাকে তার সন্তানের লাশ কবরে নামাতে হয়। মিশরের শাসকগোষ্ঠীর এই জুলুম অব্যাহত থাকে।

পরবর্তী সময়ে মিশরে সেনাবাহিনী ও সিভিলিয়ানদের যৌথ প্রচেষ্টায় গণ-অভ্যুত্থান হয়। ক্ষমতার দৃশ্যপটে আসেন কর্নেল নাসের। কর্নেল নাসের প্রথম দিকে মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে সম্পর্ক রেখেছেন এবং অভ্যুত্থানে ইখওয়ানের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নিয়েছেন। কিন্তু একপর্যায়ে ব্রাদারহুডের সাথে আদর্শিক কারণে দূরত্ব তৈরি হয় নাসেরের। কর্নেল নাসের কমিউনিজমের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নাসের দমনপীড়ন শুরু করেন ব্রাদারহুডের ওপর। মুসলিম ব্রাদারহুডকে একপর্যায়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং হাজার হাজার নেতাকর্মীকে আটক করা হয়।

www.pathagar.org

প্রহসনের বিচারের মাধ্যম শায়খ হাসান আল বান্নার সহকর্মী আবদুল কাদের আওদা, সাইয়িদ কুতুবসহ অনেককে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। কারাপ্রকোষ্ঠে বছরের পর বন্দিজীবন কাটাতে বাধ্য হন ব্রাদারহুডের নেতাকর্মীরা।

আনোয়ার সাদাত ক্ষমতায় আসার পর মিশর ক্রমান্বয়ে আমেরিকার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং আগের শাসনামলের মতোই চলে মুসলিম ব্রাদারহুডের ওপর কঠোর নির্যাতন। পরে ক্ষমতাসীন হন হোসনি মোবারক। তার শাসনামলেও ব্রাদারহুডের প্রতি বৈরীভাব অব্যাহত থাকে। অবশেষে আরব বসন্তের মাধ্যমে পতন ঘটে হোসনি মোবারকের। জনগণের অবাধ ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ব্রাদারহুডের মুহাম্মাদ মুরসি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই নানামুখী ষড়যন্ত্রে পতন ঘটে মুরসি সরকারের। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মুরসিকে বিগত ৩ জুলাই (২০১৩) ক্ষমতাচ্যুত করার পর জেনারেল আবদুল ফাত্তাহ আল সিসি একই ধারাবাহিকতায় মুসলিম ব্রাদারহুডের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছেন। অথচ আল সিসি মুহাম্মাদ মুরসির নিয়োগপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনী প্রধান। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যোগসাজশে সেনাবাহিনী এখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইসলামী আন্দোলনের ওপর। বিগত দুই মাসে কয়েক সহস্র ব্রাদারহুড নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে এবং বন্দি করা হয়েছে হাজার হাজার। সেইসাথে চলছে বিচারের নামে প্রহসন।

বাংলাদেশে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার যা করছে, তা মিশরের ঘটনারই পুনরাবৃত্তিমাত্র। প্রতিবেশী দেশ ভারতের সমর্থনপুষ্ট শেখ হাসিনা বাংলাদেশের ইসলামী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করতে বদ্ধপরিকর। এই নীলনকশার পেছনে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী ও ইহুদিচক্রের যোগসাজশ আছে। মাত্র দুদিন আগে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীর বিচারকে যে ভাষায় সমর্থন জানিয়েছেন, তাতে প্রমাণিত হয় যে, ৪২ বছর পর বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজে বিভাজন সৃষ্টির জন্য ভারত এই ইস্যুটিকে কাজে লাগাচ্ছে। আর ক্ষমতার নেশায় বিভোর আওয়ামী লীগ তা বাস্তবায়ন করছে। অথচ আওয়ামী লীগের সাথে যখন জামায়াতের সম্পর্ক ভালো ছিল এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার দাবিতে যখন যুগপৎ কর্মসূচি দিয়ে আন্দোলন করেছে এবং ১৯৯৬ সালের নির্বাচন ও নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেও সে সময় যুদ্ধাপরাধ বিচারের ইস্যুটিকে তারা কোনো অ্যাজেন্ডা

www.pathagar.org

হিসেবে আনেনি। কিন্তু ৯৮-৯৯ সালে বিএনপির সাথে চারদলীয় জোট গঠন এবং ২০০1 সালের নির্বাচনে চারদলীয় জোটের বিপুল বিজয়ের পরই প্রতিবেশীদের যোগসাজশে আওয়ামী লীগ বিচারের নামে বাংলাদেশের ইসলামী শক্তিকে নির্মূল করার কৌশল গ্রহণ করেছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইরাক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন ইহুদি সেনা কর্মকর্তার সাথে মিলিত হয়ে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে শেখ হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে শতকরা ৩৫% ভাগই মাদরাসা শিক্ষা থেকে আসা এবং এটা একটি গভীর উদ্‌বেগের কারণ। লেখাটিতে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে, মৌলবাদীরা সেনাবাহিনীতে জেঁকে বসেছে। ধর্মনিরপেক্ষ দেশ গড়ার ক্ষেত্রে এটি একটি অন্তরায়। সেনাবাহিনীকে ইসলামমুক্ত করার লক্ষ্য থেকেই নিবন্ধটি রচনা করা হয়।

ওদিকে ভারতের নীতিনির্ধারকরা তিনটি শক্তিকে বাংলাদেশে সেক্যুলারিজমের অন্তরায় মনে করেন। তাদের বিবেচনায় এই তিন শক্তি হলো (১) বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী, (২) মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা, (৩) জামায়াতে ইসলামী। তাদের এটাও ধারণা যে, এই তিন শক্তির পেছনে রয়েছে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই। অথচ তারা ও পশ্চিমাশক্তি খুব ভালোভাবেই তাদের বিভিন্ন অ্যাজেন্সির মাধ্যমে তথ্য-প্রমাণাদি দিয়ে জানে যে, জামায়াতে ইসলামী কোনো ধরনের জঙ্গি তৎপরতার সাথে সম্পৃক্ত নয় বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জামায়াত বিশ্বাসও করে না। কিন্তু তাদের একটি বড়ো আশঙ্কা যে, খোদ ইসলামের মধ্যেই সন্ত্রাসবাদ বা জঙ্গিবাদের বীজ রয়েছে এবং ইসলাম একটি মিলিট্যান্ট রিলিজিয়ন। এ কারণে সংগঠিত দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতিতে আরও প্রভাব বৃদ্ধির পক্ষে তারা নয়। জামায়াত আগে বাড়ুক, এটাও তারা চায় না। সুতরাং আজ বাংলাদেশে জামায়াতের নেতাদের বিচারের নামে হত্যা করে জামায়াতের আন্দোলনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করার ক্ষেত্রে ভারত নগ্নভাবে সমর্থন দিচ্ছে। এটা যেমন ঠিক, তেমনি পশ্চিমারাও এতে অখুশি নয়। ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের হত্যা করা হলে তা পশ্চিমা স্বার্থের পক্ষেই যায়।

যে কথা শুরু করেছিলাম, তা হলো—যুগে যুগেই ক্ষমতাসীন শাসকদের হাতে ইসলামী অন্দোলনের নেতারা নির্যাতিত হয়েছেন এবং আজও হচ্ছেন।

www.pathagar.org

বাংলাদেশে আমাদের ওপর যা হচ্ছে, তা ইসলামের ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। তবে এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আদর্শ হিসেবে ইসলাম অনেক বেশি সামনে চলে এসেছে এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামের অবস্থান মজবুত হয়েছে। সরকারপ্রধান থেকে শুরু করে সরকারের সব প্রচারসংস্থাকে প্রতিনিয়ত বলতে হচ্ছে যে, তারা ইসলামের পক্ষে অনেক কাজ করছেন। নাস্তিক বা কমিউনিস্ট মন্ত্রীরাও ইসলামের কথা বলে মুখে ফেনা তুলছেন। ধর্মনিরপেক্ষ সরকার ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিল পাশ করে বলছে যে, এর মাধ্যমে জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হলো। ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের বিচারের নামে যে প্রহসন সরকার করছে, তার ফসল এ দেশের ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী মানুষদের ঘরে উঠবে—এ ব্যাপারে আমার কোনো সংশয় নেই। তাই তোমরা এতে উদ্‌বিগ্ন বা বিচলিত হয়ো না। তোমার মোল্লা চাচার ছেলে-মেয়েদের বলবে যে, এই ত্যাগ ও কুরবানি বৃথা যাবে না। আমরা সবাই একই পথের যাত্রী।

(শুক্রবার, সকাল ১১:০০ টা; ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩)

www.pathagar.org

রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি আবদুস সাত্তারের ভূমিকা

মেজর জিয়া থেকে রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেছি। জিয়ার বিরুদ্ধে ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণা হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। জিয়া হত্যার ব্যাপারটা কেবল কতিপয় মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তার ক্ষোভ নাকি এর পেছনে আর কোনো রহস্য করেছে? পেছন থেকে কলকাঠি কারা নেড়েছে? এটা কি শুধুই ক্ষমতার হাতবদল নাকি পরিকল্পিতভাবে জিয়াউর রহমানকে রাজনীতির দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার সাথে বাইরের কোনো শক্তির হাতও ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

জাতীয় জীবনের দু-দুটি সংকট-সন্ধিক্ষণে ভূমিকা পালন করেই জিয়া ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। দেশের পরিস্থিতি ও নিয়তিই তাকে টেনে এনেছিল সেই ভূমিকার। দায়িত্বে এসে তিনি তার সততা, পরিশ্রম ও দেশপ্রেম দিয়ে দেশের মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন; যার ফলে তার দেওয়া বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ এবং তার প্রতিষ্ঠিত দল বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করতে সক্ষম হয়।

বহুদলীয় রাজনীতি চালু করে জিয়া বাংলাদেশের জনগণকে একদলীয় শাসনের জিঞ্জির থেকে মুক্ত করে গণতন্ত্রের পথ সুগম করেছিলেন। দেশকে স্বনির্ভর করার জন্য জিয়ার অর্থনৈতিক কর্মসূচির প্রতি চীনপন্থি দলগুলোসহ ইসলামপন্থিরা যেমন সমর্থন জানিয়েছিল, তেমনি মস্কোপন্থি সিপিবি পর্যন্ত জিয়াউর রহমানের সাথে খালকাটা কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিল। জিয়াউর রহমানের প্রতি সিপিবির এই সমর্থনকে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিপর্যয় হিসেবে অনেক বামতাত্ত্বিক সমালোচনা করেছেন।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে—মুসলিম লীগ, দুই ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি এবং আওয়ামী লীগ থেকে যোগদান করা নেতাদের এক ঘাটে সমবেত করে

www.pathagar.org

জিয়াউর রহমান ঐক্য ও সমন্বয়ের রাজনীতির যে নতুন ধারা সৃষ্টি করেছিলেন, তার ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। জাতীয় আদর্শ ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে জনগণের কোনো ম্যান্ডেট ছাড়াই ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে বাংলাদেশের জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়ে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছিল, গণভোটের মাধ্যমে তা পরিবর্তন করে সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' ও 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' প্রতিস্থাপন করে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন জিয়া। এর মাধ্যমে তিনি এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। জন-আকাঙ্ক্ষা অনুধাবন করতে সক্ষম হওয়া একজন রাষ্ট্রনেতার বড়ো বৈশিষ্ট্য। জিয়া তা করতে পেরেছিলেন।

অনেকের বিশ্লেষণ বা ধারণা ছিল, জিয়ার অবর্তমানে তার দলও রাজনীতিতে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু জনগণের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী বিচারপতি আবদুস সাত্তার দেশের প্রাচীন ও সুসংগঠিত দল আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করলেন। আওয়ামী লীগ মনে করেছিল, তারা সহজেই একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তি বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। এজন্য বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে তারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ আওয়ামী লীগের ৭২-৭৫-এর দুঃশাসনের কারণে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় গ্রামে-গঞ্জে মানুষের মুখে একটি জনপ্রিয় স্লোগান শুনেছিলাম, যা আজও আমার স্মরণ আছে। স্লোগানটি ছিল— 'হাসিনারে হাসিনা, তোর কথায় নাচি না; তোর বাপের কথায় নাইচ্যা, দেশ দিছিলাম বেইচ্যা।'

নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিচারপতি আবদুস সাত্তার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই আবার শুরু হয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। দেশ পরিচালনায় সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ তথা সামরিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে নানা কথাবার্তা শুরু হয়। ট্রাস্ট পত্রিকা *দৈনিক বাংলা*-র প্রথম পাতায় এক বিশাল সাক্ষাৎকারে দেশ পরিচালনায় সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণের কথা বলেন সেনাপ্রধান লে. জে. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তিনি একটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব দেন। এ নিয়ে তিনি রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের সাথেও কথা বলেন। অসুস্থ রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার পরিস্থিতি বোঝার আগেই ষড়যন্ত্র

www.pathagar.org

অনেক ডালপালা বিস্তার করে। এক মন্ত্রীর বাসভবন থেকে একজন পলাতক আসামি গ্রেফতারকে ইস্যুকে করে হইচই বাধানো হয় এবং সরকারের দুর্নীতি নিয়ে জোর প্রচারণা শুরু হয়।

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদ এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সামরিক আইন জারি করেন। বন্দুকের নলের জোরে পেছন দরজা দিয়ে জেনারেল এরশাদের এই ক্ষমতাগ্রহণকে স্বাগত জানান আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। আওয়ামী লীগ সমর্থক *বাংলার বাণী* পত্রিকা অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকীয় লেখে। অনেকে মনে করেন, ভারতের যোগসাজশে এরশাদ-হাসিনা আঁতাতের ফলেই বাংলাদেশের সদ্য নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে উৎখাত করা সম্ভব হয়। এরশাদ বাংলাদেশের উদীয়মান গণতন্ত্রকে তছনছ করে দেন এবং জাতির ওপর স্বৈরশাসন চাপিয়ে দেন। উল্লেখ্য, ভারতে প্রশিক্ষণে থাকা অবস্থায় এরশাদের প্রমোশন হয় এবং প্রশিক্ষণ থেকে দেশে ফেরার পর জিয়াউর রহমান এরশাদকে ডেপুটি চিফ অব আর্মি স্টাফের দায়িত্ব দেন এবং একপর্যায়ে সেনাপ্রধান করেন। সেনাপ্রধান হওয়ার পর এরশাদ পাকিস্তানফেরত ও মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাদের বিভাজনটাকে আরও বেশিভাবে কাজে লাগিয়ে তার নিজের অবস্থানকে সুসংহত করেন। এরশাদ নিজেও পাকিস্তানফেরত সেনা কর্মকর্তা ছিলেন। এরশাদের কর্মকাণ্ডের জন্য মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাগণ জিয়াউর রহমানের ওপর ক্ষিপ্ত হতে থাকেন। যার ফল হয়েছিল চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ও জিয়াউর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ড।

দুজন রাষ্ট্রপতি মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের শিকার

মাত্র অল্প সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি ও জননন্দিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং স্বাধীনতার ঘোষক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ফলে দেশে-বিদেশে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। রাষ্ট্রপরিচালনায় ভুলত্রুটি হতেই পারে এবং এজন্য সমালোচনাও হতে পারে। কিন্তু যে নিষ্ঠুরভাবে এই দুজন রাষ্ট্রনায়ককে হত্যা করা হয়েছিল, এটা তাদের প্রাপ্য ছিল না। অনেকেই মনে করেন, এ দুটি ঘটনার পেছনে অদৃশ্য শক্তির হাত সক্রিয় ছিল। অন্যথায় জীবন বাজি রেখে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তাদেরই একটি অংশ এমন ভয়ংকর কাজটা করতে পারেন না।

www.pathagar.org

রাষ্ট্রনেতাদের এভাবে মৃত্যু কাম্য না হলেও দেখা যায় ক্ষমতার রাজনীতিতে এ ধরনের অনেক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এ যাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চারজন প্রেসিডেন্ট আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। আব্রাহাম লিংকনকে ১৮৬৫ সালের ১৫ এপ্রিল ওয়াশিংটন ডিসিতে গুলি করা হলে পরদিনই তিনি মারা যান। প্রেসিডেন্ট জেমস আব্রাম গারফিল্ডকে ওয়াশিংটন ডিসির রেলরোড স্টেশনে গুলি করা হলে ১৮৮১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান। ১৯০১ সালে ৬ সেপ্টেম্বর এক সংবর্ধনা সভায় গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ম্যাককিনলি ১৪ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৬৩ সালের ২২ নভেম্বর মোটর শোভাযাত্রাকালে প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডিকে গুলি করে হত্যা করে একজন কট্টর মার্ক্সিস্ট সাবেক নৌসেনা।

পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে রাওয়ালপিন্ডির এক জনসভায় গুলি করে হত্যা করা হয়। ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে তার শিখ দেহরক্ষী গুলি করে হত্যা করে। একইভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধীকে এক তামিল বিদ্রোহী বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা করে। ভারতের জাতির পিতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ওরফে মহাত্মা গান্ধীকে উগ্র হিন্দুত্ববাদী নাথুরাম গডসে প্রার্থনাসভায় গুলি করে হত্যা করে। সাম্প্রতিক অতীতে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোকে এক জনসভায় গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

ব্রিটেনের প্রিন্সেস ডায়ানাকে প্যারিসে গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটিয়ে হত্যা করা হয়। ব্রিটেনসহ ইউরোপের দেশগুলোতেও সংঘটিত হয়েছে অনেক হত্যাকাণ্ড। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। এ ঘটনাকেও অনেকে হত্যাকাণ্ড বলেই মনে করেন। সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সালকে রাজপরিবারের এক বিকৃত মস্তিষ্ক যুবক প্রাসাদেই গুলি করে হত্যা করে। মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে সেনাবাহিনীর এক উগ্রপন্থি যুবক গুলি করে হত্যা করে। লেবাননের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরিকে ট্রাকবোমা দিয়ে হত্যা করা হয় ২০০৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি। লেবাননের প্রেসিডেন্ট বশির জামায়েল আততায়ীর হাতে নিহত হন ১৯৮১ সালে। ১৯৯৫ সালের ৪ নভেম্বর ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন এক কট্টরপন্থি ইহুদির হাতে নিহত হন। সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী ওলফ পালমেকে ১৯৮৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজধানী স্টকহোমে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৯৭৩ সালে

www.pathagar.org

সামরিক জান্তা প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ দখল করে চিলির মার্ক্সবাদী প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দেকে হত্যা করে। ২০০১ সালে নেপালের রাজা বীরেন্দ্র ও রানি ঐশ্বরিয়াসহ রাজপরিবারের ৯ জন সদস্য যুবরাজ দেবেন্দ্রের ব্রাশফায়ারে মর্মান্তিকভাবে নিহত হন এবং যুবরাজ নিজেকে নিজে গুলি করে আত্মহত্যা করে। ১৯৯৩ সালে শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট রানাসিংহে প্রেমাদাসা একজন তামিল বিদ্রোহী কর্তৃক নিহত হন।

ক্ষমতার রাজনীতিতে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা আদিকাল থেকেই ঘটে আসছে। তবে রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হওয়ার পরও এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত হত্যাকাণ্ড ঘটেই চলেছে। গণতান্ত্রিক, সামরিক, স্বৈরতান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক সব ধরনের ব্যবস্থাতেই ঘটেছে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড। আমরা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ক্ষমতাদখল প্রসঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে রাষ্ট্রনেতাদের হত্যাকাণ্ডের কথা বলছিলাম। বিশেষ করে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই দুজনকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও রাজনীতি বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।

(শনিবার, রাত ১১:৩৫ টা; ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৩)

www.pathagar.org

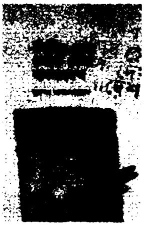

রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার ও কিছু ঘটনা

রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি আবদুস সাত্তার যতটুকু সময় পেয়েছিলেন, সেই সময়ের কিছু ঘটনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, রাষ্ট্রের ও জনগণের স্বার্থে তিনি খুবই দৃঢ়তার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সে সময় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্মচারীরা বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে ধর্মঘট করে। রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার তাদের অন্যায় দাবিদাওয়ার কাছে নতি স্বীকার না করে ব্যাংকিং সেক্টরের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে নৈরাজ্য ও অব্যবস্থাপনা সৃষ্টির দায়ে নয় হাজার কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের ধর্মঘট বন্ধ করতে বাধ্য করেন। তখন সবাই তার এই সাহসী সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন।

১৯৮০ সালে মৌচাকে আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলন উদ্বোধন করার জন্য রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সাথে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি আবদুস সাত্তারও এসেছিলেন। ওই যুব সম্মেলনের প্রধান সংগঠক হিসেবে উদ্বোধনী অধিবেশনে এবং উদ্বোধন শেষে আপ্যায়নের সময় খুব কাছে থেকে তাদেরকে দেখার সুযোগ হয় আমার। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ওআইসির মহাসচিব ড. হাবিব শাতিও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পাকিস্তানের সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী প্রফেসর খুরশিদ আহমাদ, মালয়েশিয়ার যুবনেতা আনোয়ার ইবরাহিম অতিথি ছিলেন। মিশরের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাহদি মুহাম্মাদ আকিফ (পরবর্তীকালে মুসলিম ব্রাদারহুডের মুরশিদে আম ও মিশর পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন) এবং সৌদি রাজপরিবারের সদস্য ও বিশ্ব মুসলিম যুবসংস্থার মহাসচিব ড. আহমদ বাহাফজাল্লাহসহ আরও অনেকেই এই অনুষ্ঠানে ছিলেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনের পর চা পানের সময় আমি সম্মেলনের অন্যান্য আয়োজকদের সাথে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কাছাকাছিই ছিলাম। লক্ষ করলাম, বিচারপতি আবদুস সাত্তার শান্ত ও নীরবভাবে রাষ্ট্রপতি জিয়ার পাশেই

www.pathagar.org

ছিলেন। রাষ্ট্রপতি জিয়াই কথা বলছিলেন এবং তার পাশে নীরব দাঁড়িয়ে ছিলেন বিচারপতি আবদুস সাত্তার। উদ্বোধনী অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি জিয়া ভাষণ দিয়েছেন। উপরাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি কোনো বক্তব্য দিতে রাজি হননি। তিনি ছিলেন প্রচারবিমুখ।

বিচারপতি আবদুস সাত্তারের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে আইনজীবী ও লেখক গাজী শামসুর রহমান একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। উপ-রাষ্ট্রপতি থাকাকালে বিচারপতি আবদুস সাত্তারের সাথে তিনি একটি কমিশনের সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। কয়েক দিন কাজ করে গাজী শামসুর রহমান খুব হাঁপিয়ে ওঠেন এবং বিচারপতি সাত্তারের ওপর মনে মনে রুষ্ট হয়ে ওঠেন। কারণ, কাজ করার সময় কোনো ধরনের আপ্যায়ন বা চা-বিস্কুটের কোনো ব্যবস্থাও ছিল না বা উপরাষ্ট্রপতি এক কাপ চা দিয়েও তাকে আপ্যায়ন করেননি। এভাবে এক সপ্তাহ কাজের পর বিচারপতি আবদুস সাত্তার লাল চা ও দুটো বিস্কুটের ব্যবস্থা করে বললেন—'এখন থেকে তুমি সরকারি খরচে চা-বিস্কুট খেতে পারবে। তোমার কাজ ও নিষ্ঠার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, সরকারি খরচে তুমি এক কাপ করে চা খেতে পারো।' গাজী শামসুর রহমান বলেন—'উপ-রাষ্ট্রপতির এই দৃষ্টিভঙ্গি জানার পর শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে গেল এবং আমার মধ্যে যে ক্ষোভ ছিল, তা পানি হয়ে গেল। আমি একজন মহৎ মানুষের সান্নিধ্যে আসতে পারায় নিজেকে ধন্য মনে করলাম। রাষ্ট্রের অর্থ খরচের ব্যাপারে এমন সূক্ষ্ম ও দায়িত্বশীল মানসিকতা সত্যিই অসাধারণ। আমাদের দায়িত্বশীল রাজনীতিকগণ যদি সবাই এমন হতেন, তাহলে কতই-না ভালো হতো! সেই থেকে এই লোকটিকে আমি দারুণ শ্রদ্ধা-ভক্তি করি।'

আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হয়। বাংলাদেশের সব জাঁদরেল সাংবাদিক নেতা জাতীয় প্রেসক্লাবে এক অনুষ্ঠানে বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে কাছে পেয়ে কিছু দাবিদাওয়া পেশ করেন। তাদের একটি দাবি ছিল, ইতঃপূর্বে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান মিরপুর পল্লবীর নিকট সাংবাদিকদের কিছু প্লটের জন্য জমি বরাদ্দ করে গেছেন। বাকি সাংবাদিকদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য বিনামূল্যে জমি বরাদ্দ করতে বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নিকট জোর আবেদন জানান। সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের ধারণা ছিল, রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার হয়তো-বা সাংবাদিক নেতাদের দাবি উপেক্ষা করবেন না। অনেক নেতা নাকি রাষ্ট্রপতির মন গলানোর জন্য তার পায়ের কাছে বসে কথা

www.pathagar.org

বলছিলেন। এমন একটি পরিবেশে তিনি সব কথা শোনার পর বললেন, 'আপনাদের দাবি মেনে নিলে দেশের সকল নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে জমির ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে। সেটা কি সম্ভব? আপনাদের দিলে অন্যদের বঞ্চিত করব কোন যুক্তিতে?' এরপর সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ বিষয়টি নিয়ে আর অগ্রসর হতে পারেননি; বরং বিচারপতি আবদুস সাত্তার একজন ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রনায়কের মতোই কথা বলেছেন। এতে তার প্রতি সবার শ্রদ্ধাই বেড়েছে।

ঘটনাটি শুনেছি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কাছে। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ যেদিন ক্ষমতা দখল করেন (২৪ মার্চ, ১৯৮২), সেদিন তখনকার বিমানবাহিনী-প্রধান মাহবুব আলী খান নাকি অসুস্থ প্রবীণ রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে এরশাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করতে তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন এবং খুবই আপত্তিকর ও অপমানজনক আচরণ করেছেন। মাহবুব আলী খান এক বিমান দুর্ঘটনায় আকস্মিকভাবে নিহত হওয়ার পর কথাটা শুনেছিলাম। যাহোক, সামগ্রিক বিবেচনায় বিচারপতি আবদুস সাত্তার একজন নির্মোহ ও সৎ মানুষ ছিলেন, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। কিন্তু এই লোকদের কথা কেউ বলে না বা আমাদের নতুন প্রজন্মকে তাদের সম্পর্কে জানানোর তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই।

(রবিবার, রাত ১০.০০ টা; ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩)

www.pathagar.org

জেনারেল থেকে রাষ্ট্রপতি এরশাদ

নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেনাপ্রধান লে. জে. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ ক্ষমতা দখল করেন। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে তদানীন্তন বিএনপি সরকারের পতন ঘটিয়ে তিনি ক্ষমতা দখল করেছিলেন। প্রথমে তিনি বিচারপতি এএফএম আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি করেন। এই ভদ্রলোক ছিলেন এক মেরুদণ্ডহীন তথা ব্যক্তিত্বহীন লোক। ক্ষমতা দখলের অজুহাত হিসেবে দুর্নীতির কথাই এরশাদ জোরেশোরে বলেছিলেন। প্রতিবেশী দেশের আশীর্বাদ ছাড়াও আওয়ামী লীগের সমর্থন পাওয়ায় এরশাদের পক্ষে তার অবৈধ শাসন দীর্ঘায়িত করা সম্ভব হয়।

জাতীয় পার্টি নামে এরশাদ একটি দল গঠন করেন। অনেক আওয়ামী লীগ নেতা এরশাদের দলে যোগদান করেন। বিএনপির কিছু নেতা এবং বামপন্থিদেরও একটি অংশ এরশাদের দলে যোগদান করেন। তাদের মধ্যে মিজানুর রহমান চৌধুরী, কোরবান আলী, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, রিয়াজউদ্দিন ভোলা মিয়া, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, কাজী ফিরোজ রশিদ, আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, শেখ শহীদুল ইসলাম, কাজী জাফর আহমদ, আনোয়ার জাহিদ, সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী, নাসের খান ভাসানী, মোর্শেদ খান প্রমুখের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। মজার ব্যাপার হলো—প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও আজীবন গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি আতাউর রহমান খানও এরশাদের অধীনে দুই বছর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। এর ওপর তিনি একটি বইও লিখে গিয়েছেন। বইটি অবশ্য আমার পড়া হয়নি বলে মনে হয়। ব্যক্তিগত ব্যবহারের মাধ্যমে এরশাদ অনেককে কাছে টেনেছিলেন—এ কথা তার অনেক সহকর্মীর নিকট থেকে শুনেছি। ব্যক্তিগত ব্যবহারে তিনি খুবই চৌকশ ও বিনয়ী। তাই কোমল, অতি বিনয়ী ও সৌহার্দপূর্ণ আচরণের কারণে অনেকেই তার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি—কেউ কেউ আমাকে

www.pathagar.org

এ কথাও বলেছেন। তবে ১৯৯৪-৯৫ সালে চারদলীয় জোট গঠন করার সময় জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটির সদস্য হিসেবে যখন এরশাদ সাহেবের সাথে যোগাযোগ, দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা শুরু করি, তখন এ কথার প্রমাণ পেয়েছি যে, ব্যক্তিগত ব্যবহারের যেসব গুণের কথা শুনেছিলাম, তা সত্যিই বাস্তব।

জনমত যেহেতু এরশাদের পক্ষে খুব একটা ছিল না এবং বিএনপির সাংগঠনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তিনি ক্ষমতা দখল করেছিলেন, তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা হয়। এরশাদ বিভিন্ন দল থেকে সুবিধাবাদীদের তার নিজের দলে টানার জন্য নিজে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করতেন এবং এজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নানা সুযোগ-সুবিধা দিতে কোনো কার্পণ্য করতেন না। তিনি অনেক ধর্মীয় নেতা, আলেম, পীর-মাশায়েখদের তার দলে টানেন এবং তাদের অনেকের সমর্থনও তিনি লাভ করেন। আটরশির পীরদের তিনি খুব সফলভাবে ব্যবহার করেন। তার দেখাদেখি অনেক সেনা কর্মকর্তা আটরশিতে যাতায়াত করতেন।

জামায়াতের সমর্থন লাভের চেষ্টা এরশাদের

এরশাদ জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং জামায়াতকে দেন অনেক লোভনীয় প্রস্তাব। প্রধান প্রধান কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়ে মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য অনুরোধ জানান তিনি। কিন্তু নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত করে অবৈধভাবে ক্ষমতায় আসায় নীতিগত প্রশ্নে জামায়াত এরশাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু এরপরও এরশাদ বিভিন্নভাবে জামায়াতকে কাছে টানার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এ সময়ের একদিনের ঘটনা আমার স্মরণ অছে। আল ফালাহ্ ভবনের তৃতীয় তলায় জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বৈঠক চলছিল। হঠাৎ জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে কর্ডলেস টেলিফোন সেট নিয়ে এসে জামায়াতের অফিসের একজন কর্মকর্তা বললেন—'প্রেসিডেন্ট এরশাদ সাহেব লাইনে আছেন, খান সাহেবের সাথে কথা বলতে চান।' এই বলে ফোনসেটটি আমাকে দিলে আমি সালাম দিয়ে নিশ্চিত হয়ে আব্বাস আলী খান সাহেবকে সেটটা দিলাম। খান সাহেব বৈঠক থেকে উঠে গিয়ে কথা বললেন। আমি পাশে দাঁড়িয়েছিলাম।

www.pathagar.org

সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর এরশাদ সাহেব অনুরোধ করলেন—'আগামীকাল আমি আপনার জেলা জয়পুরহাটে যেতে চাচ্ছি। দয়া করে আপনিও আমার সাথে চলুন।' খান সাহেব হেসে বললেন—'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি গিয়ে ঘুরে আসুন। আমি পরে যাব।' এরপরও এরশাদ সাহেব অনুরোধ করলেন এবং খান সাহেব আবারও তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে একই কথা বললেন এবং ধন্যবাদ দিয়ে কথা শেষ করলেন। এরপর তিনি বৈঠকে উপস্থিত কর্মপরিষদ সদস্যদের ফোনের কথাবার্তা সম্পর্কে অবহিত করলেন। এরশাদকে ধন্যবাদ জানিয়ে খান সাহেব যে তার সাথে জয়পুরহাট যাওয়ার ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছেন, এজন্য পরিষদের সদস্যগণ খান সাহেবকে ধন্যবাদ জানান।

(সোমবার, রাত ১২:৩০ টা; ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৩)

www.pathagar.org

শাসনতান্ত্রিক বিতর্ক ও এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সূচনা

এরশাদ ক্ষমতা দখলের কিছুদিন পরই একটি শাসনতান্ত্রিক বিতর্কের সূচনা হয়। আওয়ামী লীগ ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনরুজ্জীবনের দাবি উত্থাপন করে। বিএনপি পঞ্চম সংশোধনী-পরবর্তী সংবিধান দাবি করে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বক্তব্য নিয়ে হাজির হয়। জামায়াতের বক্তব্য ছিল, কোনো সামরিক শাসকের হাতে সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তনের ক্ষমতা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই কেবল সংবিধানের সংশোধনী বা পরিবর্তন আনতে পারেন। এজন্য একটি তত্ত্বাবধায়ক বা কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন দিতে হবে এবং নির্বাচিত সংসদই সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনী বা পরিবর্তন আনবে। জামায়াতের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম থেকে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে তা লিফলেট আকারে ছেপে প্রচার করা হয়। সামরিক শাসন বহাল থাকা অবস্থায় ওই প্রচারপত্র অবলম্বনে *দৈনিক ইত্তেফাক* প্রথম পাতায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করলে তা রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে সেই প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, যারা কেয়ারটেকার সরকার হিসেবে নির্বাচন পরিচালনা করবেন, তারা সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না বা কারও পক্ষে নির্বাচনে সমর্থন দিতে বা প্রচারণা চালাতে পারবেন না। জেনারেল এরশাদ চাইলে কেয়ারটেকার সরকার হিসেবে নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি নির্বাচন করতে পারবেন না বা কাউকে সমর্থনও করতে পারবেন না।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) সর্বপ্রথম জামায়াতে ইসলামীর প্রস্তাবিত কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে

www.pathagar.org

বিবৃতি প্রদান করে। জামায়াতের প্রস্তাবের পর এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সামরিক শাসক এরশাদের হাতে সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা তুলে দিয়ে তার নিকট সংবিধান পুনরুজ্জীবনের (১৯৭২ বা পঁচাত্তর-পরবর্তী) দাবির কোনো যৌক্তিকতা নেই। ফলে রাজনৈতিক দলগুলো এই দাবি থেকে সরে আসে। আওয়ামী লীগ জামায়াতের দেওয়া পরিভাষা কেয়ারটেকার সরকার ব্যবহার না করে কিছুটা পরিবর্তন করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি উত্থাপন করে। বিএনপিও অনুরূপ দাবি তোলে। ইতোমধ্যে দেশে একটি রাজনৈতিক পোলারাইজেশন বা মেরুকরণ হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট এবং বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট গঠিত হয়। জামায়াত এই দুই জোটের বাইরে থেকে উভয় জোটের সাথে লিয়াজোঁ করে বিভিন্ন কর্মসূচি দিয়ে যুগপৎ আন্দোলনের সূচনা করে। এটাকে ১৫ দল, ৭ দল ও জামায়াতে ইসলামীর যুগপৎ আন্দোলন হিসেবে মিডিয়ায় প্রচার করা হয়।

জামায়াতের পক্ষ থেকে ব্যাপক রাজনৈতিক যোগাযোগ

এরশাদ কর্তৃক সামরিক আইন জারির পর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকলেও জামায়াতের পক্ষ থেকে জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটির সদস্য হিসেবে আমরা কয়েকজন ব্যাপক রাজনৈতিক যোগাযোগ শুরু করি। সকল দলের সাথেই আমরা যোগাযোগ করি। এই যোগাযোগ করতে গিয়ে আমাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করতে ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়িতে আমরা গিয়েছিলাম জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে নিয়ে। সেদিনকার বৈঠকে জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান, নায়েবে আমীর মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ এবং আমি ছিলাম (তখন আমি কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক)। শেখ হাসিনার সাথে ছিলেন সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী ও তোফায়েল আহমদ। সেদিন শেখ হাসিনা মিষ্টান্নসহ চা দিয়ে জামায়াত নেতাদের আপ্যায়ন করেন। আন্তরিক পরিবেশে আলোচনা হয়। প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী আলোচনায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের

www.pathagar.org

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে মতবিনিময় হয়। একপর্যায়ে তিনি বলেন—'আপনাদের মাওলানা আবদুল মান্নান তো এরশাদের দলে যোগদান করেছেন।' আমরা তার ভুল ভাঙিয়ে দিয়ে বলি—'মাওলানা মান্নান সাহেব কোনো দিন আমাদের দল করেননি। তিনি কনভেনশন মুসলিম লীগ করতেন।' তিনি বললেন—'আমি তো মনে করতাম তিনি জামায়াত করেন।'

জামায়াতের রাজনৈতিক লিয়াজোঁ কমিটির প্রধান ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী। আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী, শাহ মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, আবদুল কাদের মোল্লা ও আমি সদস্য ছিলাম। নিজামী সাহেব কেবল উচ্চপর্যায়ের কোনো বৈঠক হলেই তাতে যোগ দিতেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুজাহিদ ভাই ও আমিই যোগাযোগ করতাম এবং আবদুল কাদের মোল্লাও অনেক সময় থাকতেন।

বেগম সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর ধানমন্ডির বাসভবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। সে বৈঠকে মাওলানা ইউসুফ ছিলেন। আলী আহসান মুজাহিদ ভাই ও আমি ছিলাম তার সাথে।

এরপর মুজাহিদ ভাই ও আমি পর্যায়ক্রমে আওয়ামী লীগ নেতা আবদুস সামাদ আযাদ, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, মেজর জেনারেল (অব.) খলিলুর রহমান, আমির হোসেন আমু, মহিউদ্দিন আহমদ, ড. কামাল হোসেন, মুহাম্মদ নাসিম, আবদুল মান্নান, মিজানুর রহমান চৌধুরী ও মুহাম্মদ হানিফের সাথে যোগাযোগ করি। এসব যোগাযোগ নিয়মিতভাবে চলতে থাকে। বেশি যোগাযোগ হয় তোফায়েল আহমদ, আমির হোসেন আমু, আব্দুল মান্নান, আবদুস সামাদ আযাদ, মেজর জেনারেল (অব.) খলিলুর রহমান ও ড. কামাল হোসেনের সাথে। তোফায়েল আহমদ ও খলিলুর রহমান থাকতেন ধানমন্ডিতে আর আবদুস সামাদ আযাদ কলাবাগানে। ড. কামাল হোসেনের ইস্কাটনের বাসায় ও মতিঝিলে তার চেম্বারে মুজাহিদ ভাই ও আমি অসংখ্যবার গিয়েছি।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট ও বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট গঠন হলে এ যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি পায়। বিএনপির সাথে আমাদের সবচেয়ে বেশি যোগাযোগ হয়েছে। বেগম জিয়ার ক্যান্টনমেন্টের বাসায় নিয়মিত যেতাম মুজাহিদ ভাই ও আমি। দীর্ঘ সময় তার সাথে আমাদের আলাপ-আলোচনা হতো। এদিকে ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা রাশেদ খান মেননের সাথে তার

www.pathagar.org

আজিমপুরের বাসায় আমরা আলাপ-আলোচনা করি। একদিন গিয়ে দেখলাম, একজন মাওলানা মেনন সাহেবের মেয়েকে আরবি পড়াচ্ছেন। এখনও সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে উচ্চকণ্ঠ বামপন্থি নেতার বাড়িতে তার মেয়েকে আরবি চর্চা করতে দেখে কিছুটা বিস্মিত হলাম বইকি।

আবদুল মান্নান সাহেব থাকতেন এলিফ্যান্ট রোডের উড়োজাহাজ মসজিদের গলিতে এক বাসায়। মুজাহিদ ভাই ও আমি অনেকবার সে বাসায় তার সাথে আলাপ করতে গিয়েছি। একদিন দুপুরের খানাও খেতে হয়েছে তার অনুরোধে। সেদিন মান্নান সাহেবের বাসায় তরকারিটা বেশ সুস্বাদু হয়েছিল। খুব মজা করেই খেয়েছিলাম।

বিএনপির নেতাদের মধ্যে বেশি যোগাযোগ ছিল কেএম ওবায়দুর রহমান, কর্নেল মুস্তাফিজুর রহমান, ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত, আবদুস সালাম তালুকদার, মেজর জেনারেল মাজেদুল হক, শামসুল ইসলাম, ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া ও মতিন চৌধুরীর সাথে।

আবদুস সালাম তালুকদারের মতিঝিলের চেম্বারে পরিচয় হয় আবদুল মান্নান ভূঁইয়া ও আফসার সিদ্দিকীর সাথে। সে সময় যখন ১৫ দল, ৭ দল ও জামায়াতে ইসলামীর যুগপৎ আন্দোলন শুরু হয়, তখন খুব বেশি সক্রিয় ছিলেন মতিন চৌধুরী, মেজর জেনারেল মাজেদুল হক, ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া প্রমুখ। মতিন চৌধুরীর দিলকুশা অফিস ও সিদ্ধেশ্বরীর বাসভবনে অনেক বৈঠক হয়েছে ৭ দলের সাথে। ডিওএইচএসে মাজেদুল হক সাহেবের বাসভবনে আমরা অনেকবার গিয়েছি। তার স্ত্রীর আপ্যায়নের কথা ভুলবার নয়। ডিওএইচএসে আবদুস সালাম তালুকদারের বাসভবনেও অনেক বৈঠক হয়েছে। তার বাসায় তৈরি অনেক মজাদার নাশতা আমরা খেয়েছি।

আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দীন সাহেবের বাড়িতে বিড়াল দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। এত বিড়াল! এক ডজনেরও বেশি বিড়াল পালতেন তিনি। তখন তিনি বাকশালের সভাপতি ছিলেন। এরশাদের কতিপয় মন্ত্রীর সাথেও আমাদের যোগাযোগ ছিল। তাদের মধ্যে আনোয়ার জাহিদ ও সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রেসক্লাব, বিএফইউজে ও ডিইউজেএ নির্বাচনের সুবাদে আমার ও আবদুল কাদের মোল্লার সাথে আনোয়ার জাহিদের খুব সখ্য ছিল। *দৈনিক বাংলা*-র

www.pathagar.org

সম্পাদক ও *বাংলাদেশ টাইমস*-এর সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে আহমেদ হুমায়ুন ও আনোয়ার জাহিদ। তাদের সাথে সাংবাদিক ইউনিয়নের ব্যাপারে অনেক বৈঠক করেছি আমরা দৈনিক বাংলা ভবনে। তখন সাংবাদিক ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধ ছিল। আমরা ছিলাম আওয়ামীবিরোধী ফোরামে। এই ফোরামের সিনিয়র ব্যক্তি হিসেবে আহমেদ হুমায়ুন, গিয়াস কামাল চৌধুরী, রিয়াজউদ্দিন আহমদ, আনোয়ার জাহিদ, আমানুল্লাহ কবির প্রমুখের সাথে আমি ও আবদুল কাদের মোল্লা অনেক বৈঠক করেছি। সাংবাদিক আন্দোলনের কর্মসূচি ও নির্বাচন নিয়ে অনেক সলাপরামর্শ করেছি।

এরশাদবিরোধী আন্দোলনের প্রথমদিকে মিডিয়া জামায়াতের নিউজ খুব একটা গুরুত্ব দিত না। কিন্তু সাংবাদিকরা অবহিত ছিলেন যে, জামায়াতই সংবিধান প্রশ্নে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেছে এবং সর্বাগ্রে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি তুলেছে। জামায়াতের যুক্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক বক্তব্য এবং প্রতিটি কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে বিভিন্ন মহলে জামায়াতের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৫ দল ও ৭ দলের পাশাপাশি জামায়াতেরও বিশাল সমাবেশ শেষ পর্যন্ত মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয় এবং এ কারণেই জামায়াতকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এরপরও মিডিয়া জামায়াতকে কখনও প্রাপ্য কভারেজ দেয়নি। তবে এটা ঠিক যে, এরশাদবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে জামায়াত বাংলাদেশের তৃতীয় প্রধান রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়।

(শুক্রবার, রাত ১২:০০ টা; ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৩)

www.pathagar.org

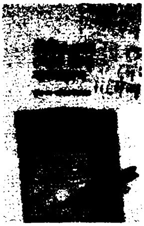

১৯৮৬ সালের নির্বাচন :
দশ হুন্ডা, বিশ গুন্ডা, নির্বাচন ঠান্ডা

৩ সেপ্টেম্বর অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পর আমার লেখার গতিটা থেমে গিয়েছে বলা যায়। কারাগারে মানুষ এত অসহায়, যা অন্যদের বোঝানো সম্ভব নয়। কষ্ট বুকে নিয়ে ইচ্ছাশক্তির ওপর ভর করে লিখে যাওয়ার চেষ্টা করছি। সংকল্প করেছিলাম, কারাগারে প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাব বলে। কিন্তু যখন হাতের কাছে কোনো বই পাওয়া যায় না, লেখার জন্য কাগজ-কলম পাওয়া যায় না, তখন কী করে সময়কে কাজে লাগাব! তখন অসহায়ত্ব নিয়ে কষ্ট চেপে অলস সময় কাটানো ছাড়া উপায় থাকে না। তাই ইচ্ছা থাকার পরও মূল্যবান সময়কে আমি কাজে লাগাতে পারিনি। এই আক্ষেপ থেকেই যাবে। এরপরও চেষ্টা করে যাচ্ছি যতটুকু সম্ভব সময়টাকে কাজে লাগাতে।

এরশাদ সাহেব প্রথমে ঘরোয়া রাজনীতি, সংলাপ ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশ কিছুটা শিথিল করেন। রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনের চাপের মুখে তিনি ১৯৮৬ সালে নির্বাচন ঘোষণা করেন। সব দলই তার অধীনে নির্বাচনে যেতে অস্বীকার করে। চট্টগ্রামে এক জনসভায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ঘোষণা করেন—'এরশাদের অধীনে কেউ নির্বাচনে গেলে তাকে জাতীয় বেঈমান হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে।' জাতির দুর্ভাগ্য যে, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী পরদিন ঢাকায় এসে এরশাদের সাথে তার যোগাযোগ হওয়ার পর নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দেন। দেশের মানুষ হতবাক হয়ে যায় আওয়ামী লীগ নেত্রীর এই ডিগবাজিতে।

বিএনপির সাথে জামায়াতের কথা হয়েছিল, বিএনপি নির্বাচনে গেলে জামায়াতও নির্বাচনে যাবে। রাত ১১ টা পর্যন্ত বিএনপি নেত্রী দলের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন। বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যেও অঙ্গীকার ছিল, তারা এরশাদের অধীনে নির্বাচনে যাবে না। তবে বিএনপিকে বাদ দিয়েই

www.pathagar.org

আওয়ামী লীগ নির্বাচনে চলে যায় এবং এরশাদকে বৈধতা দেয়। রাত সাড়ে এগারোটায় আমি আবার বিএনপি কার্যালয়ে টেলিফোন করলাম। আমাকে জানানো হলো, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আপনারা *দৈনিক সংগ্রাম*-এ জায়গা খালি রাখুন, আমাদের প্রেস বিজ্ঞপ্তি যাচ্ছে। আমি তখন *সংগ্রাম*-এর নির্বাহী সম্পাদক। কথামতো আমরা প্রথম পাতার জায়গা খালি রেখে পত্রিকার মেকআপ করলাম এবং জামায়াতের নির্বাচনে অংশগ্রহণের খবরও ছাপার ব্যবস্থা করলাম। অনেক পরে যখন বিএনপির প্রেস বিজ্ঞপ্তি এলো, তখন দেখা গেল—কিছু শর্তাধীন নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে বিএনপির পক্ষ থেকে। সেই খবরসহই পত্রিকা ছাপা হয়ে গেল।

পরদিন বিএনপি পরিষ্কার জানিয়ে দিলো, ওসব শর্ত পূরণ না হলে তারা নির্বাচনে যাবে না। জামায়াত যেহেতু সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছে, তাই জামায়াত আর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল না। এই অবস্থার মধ্যে ১৯৮৬ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। নির্বাচনে এরশাদ প্রশাসনকে ব্যবহার করে ব্যাপক কারচুপি করল এবং অনেক ফলাফল পালটিয়ে দেওয়া হলো। এ সময় দুই-তিন দিনের জন্য বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া এক অজ্ঞাত স্থানে অবস্থান করায় একটা রহস্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও জামায়াত অংশগ্রহণ করায় কারচুপির নির্বাচন কিছুটা হলেও গ্রহণযোগ্যতা পেল। কার্যত এরশাদকে বৈধতা দেওয়ার জন্যই আওয়ামী লীগ বিএনপির সাথে তথা জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এরশাদের সাথে যোগসাজশ করেই নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিএনপিকে একঘরে করার চেষ্টা করে। জামায়াত এসব ষড়যন্ত্রের রাজনীতির সাথে যেহেতু পরিচিত নয়, তাই নির্বাচনে অংশ নিয়ে জামায়াত অনেকটা বেকায়দায় পড়ে যায়। অনেক আসনে জামায়াতের প্রার্থী বিজয়ী হওয়ার পরও ফলাফল পালটিয়ে সেখানে এরশাদের জাতীয় পার্টির প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। পাবনা, ঝিনাইদহ, রাঙামাটিতে জামায়াতের প্রার্থী বিজয়ী ঘোষণা হওয়ার পর ফলাফল পালটিয়ে দেওয়া হয়। জামায়াতের ৭২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০ জন প্রার্থীকে নির্বাচনে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

তখন একটা স্লোগান চালু হয়েছিল—দশটা হোন্ডা, বিশটা গুন্ডা, নির্বাচন ঠান্ডা। ভোট জালিয়াতি ও কারচুপির এই নির্বাচনের ফলে এবং সিদ্ধান্তের ওপর অবিচল থাকায় বিএনপি নেত্রীর জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। তাকে আপসহীন নেত্রী বলে আখ্যায়িত করা হয়। বিএনপিকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল এবং

www.pathagar.org

বিএনপিকে নির্বাচনের বাইরে রাখা ও আওয়ামী লীগ নেত্রী কর্তৃক এরশাদের অধীনে কেউ নির্বাচন করলে 'জাতীয় বেঈমান' হবে—এমন ঘোষণার পর আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ফলে জনমনে আওয়ামী লীগ সম্পর্কে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। আবার দেশের রাজনীতি উত্তপ্ত হতে থাকে এবং ভোট কারচুপির ফলে এরশাদকে ভোটডাকাত ও আওয়ামী লীগকে তার সহযোগী হিসেবে দেশের মানুষ চিহ্নিত করে।

এ সময় ১৫ দল ভেঙে বামপন্থিরা ৫ দলীয় জোট গঠন করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত হয় ৮ দলীয় জোট। অবশ্য ১৫ দলে আগেও ১৫ দল ছিল কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। ওদিকে বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দল সক্রিয় ছিল। জামায়াত কোনো জোটে যায়নি। ফলে দুই জোটের জায়গায় তিন জোট ও জামায়াতে ইসলামী আবার এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। বামপন্থিদের ৫ দলীয় জোট নামেই একটা জোট। তবে মিডিয়ার বদৌলতে তারা সংবাদপত্রে স্থান করে নেয়। মূলত বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামীই আন্দোলনের মাঠে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

জামায়াতের দশ সংসদ সদস্যের পদত্যাগ

জামায়াতে ইসলামী এরশাদের স্বৈরশাসনের পতন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে দল হিসেবে সর্বশক্তি নিয়োজিত করে। একপর্যায়ে আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য জামায়াতে ইসলামী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করার। প্রথমে জামায়াতের দশজন সংসদ সদস্যের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন জামায়াতের তদানীন্তন আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম। আল ফালাহ ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব পদত্যাগপত্র গ্রহণ করার পর তা সংসদের স্পিকারের নিকট পাঠানো হয়। তারিখ ছিল ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বর।

জামায়াতের সংসদ সদস্যদের পদত্যাগের খবর মিডিয়ায় ব্যাপক কভারেজ পায় এবং দেশের রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিবিসির সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার খবরের পর রাত সাড়ে দশটার খবরে জানা যায়, আওয়ামী লীগও

www.pathagar.org

সংসদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা প্রদান করে। আওয়ামী লীগ এ ঘোষণা দিলেও পরে জানা যায়, আসলে তাদের পদত্যাগপত্র স্পিকারের কাছে পৌঁছায়নি। যেহেতু জামায়াত সদস্যগণ পদত্যাগ করায় জনগণের দৃষ্টিতে জামায়াত দল হিসেবে আন্দোলনের সামনের সারিতে চলে আসে এবং এটা টক অব দ্য কান্ট্রিতে পরিণত হয়, তাই রাজনৈতিক স্ট্যান্ড হিসেবে আওয়ামী লীগও পদত্যাগের ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়। তিন দিন পর্যন্ত বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকাসহ বিশ্বমিডিয়ায় জামায়াত সদস্যদের জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগের খবরটি প্রধান শিরোনাম ছিল। তবে আওয়ামী লীগ পদত্যাগ না করেই ঘোষণা দেওয়ায় কাজ হয়। এরশাদ জাতীয় সংসদ ভেঙে দিতে বাধ্য হন। এরপর আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে।

এরশাদ আবার ১৯৮৮ সালে সংসদ নির্বাচন দেন। তখন দেশের সকল দল নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। কোনো দলই নির্বাচনে অংশ না নেওয়ায় এরশাদ সেনাবাহিনী ও পুলিশ দিয়ে ভোটারবিহীন নির্বাচন করেন। আগেরবার নির্বাচনে গিয়ে নিন্দিত হওয়ার কারণে এবং এরশাদবিরোধী জনমতের হাওয়া দেখে অভিজ্ঞ আওয়ামী লীগ নেতারা এ আন্দোলনে বিএনপির পাশাপাশি জোরদার ভূমিকা পালন করেন। উল্লেখ্য যে, এরশাদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের নামেও আরেকটি প্রহসন করেন। অর্থকড়ি দিয়ে অনেক লোককে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করা হয়। প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হলে তার সঙ্গীসাথিদের নিয়ে ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসে ও বিমানে বিনা ভাড়ায় সফর করার সুযোগ, নিরাপত্তার জন্য পুলিশ প্রটেকশন, ভিআইপির মর্যাদা ও নির্বাচনী প্রচারণার জন্য একটি গাড়ি ও আর্থিক প্রণোদনা দেওয়ায় অনেক প্রার্থী জুটে যায়।

হাফেজ্জী হুজুরের রাজনীতিতে যোগদান

কোনো দিন রাজনীতি করেননি এবং রাজনীতি যারা করতেন, তাদের কঠোর সমালোচনা করতেন প্রভাবশালী আলেম মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর। সেই নির্বাচনে তিনি প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হয়ে যান। অবশ্য তিনি এর আগেই বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন নামক একটি দল গঠন করেছিলেন। দেশের হাজার হাজার কওমি মাদরাসায় ছাত্র-শিক্ষক তার দলে যোগদান করেন।

www.pathagar.org

অবশ্য তার দল গঠনের একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপট ছিল। কিছুসংখ্যক অতি উৎসাহী লোক ইরানি দূতাবাসের সহযোগিতায় বাংলাদেশে একটি ইসলামী বিপ্লব ঘটানোর স্বপ্ন নিয়ে হাফেজ্জী হুজুরকে সামনে রেখে ওই দলটি গঠন করেছিলেন। সেই দল গঠন করার পর তিনি এক বক্তব্যে বলেন—'৪০ বছর পর্যন্ত রাজনীতি না করে ভুল করেছি। এ কারণে তওবার জন্য রাজনীতি করছি। আমার রাজনীতি তওবার রাজনীতি।'

হাফেজ্জী হুজুরের এই ঘোষণা ছিল প্রকারান্তরে জামায়াতে ইসলামীর জন্য এক বিরাট আদর্শিক বিজয়। যে আলেমসমাজ মাওলানা মওদূদী ও জামায়াত রাজনীতি করে বলে অভিযোগ করতেন এবং নিজেরাও রাজনীতি থেকে দূরে থাকতেন, তারাও এখন রাজনীতির ময়দানে চলে এলেন। জামায়াত দীর্ঘদিন যাবৎ এটাই বোঝানোর চেষ্টা করে আসছিল যে, আমাদের মহানবি সা. এবং খুলাফায়ে রাশিদাসহ সাহাবায়ে কেরাম রাজনীতি করেছেন। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে এতে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সবই আছে। দেশের সৎ ও যোগ্য লোকদের সমবেত করে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করতে হবে। এর নামই হচ্ছে ইসলামী আন্দোলন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এই আন্দোলন করা মুসলমানদের জন্য ফরজ বা অবশ্যকর্তব্য।

হাফেজ্জী হুজুরের তওবার রাজনীতির ঘোষণার ফলে তার ব্যাপক প্রভাব পড়ে সমাজে। বিশেষ করে আলেমসমাজ যারা রাজনীতি থেকে দূরে থাকতেন, তারাও রাজনীতির অঙ্গনে সক্রিয় হন। ওদিকে চরমোনাইয়ের পীর মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করিমও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন নামে রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এতে পুরোনো ইসলামী রাজনৈতিক দল জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টিও সক্রিয় হয়। জামায়াতে ইসলামী এতদিন একমাত্র দল হিসেবে ময়দানে থাকায় ইসলামবিরোধী শক্তির সমস্ত হামলা ও চাপ পড়ত জামায়াতের ওপর। ময়দানে হাফেজ্জী হুজুর রাজনীতির ঘোষণা দেওয়ায় ইসলামী দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে ইসলামী রাজনীতির জন্য পথ আরও উন্মুক্ত হয়। হাফেজ্জী হুজুর ও অন্যান্য ইসলামী দল সম্পর্কে পরবর্তী কোনো অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব। এখানে প্রসঙ্গটা এসেছে এরশাদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে যে তামাশাটা করেছিলেন, সে সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্য।

www.pathagar.org

এই নির্বাচনে ফ্রিডম পার্টির নেতা কর্নেল ফারুকও প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হন। আরও যারা প্রার্থী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সিরাজুল হক, নোয়াখালীর এক ভদ্রলোক খলিলুর রহমান, মাওলানা আবুল খায়ের যশোরী, চট্টগ্রামের ছদ্দু মিয়া, মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী প্রমুখ। আরও অনেকের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। এই প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের অনেকেই হাসির খোরাক হয়েছিলেন। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর এসব প্রার্থীর বাড়িতেও পুলিশি পাহারা বসানো হয় এবং টেলিভিশনে ভাষণ দেওয়ার সুযোগও প্রদান করা হয়।

মজার ব্যাপার যে, মাওলানা যশোরী, ছদ্দু মিয়াসহ কয়েকজন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী আমার অফিসে এসেছিলেন আমাকেও প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে। তারা বলছিলেন, আপনি দেশের সবচেয়ে বড়ো ছাত্রসংগঠনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং দেশের সর্বত্র ছাত্রশিবির দাঁড়িয়ে আছে। আপনি প্রার্থী হন, তাহলে অনেক ভোট পাবেন। আপনি হয়তো জানেন না, আপনার কিন্তু অনেক জনপ্রিয়তা আছে। আমি তাদের প্রস্তাব শুনে অনেক কষ্টে হাসি সংবরণ করেছি। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অনেক প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছেন, এটা দেখানোর জন্যই ধূর্ত এরশাদ এই তামাশার আয়োজন করেন। হাফেজ্জী হুজুর ও কর্নেল ফারুক রহমান ছাড়া অন্য প্রার্থীরা ছিলেন ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সরদার। তবে হাফেজ্জী হুজুর ও কর্নেল ফারুকের সমাবেশে বেশ জনসমাগম ঘটেছে।

দেশের সকল প্রধান রাজনৈতিক দল ওই নির্বাচন বর্জন করে। এই প্রহসনের নির্বাচনেই এরশাদ তাকে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন।

আব্বাস আলী খানকে অভিনন্দন জানিয়ে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর চিঠি

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ থেকে জামায়াতের দশজন সংসদ সদস্য পদত্যাগ করায় বিভিন্ন মহল জামায়াতকে অভিনন্দন জানায়। এই ঘটনার একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে জাতীয় রাজনীতিতে। প্রতিবেশী দেশ ভারতে নির্বাসিত জীবনযাপনকারী বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*-র ঠিকানায়

www.pathagar.org

আমাকে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে তিনি এরশাদের স্বৈরশাসনের প্রতিবাদে জামায়াতের দশজন সংসদ সদস্য পদত্যাগের দুঃসাহসী সিদ্ধান্তের জন্য জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খানকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন—'যে কাজটি করা উচিত ছিল আমার দল আওয়ামী লীগের, সে কাজটি আপনারা করেছেন এবং এজন্য আপনাদের প্রতি আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।'

উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী হাতিয়ার তুলে নেন এবং সীমান্ত অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত ভারতে আশ্রয় নেন। এর আগে তিনি প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন; কিন্তু সামরিক বাহিনীর সামনে তিনি পেরে ওঠেননি। একমাত্র আবদুল কাদের সিদ্দিকীই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন মুজিব হত্যার। আওয়ামী লীগের আর কোনো নেতাকর্মী ঘর থেকে বের হননি। সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান এবং শেখ সাহেবের ক্যাবিনেটের মন্ত্রীরাই খন্দকার মোশতাক আহমদের সাথে যোগদান করেন তার নতুন মন্ত্রিসভায়। আওয়ামী লীগের একসময়কার সভাপতি আবদুল মালেক উকিল লন্ডনে সফরে গিয়ে বলেন—'বাংলাদেশে ফেরাউনের পতন হয়েছে।' আর খোন্দকার মোশতাক আহমদের দূত হিসেবে মহিউদ্দিন আহমদ গিয়েছিলেন মস্কো।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এরশাদ সাহেব ১৯৮৮ সালে সকল রাজনৈতিক দলের বর্জনের মধ্য দিয়ে ভোটারবিহীন নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু এতে বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন অর্থাৎ তিন জোট ও জামায়াতে ইসলামীর যুগপৎ আন্দোলন আরও বেগবান হয় এবং ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি বিক্ষোভ মিছিল হাইকোর্টের পাশ দিয়ে প্রেসক্লাবের দিকে আসার সময় গাড়ি চাপা দিয়ে দেলোয়ার নামক একজন ছাত্র নিহত হওয়ার ঘটনায় আন্দোলন আরও তুঙ্গে ওঠে।

এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে দীর্ঘদিন তুমুল গণরোষের মুখেও এরশাদের টিকে থাকার পেছনে অন্যান্য কারণের মধ্যে তার প্রশাসনিক দক্ষতা দিল অন্যতম। তিনি খুব পরিশ্রম করতেন এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উপজেলাব্যবস্থা, ওষুধনীতি, বিচারব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ, শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা, মাদরাসা

www.pathagar.org

শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা, রাজধানীসহ সারা দেশে যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন, যমুনা সেতুর কাজের জন্য সারচার্জের মাধ্যমে তহবিল গঠন ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে বেশ কিছু উল্লেখ করার মতো পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেন। তার কোনো কোনো সিদ্ধান্ত বিতর্কিত ছিল, তারপরও দৃশ্যমান উন্নয়ন তিনি ঘটিয়েছিলেন এটা বলাই বাহুল্য।

রাজধানী ঢাকায় রোকেয়া সরণি, বিজয় সরণি, রামপুরা-বাড্ডা সড়ক, খিলগাঁও-যাত্রাবাড়ি সড়ক, ফুলবাড়িয়া সড়ক, নর্থসাউথ রোড, যাত্রাবাড়ি-কাঁচপুর সড়ক ইত্যাদি অনেক কাজ তিনি করেছিলেন। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম ও আর্মি স্টেডিয়ামের কাজও তিনি করেন। ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গ হাইওয়ের কাজের তিনি উন্নয়ন ঘটান। কিন্তু জনগণের অধিকার হরণ করে স্বৈরাচারী শাসন দেশের জনগণ মেনে নিতে না পারায় এরশাদের ওইসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তলে পড়ে যায়; বরং এরশাদবিরোধী আন্দোলনই তীব্রতা অর্জন করতে থাকে।

(মঙ্গলবার, রাত ১১:০০ টা; ১ অক্টোবর, ২০১৩)

www.pathagar.org

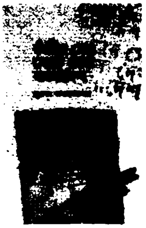

কেয়ারটেকার সরকারের ফরমুলা এবং অবশেষে এরশাদের পদত্যাগ

৭ দল, ৮ দল, ৫ দল ও জামায়াতে ইসলামীর অব্যাহত আন্দোলনের ফলে এরশাদের জনসমর্থন শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। প্রশ্ন দেখা দেয়—এরশাদ কীভাবে বিদায় নেবেন। এরশাদের উপ-প্রধানমন্ত্রী শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছিলেন—'ক্ষমতা কোথায় হস্তান্তর করব? আমরা কি জিরো পয়েন্টে ক্ষমতা ছাড়ব?'

তখন তিন জোট ও জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে কীভাবে এরশাদ ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেন, তার দুটি ফরমুলা দেওয়া হয়। তিন জোট ঐকমত্যের ভিত্তিতে ফরমুলা দেয়। কিন্তু সেই ফরমুলায় যদি এরশাদ পদত্যাগ করেনও, তারপরও সংসদ বহাল থেকে যায়। এই সংসদ তখন চাইলে সবকিছু ভন্ডুল করে দিতে পারে। কারণ, তিন জোটের দেওয়া ফরমুলায় সংসদ ভেঙে দেওয়ার কথা ছিল না। জামায়াতে ইসলামীর দেওয়া ফরমুলাতে সংসদ ভেঙে দেওয়ার কথা ছিল। এসব ফরমুলা মিলিয়ে প্রথমে উপ-রাষ্ট্রপতি ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ পদত্যাগ করেন। ফলে উপ-রাষ্ট্রপতির পদ খালি হয়। এই খালি পদে বিরোধী দলের গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ দেবেন বলে সমঝোতা হয়।

বিএনপি ও আওয়ামী লীগ কাকে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ দেবে, তা নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারছিল না। এদিকে জামায়াতের দেওয়া ফরমুলার সুস্পষ্টভাবে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত তিন জোট এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে। ফলে এরশাদ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবলে সংবিধান অনুযায়ী তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদকে উপ-রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব শেষে আবার প্রধান বিচারপতির

www.pathagar.org

দায়িত্বে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে শর্তে রাজি করানো হয়। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর রাষ্ট্রপতি এরশাদ সংবিধান অনুযায়ী উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করেন। ৬ ডিসেম্বর পদত্যাগ করেন এবং রাত দশটার বিটিভির সংবাদে তা প্রচার করা হয়। ফলে সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করায় বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হয়ে যান। তিন জোট ও জামায়াতের দেওয়া ফরমুলা অনুযায়ী নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক দশ ব্যক্তিকে নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়।

এরশাদের পদত্যাগের ঘোষণার সাথে সাথে রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র বায়তুল মোকাররম, পল্টন, গুলিস্তান, প্রেসক্লাব, হাইকোর্ট এলাকায় জনতার ঢল নামে। জনগণ উল্লাসে ফেটে পড়ে। এরশাদের বিরুদ্ধে স্লোগানে স্লোগানে গোটা রাজধানীতে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ এক গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। জাতীয় প্রেসক্লাব ছিল এই গণ-অভ্যুত্থানের প্রাণকেন্দ্র।

দৃশ্যত কেবল জনতার আন্দোলনেই এরশাদের পতন হয়েছে বলে মনে হলেও সেক্ষেত্রে সেনাবাহিনীরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এরশাদের ক্ষমতার চাবিকাঠি ছিল ক্যান্টনমেন্টে। এতদিন এরশাদ নানা কূটকৌশলে সেনাবাহিনীর সমর্থন ধরে রেখেছিলেন। সেনাবাহিনী জনতার সম্মিলিত আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অবশেষে এরশাদকে জানিয়ে দেয় যে, তাদের পক্ষে আর তার সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য সমর্থন জানানো সম্ভব নয়। মূলত এ কারণেই এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। কারণ, তার বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন ও লাখো জনতার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে বারবার। তিন জোট ও জামায়াতের মহাসমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি একই দিনে গোটা রাজধানীকে জনতার সমুদ্রে পরিণত করে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে। আর যখন সেনাবাহিনী তাকে 'নো' বলে দিলো, তখন তিনি বিদায় নিতে বাধ্য হলেন।

অনেকটা আইয়ুব খানের পতনের মতোই জনতার আন্দোলনের মুখে এরশাদও পদত্যাগ করেন। পার্থক্য এতটুকু যে, আইয়ুব খান পদত্যাগ করার পর সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে আবার সামরিক আইন জারি করেছিল। কিন্তু এরশাদের পদত্যাগের পর রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি বেসামরিক প্রশাসন দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী যথারীতি এই প্রশাসনকে আনুগত্য ও সর্বাত্মক সহযোগিতা করে।

www.pathagar.org

১৯৬৯ সালের আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়, তার সূচনা প্রথমে আইনজীবীগণ এবং তার সাথে রাজনৈতিক দলগুলো করলেও মুখ্য ভূমিকা ছিল ছাত্রসমাজের। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। এরশাদের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা ছিল। শেষের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা একটি বিশাল বিক্ষোভ করে, যা বিস্তৃত ছিল টিএসসি থেকে জাতীয় প্রেসক্লাব পর্যন্ত। নব্বইয়ের এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা কোনোমতেই উনসত্তরের মতো অতটা উত্তাল ছিল না। তিন জোট ও জামায়াতে ইসলামীর অব্যাহত আন্দোলন, হরতাল, ঘেরাও, অবস্থান কর্মসূচি এবং সবশেষে এরশাদের ওপর থেকে সেনাবাহিনীর সমর্থন প্রত্যাহারের ফলেই এরশাদের পতন হয়।

(বুধবার, রাত ১১:০০ টা; ২ অক্টোবর, ২০১৩)

www.pathagar.org

১৯৯১ সালে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন

বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে তার উপদেষ্টা পরিষদ এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় একটি চমৎকার অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সক্ষম হয়। আওয়ামী লীগ মনে করেছিল, সংগঠিত দল হিসেবে তারাই বিজয়ী হবে। বিএনপি নির্বাচনে বিজয়ী হবে এমনটি তারাও ভাবেনি। কিন্তু নির্বাচনে সর্বোচ্চসংখ্যক ১৩৬টি আসন লাভ করে বিএনপি। জামায়াত এককভাবে ১৮টি আসনে বিজয়ী হয়।

আওয়ামী লীগ নির্বাচনের পর জামায়াতের সমর্থন চেয়েছিল এবং এজন্য জামায়াতকে ৬টি মন্ত্রণালয় এবং মহিলা আসন জামায়াতের দাবি অনুযায়ী দিতে প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু আদর্শিক ও নীতিগত কারণে জামায়াত শেষ পর্যন্ত খালেদা জিয়ার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিএনপিকেই সরকার গঠনে সমর্থন দান করলে বিএনপি সরকার গঠন করে। তবে জামায়াত সরকারে যোগদান করে কোনো মন্ত্রিত্ব না নিয়ে সরকারের বাইরেই থেকে যায়। জামায়াতের শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনেকেই এজন্য জামায়াতের তীব্র সমালোচনা করেন এবং মন্ত্রিত্ব না নেওয়াটাকে তারা জামায়াতের বোকামি বলে চিহ্নিত করেন।

প্রথমে সংবাদপত্রের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়া জামায়াতের সমর্থন চাইলেও পরে আনুষ্ঠানিকভাবে পত্র দিয়ে বিএনপি সরকার গঠনে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীরের নিকট অনুরোধ জানান। জামায়াতের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম বিএনপিকে সরকারের বাইরে থেকে সরকার গঠনের জন্য সমর্থন জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জামায়াতের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদকে জানানোর পর তিনি বেগম খালেদা জিয়াকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানান।

www.pathagar.org

বিএনপিকে সমর্থন দানের জন্য লিখিত পত্র নিয়ে জামায়াতের যে প্রতিনিধিদল ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের নিকট গিয়েছিল, আমিও সেই প্রতিনিধিদলে ছিলাম। এর আগেও বেশ কটি বৈঠক বা সাক্ষাৎকার হয়। জামায়াতের সেসব বৈঠকেও আমি ছিলাম। আমরা যেদিন সরকার গঠনে বিএনপিকে সমর্থন দানের জন্য লিখিত আবেদন নিয়ে যাই, সেদিন বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ নিজের পক্ষ থেকেই বলেন—'আমি অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রদান এবং বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকীকে দেশে ফেরত আনা এই দুটো কাজ একসাথেই করতে চাই।' এতে আমরা খুব সন্তোষ প্রকাশ করি এবং আশ্বস্ত হই। তিনি এটাও বলেন—'আমি যা বলি, তা করি। আমি মুনাফিকিতে বিশ্বাসী নই। কারণ, পবিত্র কুরআনে মুনাফিককে কাফিরের চাইতে খারাপ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।' এ সম্পর্কে তিনি পবিত্র কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতটিরও উল্লেখ করেন।

সরকার গঠনের কিছুদিন পর আমরা যখন আবার অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্বের ব্যাপারে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য সাক্ষাৎ করি, তখন তিনি জানান—'প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ সংক্রান্ত ফাইলটি আমার কাছ থেকে ফেরত নিয়ে গিয়েছেন।' এতে আমরা বেশ বিব্রত বোধ করি এবং কিছুটা সংশয়ের মধ্যে পড়ে যাই।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন :
অধ্যাপক গোলাম আযমের বাসভবনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী

রাজনৈতিক জোট ও দলের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদকে তার পূর্বপদ প্রধান বিচারপতির পদে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদে ১০ আগস্ট, ১৯৯১ সালে একাদশ সংশোধনী বিল পাশ করা হয়। নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে আবদুর রহমান বিশ্বাস নির্বাচিত হলে তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে প্রত্যাবর্তন করেন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে প্রার্থী ঘোষণা করে। বিচারপতি চৌধুরী শেখ হাসিনার নির্দেশে সমর্থন লাভের জন্য জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে অধ্যাপক সাহেবের মগবাজারের বাসস্থানে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তার সাথে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র

www.pathagar.org

আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুর রহমানকে নিয়ে আসেন। নীতিগত কারণে বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে জামায়াত সমর্থন জানাতে পারেনি। তবে এতটুকু সিদ্ধান্ত হয় যে, জামায়াত ভোটদানে বিরত থাকবে। কারণ, জামায়াতের ২০টি ভোট বিএনপির প্রার্থীর বিজয় লাভের জন্য প্রয়োজন হবে না। এ সময় পর্যন্তও অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্বের অনুমোদন হয়নি।

জাতীয় সংসদে জামায়াতের মহিলা সংসদ সদস্য

এখানে উল্লেখ্য যে, মহিলা সংসদ সদস্যপদ নেওয়ার ব্যাপারে জামায়াতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক গোলাম আযমের প্রস্তাব অনুযায়ী জামায়াতের দুজন প্রবীণ সদস্যা হাফেজা আসমা খাতুন ও রশিদা বেগমকে সংসদ সদস্য হিসেবে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। মাত্র দুজনই জামায়াত দাবি করেছিল এজন্য যে, এর চাইতে বেশি নিতে গেলে বয়সে নবীন সদস্যাদের নিতে হবে, যাতে জামায়াত সম্মত ছিল না।

বিএনপির সরকার গঠনের পরপরই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। বিএনপির অভ্যন্তরে সংসদীয় পদ্ধতির প্রশ্নে দ্বিমত ছিল। এক্ষেত্রে জামায়াতের মতামত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ওদিকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সংসদীয় পদ্ধতি পুনরুজ্জীবনের চাপ ছিল। যদিও-বা আওয়ামী লীগই বাকশাল করার মাধ্যমে চতুর্থ সংশোধনী করে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল। এজন্যই একটি পরিস্থিতিতে বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জামায়াত নেতৃবৃন্দকে একটি বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান। জামায়াতের পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান, সেক্রেটারি জেনারেল মতিউর রহমান নিজামী, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুজাহিদ ও আমি যাই। বেগম জিয়ার সাথে তখনকার ডেপুটি স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ছিলেন।

বেগম জিয়া প্রস্তাব করেন—'আপনারা যদি সমর্থন করেন, তাহলে আমরা প্রেসিডেন্ট পদ্ধতিই বহাল রাখতে চাই।' এরপর দুই পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা নিয়ে উভয় পক্ষে আলোচনা হয়। জামায়াতের পক্ষ থেকে বলা হয়, জামায়াত উভয় পদ্ধতিকেই গণতান্ত্রিক মনে করলেও সংসদীয় ব্যবস্থাকেই বাংলাদেশের জন্য বেশি উপযুক্ত মনে করে। আলোচনার একপর্যায়ে আমি অনুমতি নিয়ে কথা বলি। আমি ছিলাম সে বৈঠকে খুবই জুনিয়র একজন।

www.pathagar.org

আমি বললাম—'আরও একটি কারণে সংসদীয় পদ্ধতিতে যাওয়া উচিত। আর সেটা হলো, সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন করা হলে আওয়ামী লীগের কোনো ইস্যু থাকবে না আন্দোলন করার। তা ছাড়া সংসদীয় পদ্ধতির ব্যাপারে একটি ন্যাশনাল কনসেনসাস আছে এবং আওয়ামী লীগের এটা সমর্থন করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। উপরন্তু শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাকশালের পরিবর্তে বহুদলীয় গণতন্ত্র জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন এবং সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন করে আপনিও ইতিহাসে স্থান করে নেবেন।'

আমি লক্ষ করি, স্বভাবসুলভভাবে গালে আঙুল দিয়ে বেগম জিয়া আমার কথাগুলো খুব মনোযোগের সাথে শুনছিলেন। আমার বক্তব্যের পর বৈঠকে একটা নীরবতা নেমে আসে এবং বেগম জিয়া বললেন—'ঠিক আছে। বুঝলাম, আপনারাও সংসদীয় পদ্ধতিই চাইছেন।' এরপর বৈঠক সমাপ্ত হলো। মজার ব্যাপার যে, বিটিভির ক্যামেরাম্যান বৈঠকের ছবি নিয়েছিলেন এবং আমার কাছ থেকে আমাদের নেতাদের নাম-পদবি ইত্যাদির নোটও নিয়েছিলেন। বৈঠকের পরও তারা অপেক্ষা করেছেন যে, কোনো প্রেস ব্রিফিং হয় কি না। কিন্তু কোনো প্রেস ব্রিফিং হয়নি এবং বৈঠকটির কোনো সংবাদও মিডিয়ায় প্রচারিত হয়নি।

বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা : প্রধানমন্ত্রীর ডিক্টেটরশিপ

১৯৯১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল আইনে পরিণত হয়। সর্বসম্মতভাবে একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী পাশ করা হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানের আমলেই দ্বাদশ সংশোধনীতে সংবিধানের অনেক অনুচ্ছেদ পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, বিলোপ, সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়। ফলে রাষ্ট্রপতি নামসর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধানে পরিণত হন এবং প্রধানমন্ত্রী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগদান ছাড়া রাষ্ট্রপতির আর কোনো ক্ষমতাই সংবিধানে রাখা হয়নি। ৪৮ অনুচ্ছেদের (৩)-এ বলা হয়—

> "এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্বপালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কর্ম করিবেন।"

www.pathagar.org

এখানে বলা প্রয়োজন, বাংলাদেশে যে সংসদীয় ব্যবস্থা বর্তমানে চালু আছে, তা কার্যত প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্ব বা একটি নির্বাচিত ডিক্টেটরশিপের ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। বর্তমানে যিনি প্রধানমন্ত্রী, তিনিই দলীয় প্রধান। তিনিই সংসদ নেতা এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও তারই হাতে। কাজেই রাষ্ট্রের সকল বিভাগের ওপর প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্ব। ফলে ব্রিটেন বা অন্য কোনো দেশের মতো সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বিশাল এবং কর্মচারীর সংখ্যাও অনেক বেশি। সরকারের সবকিছু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। বলতে গেলে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী অতীতের রাজা-বাদশাহ বা সম্রাটদের চাইতেও ক্ষমতাধর। বর্তমান বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্র আমেরিকার প্রেসিডেন্টের চেয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা মাত্রাগত দিক থেকে বেশিই। আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে সিনেট ও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভের বাধ্যবাধকতার মধ্যে কাজ করতে হয় এবং কংগ্রেস চাইলে তার যেকোনো প্রস্তাবকে 'না' বলে দিতে পারে। বাংলাদেশে এটা সম্ভব নয়; বরং উলটোটাই ঘটে। যেমনটি হয়েছে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর ব্যাপারে। এ সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকারব্যবস্থা বহাল রাখার পক্ষে সুপারিশ করে। সংবিধান ও আইন বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী ও নানা পেশার প্রতিনিধিদের সাথে সংসদীয় কমিটি যে মতবিনিময় করে, তাতে তারাও কেয়ারটেকার সরকারব্যবস্থা বহাল রাখার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

আদালত এ বিষয়ের ওপর মতামত দেওয়ার জন্য ১০ জন এমিকাস কিউরি (আদালতের বন্ধু)-কে আমন্ত্রণ জানান। তাদের মধ্যে ৯ জনই কেয়ারটেকার ব্যবস্থা বহাল রাখার পক্ষে মতামত দেন। প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক এমিকাস কিউরিদের মতামত উপেক্ষা করে কেয়ারটেকার সরকার অবৈধ বলে বাতিল ঘোষণা করেও জাতীয় স্বার্থে আগামী দুটি নির্বাচন (দশম ও একাদশ সংসদ) কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে হতে পারে বলে সংক্ষিপ্ত রায়ে বলেন। ওদিকে বিএনপি-জামায়াতসহ দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলও কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে দাবি জানিয়ে আসছিল। সংসদীয় কমিটি, আদালত, বিরোধী দল, সুশীল সমাজসহ সবার দাবি, এমনকি নিজ দলের সদস্যদের মতামত উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইচ্ছা মোতাবেক পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাশ করে কেয়ারটেকার

www.pathagar.org

সরকারের অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের আইনটি বাতিল করা হয়। এটাকে কি কোনোভাবেই গণতন্ত্রের সংজ্ঞার মধ্যে ফেলা যায়?

অধিকন্তু সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কাছে সংসদ সদস্যরা জিম্মি হয়ে আছেন। ফলে সংসদে সরকারি দল যে আইনের কথাই তুলুক, বুঝে হোক না বুঝে হোক অথবা পছন্দ হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায়ই তার প্রতি সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অন্ধভাবেই সমর্থন করে যেতে হবে। গণতান্ত্রিক কোনো দেশের সংবিধানে এ ধরনের কোনো ধারা নেই। ফলে ব্যক্তিতান্ত্রিক রাজনীতিই সামনে চলে এসেছে।

(বৃহস্পতিবার, রাত ১২:০০ টা; ৩ অক্টোবর, ২০১৩)

www.pathagar.org

অধ্যাপক গোলাম আযমকে জামায়াতের আমীর ঘোষণা : নির্মূল কমিটি গঠিত

অনেকটা ধৈর্যের সীমা পার করে জামায়াত আমীর হিসেবে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাম প্রকাশ করে। কারণ, দীর্ঘদিন যাবৎ অধ্যাপক গোলাম আযম নাগরিকত্ব সমস্যার কারণে পর্দার অন্তরালে ছিলেন এবং ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে আব্বাস আলী খান দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধানকল্পে জামায়াত ঝুঁকি নিয়েই অধ্যাপক গোলাম আযমকে আমীর ঘোষণা করে।

এই ঘোষণায় তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় এবং পরদিনই ১০০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। তথাকথিত নির্মূল কমিটি একটি গণ-আদালত গঠন করে অধ্যাপক গোলাম আযমের বিচার করার কথা ঘোষণা করে। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে গণ-আদালত বসিয়ে অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ফাঁসির রায় ঘোষণা করে। তাদের তথাকথিত তদন্ত কমিশন কর্তৃক আরও ৮ জনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনা হয়। সেই তালিকায় তিন নম্বরে আমার নামও ছিল। রাস্তায় আদালত বসিয়ে কাউকে ফাঁসির দণ্ড ঘোষণা নজিরবিহীন। এটা আদালত অবমাননাই শুধু নয়; বরং রাষ্ট্র ও সরকারের অস্তিত্ব অস্বীকার করা তথা রাষ্ট্রদ্রোহিতা।

আওয়ামী লীগ এই নির্মূল কমিটি বা ঘাদানি (ঘাতক দালাল নির্মূল) কমিটিকে সর্বাত্মক পৃষ্ঠপোষকতা দান করে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তথাকথিত গণ-আদালতের ফাঁসির রায়ের পর কয়েক হাজার লোক মিছিল নিয়ে মগবাজারে অধ্যাপক আযমের বাসভবনের দিকে রওনা করলেও শেষ পর্যন্ত তারা আসেনি। বিএনপি সরকার এই পরিস্থিতিতে দোটানায় পড়ে যায়। সরকার জাহানারা ইমামসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনে এবং একইসাথে অধ্যাপক গোলাম আযমকে গ্রেফতার করে, বিদেশি নাগরিক হিসেবে অবৈধভাবে বাংলাদেশে অবস্থানের কারণ দেখিয়ে।

www.pathagar.org

আগে থেকেই জামায়াত অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন করে আসছিল। এরপর শুরু হলো আইনি লড়াই। অধ্যাপক আযমকে ডিটেনশন দেওয়া হয় তিন মাসের জন্য। এরপর দফায় দফায় তার ডিটেনশনের মেয়াদ বাড়াতে থাকে সরকার। উল্লেখ্য যে, নাগরিকত্ব জন্মগত অধিকার। এটা কেড়ে নেওয়ার কোনো বিধান নেই। অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্ব নির্বাহী আদেশে বাতিল করা হয়েছিল। যে ২৯ জনের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়, তাদের অনেকের নাগরিকত্ব ইতোমধ্যে সরকার যথারীতি পুনর্বহাল করে। কিন্তু অধ্যাপক গোলাম আযমের বিষয়টি অযৌক্তিকভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

জামায়াত হাইকোর্টে রিট করার পর নাগরিকত্ব বিষয়টি নিষ্পত্তির সুযোগ হয়। অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্বের ইস্যুতে জামায়াতের পক্ষ থেকে মুজাহিদ ভাই ও আমি দেশের অনেক বিশিষ্ট আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করি এবং তাদের মতামত জানার চেষ্টা করি। আমরা ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ, ড. কামাল হোসেন ও সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীর সাথেও সাক্ষাৎ করি। তারা অনানুষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। আমরা কখনও তা জনসম্মুখে প্রকাশ করিনি। তবে আমরা বুঝতে পারি, জন্মগত নাগরিক অধিকার বাতিল করার কোনো সুযোগ নেই। আমরা আগেও আদালতের আশ্রয় নিতে চেয়েছিলাম। Cause of Action না থাকায় আদালতে গিয়ে সুবিধা হবে না বিধায় আদালতে যাওয়া হয়নি বা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। কিন্তু সরকার অধ্যাপক গোলাম আযমকে গ্রেফতার করায় আদালতে যাওয়ার এবং বিষয়টি নিয়ে আইনি লড়াই করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

আদালত আমাদের যেতে হবে চিন্তা করে আগে থেকেই আমরা আইনজীবী নিয়োগের চিন্তাভাবনা করি। সংগত কারণেই আওয়ামী ঘরানার বিখ্যাত আইনজীবীগণ এ মামলা নেবেন না, এটাই ছিল স্বাভাবিক। একপর্যায়ে ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেনের সাথে আলাপ হলে তিনি সানন্দে মামলা নিতে রাজি হন এবং কয়েক দফা তার বারিধারার বাসভবনে আমাদের বৈঠক হয়। এক বৈঠকে অধ্যাপক সাহেব নিজেও উপস্থিত ছিলেন এবং সেদিন ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেনের বাড়িতে আমরা রাতের খানাও খাই।

www.pathagar.org

ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক মামলার যাবতীয় প্রস্তুতি নেবেন। তবে সুপরিচিত একজন আইনজীবীর প্রয়োজন ছিল মামলাটি পরিচালনার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। সেজন্যই মঈনুল হোসেন সাহেবের সাথে আমাদের বোঝাপড়া করতে হয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে নানা চাপে ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন পিছিয়ে যান এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তার পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করা সম্ভব নয় বলে আমাদেরকে অবহিত করেন।

অনেকটা নিরুপায় হয়ে আমরা প্রবীণ আইনজীবী ও অধ্যাপক সাহেবের একজন অনুরক্ত অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমানকে আইনজীবী হিসেবে ঠিক করি। ওদিকে আমরা ব্যারিস্টার এ আর ইউসুফের সাথেও যোগাযোগ করলে তিনিও রাজি হন। শুনানির প্রথম দিনে মুজিবুর রহমান সাহেব তার দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন, যাতে আমরা খুবই বিচলিত হই। তিনি একজন অভিজ্ঞ ক্রিমিনাল আইন বিশেষজ্ঞ। আর অধ্যাপক গোলাম আযমের মামলাটি হচ্ছে সাংবিধানিক বিষয়। মুজিবুর রহমান সাহেব অত্যন্ত আবেগ দিয়েই শুনানিতে অংশ নেন। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছিলাম যে, তিনি ল' পয়েন্টে খুব Sustainable যুক্তি উপস্থাপন করতে পারছিলেন না। এরপর আমরা অনেকটা মুজিবুর রহমান সাহেবকে নারাজ করেই ব্যারিস্টার এ আর ইউসুফকে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দিই। তিনি অধ্যাপক গোলাম আযমকে খুবই সম্মান করতেন এবং খুশি হয়ে তিনি দায়িত্বটি গ্রহণ করেন। ব্যারিস্টার ইউসুফ শুনানি শুরু করার পর মামলার মোড় ঘুরে যায়। অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেব শুনানির মাধ্যমে যে জটিলতার সৃষ্টি করেছিলেন, ব্যারিস্টার ইউসুফ তা দূর করেন। তিনি চমৎকারভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন এবং বিচারপতিগণের উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের সন্তোষজনক জবাব দেন। বিচারপতি ইসমাইল উদ্দিন ও বিচারপতি বদরুল ইসলাম চৌধুরীর বেঞ্চে মামলাটির দীর্ঘ শুনানি চলে।

অধ্যাপক গোলাম আযমের গ্রেফতার : এক অভূতপূর্ব দৃশ্য

অধ্যাপক গোলাম আযমকে গ্রেফতারের দিন এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। সেদিন সকাল দশটায় অসংখ্য গোয়েন্দা, সাদা পোশাকে পুলিশের কর্মকর্তা এবং ঢাকার পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে তার বাড়ি ঘেরাও করা হয়।

www.pathagar.org

তারা অধ্যাপক সাহেবের সাথে কয়েক দফা আলাপ-আলোচনাও করেন। খবর পেয়ে আমরা সেখানে গিয়েই বুঝতে পারি, আজই তাকে গ্রেফতার করা হবে। সম্ভবত উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্তের কারণেই গ্রেফতার করতে অনেক বিলম্ব হয়।

আমরা ঢাকা মহানগরী জামায়াতকে জানিয়ে দিয়েছিলাম এ খবর। ফলে দলে দলে জামায়াত ও শিবিরের নেতাকর্মীরা মগবাজারে অধ্যাপক আযমের বাড়ির সামনে জমায়েত হতে থাকেন। এভাবে প্রায় ছয় ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর কর্মকর্তারা সম্ভবত উচ্চপর্যায় থেকে গ্রেফতারের নির্দেশ পান। তখন গোটা মগবাজার কাজী অফিস লেন, ওদিকে রমনা থানা পর্যন্ত রাস্তার ওপর হাজার হাজার জামায়াত-শিবির নেতাকর্মী সমবেত হয়েছেন।

এই অবস্থায় পুলিশ কর্মকর্তারা আমাদের সহযোগিতা কামনা করেন। তারা বলেন, নির্দেশ এসেছে গ্রেফতারের এবং গ্রেফতার করা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। মাত্র কয়েকশত পুলিশ ও পুলিশের কয়েকটা গাড়ি। আমরা বললাম—'পুলিশ যেন কোনোক্রমেই বাড়াবাড়ি না করে বা আমাদের কোনো কর্মীর সাথে খারাপ ব্যবহার না করে, এটা আপনাদের নিশ্চিত করতে হবে।' এদিকে অধ্যাপক সাহেবের বাড়ির রাস্তার ওপর শত শত জামায়াত ও শিবিরকর্মী শুয়ে পড়েছেন। এমতাবস্থায় জামায়াত নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে কর্মীদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয় রাস্তা খালি করে দেওয়ার জন্য। তখন কান্নার রোল পড়ে যায়। জামায়াত নেতারা অনেক কষ্টে রাস্তায় শুয়ে পড়া কর্মীদের উঠিয়ে কোনোমতে গাড়ি চলার ব্যবস্থা করেন। অধ্যাপক গোলাম আযম যেহেতু আগেও অনেকবার কারাবরণ করেছেন, সুতরাং প্রস্তুতি নিয়ে অবিচলভাবে তিনি পুলিশের জিপে উঠলেন এবং হাত নেড়ে কর্মীদের শান্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। এভাবেই তার গ্রেফতার পর্ব সম্পন্ন হলো এবং সোজা তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নেওয়া হলো ডিটেনশন অর্ডার দিয়ে। জামায়াত সারা দেশব্যাপী বিক্ষোভের কর্মসূচি পালন করল পরদিন। ঢাকা মহানগরী জামায়াত বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে এক বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশ করল।

গ্রেফতারের পরপরই জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ এবং ঢাকায় অবস্থানরত কর্মপরিষদ ও শুরার সদস্যদের বৈঠক বসে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। বৈঠকে আন্দোলনের কৌশল নিয়ে দ্বিমতের সৃষ্টি হয়। মুজাহিদ ভাই অধ্যাপক

www.pathagar.org

সাহেবকে জামায়াতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে নতুন আমীর ঘোষণা এবং অধ্যাপক সাহেবের নাগরিকত্বের জন্য সর্বাত্মক আইনি লড়াই চালানোর পক্ষে কঠিন অবস্থান গ্রহণ করেন। আমরা কয়েকজন এই পরিস্থিতিতে কোনোক্রমেই অধ্যাপক সাহেবকে জামায়াতের আমীরের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া যাবে না এবং আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি ব্যাপক গণ-আন্দোলনের কর্মসূচি দেওয়ার পক্ষে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করি। ঢাকা মহানগরী জামায়াতের নেতৃবৃন্দও মাঠের আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। দীর্ঘ বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত হয় আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি মাঠের আন্দোলনও চলবে।

যেহেতু ঢাকা দেশের প্রাণকেন্দ্র, তাই ঢাকায় ব্যাপক বিক্ষোভ সমাবেশ ও অব্যাহত কর্মসূচি নেওয়া হয়। আলেমসমাজ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলকেও অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্ব বহাল ও মুক্তির দাবিতে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা হয়। আইনি লড়াই চালানোর জন্য আইনজীবীদের মাঝে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের জন্য আলী আহসান মুজাহিদ ভাইকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। মাঠমুখী আন্দোলনের কর্মসূচিতে দ্বিমত থাকলেও আইনি লড়াই চালানোর দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তিনি পালন করেন। তার ধারণা ছিল যে, আন্দোলন করলে ক্ষতি হবে এবং জামায়াতকে সরকার নিষিদ্ধ করে দেবে। এমন মতপার্থক্য থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে সিদ্ধান্তের পর সবাই দৃঢ়তার সাথে তা বাস্তবায়ন করবেন, এটাই সাংগঠনিক শৃঙ্খলার দাবি। জামায়াতে সেই শৃঙ্খলা ও ঐতিহ্য রয়েছে।

মামলার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আইনজীবী হিসেবে ব্যারিস্টার এ আর ইউসুফ এক বৈঠকে আমাদের পরিষ্কার করে বললেন—'আদালতে আমার কাজ আমি করব আর মাঠের আন্দোলন করার দায়িত্ব আপনাদের। আপনারা সেই কাজটা যত জোরদার ও বেগবান করতে পারবেন, আদালতে দাঁড়িয়ে কথা বলতে আমি তত বেশি সাহস ও শক্তি পাব। জনতার কণ্ঠও বিচারপতিকে প্রভাবিত করে। তারা দেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও দাবিকে উপেক্ষা করতে পারেন না এবং পরিস্থিতি-পরিবেশ সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করেই বিচারকগণ তাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। তা ছাড়া নাগরিকত্বের এই মামলাটি সাংবিধানিক আইনগত বিষয় হলেও এটা একটি রাজনৈতিক মামলাও বটে। রাজনৈতিক কারণেই অধ্যাপক সাহেবের নাগরিকত্ব বাতিল করে তাকে তার জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।'

www.pathagar.org

তিনি আবারও বললেন—'আপনাদের কাজ হচ্ছে ব্যাপক গণসমাবেশ ও জনমত সংগঠিত করা। এদিকে আমাদের কাজ আমরা করব। আমি আশা করি, আপনারা আমার কথা বুঝতে পেরেছেন।' ব্যারিস্টার এ আর ইউসুফের এ কথার পর আমরা আরও উৎসাহিত ও উজ্জীবিত হলাম। ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাকও ব্যারিস্টার ইউসুফের মতো একই মত পোষণ করতেন।

নাগরিকত্ব প্রশ্নে হাইকোর্টে বিভক্ত রায়

হাইকোর্টের বেঞ্চে শুনানির পর এলো রায় ঘোষণায় দিন। জ্যেষ্ঠ বিচারপতি ইসমাইল উদ্দিন সরকার রিট আবেদনটি খারিজ ঘোষণা করলেন, অর্থাৎ অধ্যাপক আযমের নাগরিক অধিকার পুনর্বহাল করলেন না। আমরা তো অনেকটা হতাশ। বিচারপতি সরকার তার রায় ঘোষণার পর অন্য বিচারপতি বদরুল ইসলাম চৌধুরীর দিকে ফিরে তাকালেন তার মতামতের জন্য। বিচারপতি বদরুল ইসলাম চৌধুরী তার স্টেনোকে ডেকে বললেন, তিনি তার মতামত আলাদাভাবে দেবেন। স্টেনো হাতে কলম নিয়ে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথেই তিনি তার রায় ডিক্টেট করা শুরু করলেন। রায়দানের এসব বিষয় যারা ভালো বোঝেন, তারা কেউ কেউ বললেন—'তিনি যেহেতু আলাদাভাবে রায় দেওয়া শুরু করেছেন, এর অর্থ হলো—তিনি ইসমাইল উদ্দিন সরকারের রায়ের সাথে একমত নন। একমত হলে তো এক বাক্যেই বলে দিতে পারতেন। সুতরাং একটি বিভক্ত রায় হতে যাচ্ছে।' তবে আমাদের উৎকণ্ঠা কাটছিল না।

অনেক সময় একজন বিচারপতি রায় দেওয়ার পর অপরজন আরও কিছু অবজারভেশন ও বিশ্লেষণ দিয়েও একই ধরনের মতামত দিতে পারেন। যাহোক, তিনি যখন একটার পর একটা সাংবিধানিক ও আইনি যুক্তি বা রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করে বিবাদীপক্ষের আইনজীবীর যুক্তি গ্রহণ করছিলেন, তখনই কিছুটা আশার আলো আমরা দেখছিলাম। শ্বাসরুদ্ধকর নীরবতার মধ্যে তিনি রিট আবেদনটি গ্রহণ করলেন এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে বললেন, অধ্যাপক গোলাম আযম জন্মগতভাবেই বাংলাদেশের নাগরিক এবং অবিলম্বে এই আদেশ বহাল করারও তিনি আদেশ দিলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসমাইল উদ্দিন সরকারের প্রধান যুক্তি ছিল নাগরিকত্ব হরণের ২০ বছর পর আবেদন করায় এই বিলম্বের কারণেই তিনি এই

www.pathagar.org

অধিকার আর ফিরে পেতে পারেন না। এই বিলম্বই তার জন্য কাল হয়েছে। তিনি যদি সাথে সাথেই বা একটি যুক্তিসংগত সময়ের মধ্য আবেদন করতেন, তাহলে আদালত হয়তো-বা তা বিবেচনা করতেও পারত। কিন্তু আমাদের আইনজীবীদের যুক্তি ছিল যে, বাস্তব কারণেই তিনি আবেদন করতে বিলম্ব করেছেন। এর আগে তিনি দুইবার দরখাস্ত করেছেন। পাসপোর্টের জন্য দরখাস্ত করেছেন, যার প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে। তা ছাড়া নাগরিকত্ব সমাপ্তির মতো হস্তান্তরযোগ্য কোনো বিষয় নয় যে, আবেদন করার বিলম্বের কারণে তা অন্যের ভোগদখলে চলে গেছে। একটি সম্পত্তি কেউ দীর্ঘদিন ব্যবহার না করলে অন্য কেউ তা ভোগদখল করলে তার একটি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং দীর্ঘ সময় পর তা পুনরায় আগের মালিককে ফিরিয়ে দিতে গেলে সেই ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা তার অধিকার খর্ব করা হয়। অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব হরণের পর তার নাগরিকত্ব অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি যে, এখন গোলাম আযম সাহেবের নাগরিকত্ব বহাল করলে কেউ ক্ষতির সম্মুখীন হবেন বা কারও অধিকার খর্ব করা হবে। সুতরাং সংবিধান অনুযায়ী অধ্যাপক আযম নাগরিক অধিকার ফেরত পাবেন এবং এটা তার জন্মগত অধিকার। জন্মগত অধিকার হরণ করা যায় না বা তামাদি হয় না।

হাইকোর্টের একক বেঞ্চে নাগরিকত্বের পক্ষে রায় আপিল বিভাগে বহাল

বিভক্ত রায় হওয়ার কারণে প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ এই মামলাটি এক সদস্যবিশিষ্ট একটি বেঞ্চে পাঠান। বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরীর বেঞ্চে আবার শুনানি হলো। অ্যাটর্নি জেনারেল আমিনুল হক সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা হিসেবে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন। ব্যারিস্টার এ আর ইউসুফ ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাককে সাথে নিয়ে খুবই যোগ্যতার সাথে ল' পয়েন্টে তার যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। সংক্ষেপে ল' পয়েন্টে উপস্থাপনের অসাধারণ পারদর্শিতা লক্ষ করেছি তার মধ্যে।

এরপর এলো রায় ঘোষণার দিন। হাইকোর্টে বিচারপতি আনোয়ারুল হকের এজলাস লোকে লোকারণ্য। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি সোজাসুজি বিচারপতির দিকে তাকিয়ে পেছনের সারিতে দাঁড়িয়েছিলেন।

www.pathagar.org

আমাদের ঠিক পেছনেই তিনি দাঁড়িয়েছেন দেয়ালঘেঁষে। তাকে বসার জন্য অনুরোধ করার পরও তিনি বসেননি। আমিসহ অনেকেই খুব শঙ্কিত ছিলাম যে, কাদের সিদ্দিকী কেন এভাবে দাঁড়ালেন! বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরী তার ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করলেন অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্বের পক্ষে। আমরা উৎফুল্ল হয়ে আদালত কক্ষ থেকে বের হয়ে এলাম। কাদের সিদ্দিকী নীরবে প্রস্থান করলেন।

আমরা মনে করেছিলাম যে, সরকার হয়তো আপিল করবে না। কিন্তু সরকার আপিল করলে আপিল বিভাগের ফুল বেঞ্চে শুনানি হলো। প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ সাহেব অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্বের ফাইলটি দেখেছেন এবং তার নাগরিকত্ব পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এজন্য তিনি শুনানিতে নিজে বিরত থাকলেন। আপিল বিভাগের সিনিয়র বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের অন্যান্য বিচারপতি শুনানিতে অংশ নিলেন। বিচারপতি মোস্তফা কামাল ও আপিল বিভাগের বেঞ্চের একজন সদস্য ছিলেন। শুনানি শেষে আপিল বিভাগ সর্বসম্মতভাবে বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরীর রায় বহাল রাখলেন। ফলে অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্বের ইস্যুটি আইনিভাবে নিষ্পত্তি হওয়ায় আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম এবং ন্যায়বিচার পাওয়ায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম।

১৬ মাস পর অধ্যাপক গোলাম আযম আইনগতভাবে তার নাগরিক অধিকার ফিরে পেয়ে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে আসেন। তার মুক্তির দিনে নাজিমুদ্দিন রোড থেকে ফুলবাড়িয়া গুলিস্তান হয়ে বায়তুল মোকাররম মসজিদ পর্যন্ত বিপুল জনসমাগম হয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তাকে গাড়িতে তুলে মিছিল সহযোগে আমরা বায়তুল মোকাররম হয়ে মগবাজার তার বাসভবনে আসি। এখানে বলা প্রয়োজন যে, নিরাপত্তার স্বার্থেই তাকে গাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা মিছিল করে আসি। বায়তুল মোকাররমে তিনি যাবেন, এমন প্রচারও করা হয়েছিল কৌশলগত কারণে। তার জীবনের ওপর কোনো হুমকি আসতে পারে, এমন আশঙ্কা থেকেই নিরাপত্তার ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অব্যাহত দুই যুগ যাবৎ তার বিরুদ্ধে চরম বিদ্বেষাত্মক মিথ্যা প্রচারণার ফলে তার শত্রুর অভাব ছিল না। তাকে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির প্রতীকে পরিণত করা হয়েছিল। তাকে দৈহিকভাবে আক্রমণ করার জন্য অথবা খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ কেউ কাজী অফিস লেন মসজিদ পর্যন্তও এসেছে এবং তার খুতবা

www.pathagar.org

শুনে চেহারা দেখে ফেরত গিয়েছে এবং পরে প্রকাশ করেছে খারাপ মোটিভ নিয়েই গিয়েছিলাম, কিন্তু তাকে দেখার পর মনে হলো—এই লোক সম্পর্কে যা প্রচার করা হচ্ছে, তা সঠিক নয়। অনেকে দূর থেকে তাকে গালিগালাজও করত, কিন্তু যখন সামনে এসে কথাবার্তা শুনেছে, তখন তাদের ক্ষোভ প্রশমিত হয়ে গিয়েছে এবং পরে জামায়াতের ভক্ত হয়েছে।

(শুক্রবার, ভোর ৩:০০ টা; ৫ অক্টোবর, ২০১৩)

www.pathagar.org

বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে আয়োজিত সমাবেশে অধ্যাপক গোলাম আযমের ঐতিহাসিক ভাষণ

নাগরিকত্ব বহাল হওয়ায় অধ্যাপক আযমকে সংবর্ধনা জানিয়ে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে ঢাকা মহানগরী জামায়াত এক বিশাল জনসভার আয়োজন করে। এ জনসভায় ভাষণে অধ্যাপক আযম কী ধরনের বক্তব্য রাখবেন, তা নিয়ে পরামর্শের জন্য জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ ও কর্মপরিষদ সদস্যের এক বৈঠক আহ্বান করেন। মূলত তিনি কোনো বড়ো সমাবেশে বক্তব্য দেওয়ার আগে দলের ফোরামে পরামর্শ করেন। দলের অভিজ্ঞ ও সিনিয়র নেতারা বিভিন্ন পরামর্শ দিলেন। একপর্যায়ে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'তোমার পরামর্শ কী?' আমরা অনেক জুনিয়র হলেও তিনি আমাদের মতামত জানতে চাইতেন। বিশেষ করে রাজনৈতিক ইস্যুতে আলোচনায় আমাদের কয়েকজনের কথা তিনি শুনতে চাইতেন। সভায় অ্যাজেন্ডা জানার পর থেকেই আমি চিন্তা করছিলাম, এই সভার আমীর হিসেবে অধ্যাপক আযমের কী ধরনের বক্তব্য দেওয়া উচিত। আমার নিজের কথা লিখতে হচ্ছে বলে আমি কিছুটা বিব্রত বোধ করছি। কারণ, পাঠক হয়তো-বা মনে করতে পারেন যে, আমি আমার কৃতিত্ব জাহির করার জন্যই এ কথাগুলো লিখছি। তবে যা ঘটেছে, আমি তা-ই লিপিবদ্ধ করছি। আশা করি, কেউ ভুল বুঝবেন না। যাহোক, আমি বেশ কিছু পয়েন্ট নোট করে এনেছিলাম। আমার অভ্যাস ছিল নোট নিয়ে বক্তব্য বা পরামর্শ দেওয়ার।

নোটটা সামনে নিয়ে আমার কথা শুরু করলাম। আমি বললাম—'আপনি এখন দেশে মাত্র কয়েকজন প্রবীণ রাজনীতিবিদদের একজন। আপনার সামসময়িক রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই এখন নেই। মিজানুর রহমান চৌধুরী ছাড়া আপনার সামসময়িক নেতাদের মধ্যে আর তেমন কাউকে দেখি না। প্রথম কথা হলো, আপনি একজন দলীয় নেতার অবস্থান থেকে কথা বলবেন না।

www.pathagar.org

আপনি কথা বলবেন, জাতির একজন অভিভাবক হিসেবে। আওয়ামী লীগসহ কোনো দলের বা নেতার সমালোচনা করে কোনো কথা বলবেন না। আপনি অনেক অভিজ্ঞ এবং জাতির ঐক্যের জন্য কোন কথাটা বলতে হবে, তা আপনি আমাদের চেয়ে অনেক ভালো বোঝেন এবং জানেন। আপনার বক্তব্যটা এমন হবে, কেউ তা শুনলে গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন যে, তিনি যথার্থ কথাটাই বলেছেন। জামায়াতের ১৯৭১ সালের ভূমিকা নিয়ে যেহেতু একতরফা মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই এই সভায় প্রদত্ত বক্তব্যের মাধ্যমে তা নিরসন করার যথাসম্ভব চেষ্টা চালাতে হবে। এজন্য আমি মনে করি, আপনার বক্তব্যের শুরুতেই আপনি মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। এরপর আপনি শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীর নাম উল্লেখ করে তাদের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা জানাবেন। এই সভায় সরকারের সমালোচনা বা সরকারের প্রতি কোনো প্রকার ক্ষোভ প্রকাশ করবেন না। আপনি বলে থাকেন, গণতন্ত্র ও ইসলামী আদর্শই এই দেশকে ঐক্য, উন্নয়ন ও মর্যাদার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এ কথাটি এ সভায় আবার বলবেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও সম্মিলিতভাবে দেশ গড়ার আহ্বান জানাবেন আপনি। মুক্তিযুদ্ধকালে জামায়াতের ভূমিকায় কেউ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন, তাহলে এজন্য আপনি জামায়াতের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন।'

আমার বক্তব্য শেষে তিনি বললেন—'পরামর্শগুলো আমার পছন্দ হয়েছে। তবে আমি আরেকটা নাম যোগ করতে চাই নেতাদের নামের সাথে। তিনি হলেন একজন আলেম মাওলানা আতাহার আলী। কারণ, তিনি যুক্তফ্রন্টের একজন প্রধান নেতা ছিলেন।'

অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলীসহ আরও কয়েকজন খুব জোরদারভাবে আমার বক্তব্য সমর্থন করলেন। অধ্যাপক সাহেব বললেন—'অত কথা আমার মনে থাকবে না, তুমি ওসব লিখিতভাবে আমাকে দাও।'

বৈঠক শেষেই আমি তা লিখিতভাবে বক্তব্যের আকারে সাজিয়ে অধ্যাপক সাহেবকে দিয়েছিলাম। পরদিন বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটের উত্তাল

www.pathagar.org

সমাবেশে সবার পরামর্শ ও তার চিন্তার আলোকে অধ্যাপক গোলাম আযমের জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি দিলেন। এটি ছিল মাত্র ২০ মিনিটের একটি ভাষণ। আমার সব পরামর্শই তিনি তার বক্তব্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। একটি অভিভাবকসুলভ রাষ্ট্রনেতার মতো তার এই ভাষণ সকল মহলে সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছিল।

(শনিবার, রাত ১২:০০ টা; ৫ অক্টোবর, ২০১৩)

www.pathagar.org

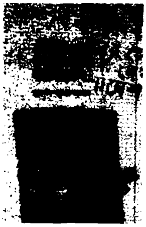

কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নতুন করে শুরু

একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদে পাশ করার সময় জামায়াতে ইসলামী প্রধান দুই দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগের কাছে অনুরোধ করেছিল, এই সংশোধনীতে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। কিন্তু এতে কোনো দলই তখন সম্মত হয়নি। জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এ সম্পর্কে বেসরকারি সদস্য হিসেবে একটি বিলও জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন। এর কোনো অগ্রগতি পরে হয়নি। তবে জামায়াত অব্যাহতভাবেই এ দাবি করে যাচ্ছিল যে, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য সাংবিধানিকভাবেই কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন হওয়া উচিত। অবশ্য তিন জোট তাদের সম্মিলিত ঘোষণায় তিনটি নির্বাচন কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার করেছিল।

একপর্যায়ে মাগুরা থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের একজন অত্যন্ত সক্রিয় সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামানের ইন্তেকালে তার আসনটি খালি হয়। জাতীয় সংসদে যেসব সদস্য খুবই সক্রিয় ছিলেন, আসাদুজ্জামান তাদের মধ্যে অন্যতম। ওই আসনের উপনির্বাচনে বিএনপি একজন ব্যবসায়ীকে মনোনয়ন দেয় এবং আওয়ামী লীগ আসাদুজ্জামান সাহেবের ছেলেকে মনোনয়ন দেয়। ঐতিহাসিকভাবেই আসনটি ছিল আওয়ামী লীগের এবং আসাদুজ্জামন বারবার সেখান থেকে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু এক রহস্যজনক কারণে আসনটি যেকোনো মূল্যে জয়লাভ করার জন্য বিএনপি মরিয়া হয়ে ওঠে। ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়। সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করা হয়।

১৯৯১ সালে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। মাগুরার উপনির্বাচনে তিনি উপস্থিত থাকতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সার্কিট হাউজে

www.pathagar.org

গিয়ে অবস্থান করার জন্য কোনো স্থান না পেয়ে ঢাকার ফেরত এসেছিলেন। তিনি পারতেন নির্বাচন অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে। যেকোনো কারণে সে রকম একটি শক্ত অবস্থান তিনি নিতে পারেননি। ফলে কারচুপির নির্বাচন হওয়ায় তার ব্যক্তিত্ব ও নির্বাচন কমিশনের যেমন ক্ষতি হলো, তার চাইতেও বেশি কলঙ্কের দাগ লেগে গেল বিএনপি সরকারের ওপর। অথচ জাতির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো চমৎকার একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়েই বিএনপি বিজয়ী হয়ে এবং জামায়াতের সমর্থনে সরকার গঠন করেছিল।

আওয়ামী লীগ ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপির হাতে পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পারেনি। তখনই শেখ হাসিনা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল, নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে। মাগুরার উপনির্বাচনের প্রকাশ্য জালিয়াতি আওয়ামী লীগের হাতে একটি জোরালো ইস্যু তুলে দিলো। উপনির্বাচনে কারচুপির ইস্যুটা আওয়ামী লীগ পুরোপুরি গ্রহণ করল। বিএনপি অনেকটা বোকামি করেই একটি মারাত্মক ইস্যু আওয়ামী লীগের হাতে তুলে দিয়েছিল দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী করে আনার জন্য, অথচ এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। আওয়ামী লীগের আসন সুষ্ঠু নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিজয় হলে তা সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের অনাস্থা বলে চালানোর কোনো সুযোগ ছিল না। বিএনপির ভুলের কারণে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার একটি ইস্যু পেয়ে যায়।

ওদিকে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ইস্যু ও বিএনপি সরকার কর্তৃক তাকে গ্রেফতার এবং তথাকথিত ঘাদানি কমিটির জামায়াতবিরোধী হিংসাত্মক আন্দোলন, গণ-আদালতের মাধ্যমে সংবিধান ও বিচারব্যবস্থাকে লঙ্ঘন করে রাজপথে বিচার অনুষ্ঠানের প্রহসন এবং এসবের পেছনে সরকারের একটি মহলের গোপন হাত ছিল বলে জামায়াতের সংশয় ইত্যাদি কারণে বিএনপি সরকারের সাথে জামায়াতের একটি দূরত্ব তৈরি হয়েছিল।

আরও কারণ ছিল এ দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের আগে বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে একটি নির্বাচনী সমঝোতায় উদ্যোগ বিএনপির কারণে ব্যর্থ হয়ে যায়। বিএনপির তদানীন্তন মহাসচিব কর্নেল মুস্তাফিজুর রহমান জামায়াতকে ৫০টি আসন ছেড়ে দিতে রাজি হন। জামায়াত তাতে সম্মতি দিয়ে আরও ২৫টি আসনের দাবি করে এবং তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে ২৫টি আসন খোলা রেখে তাতে উভয় দলের প্রার্থী রেখে নির্বাচন

www.pathagar.org

অনুষ্ঠানের একটি সমঝোতা হয়। অর্থাৎ, ৫০টি আসন বিএনপি জামায়াতের তালিকা অনুযায়ী ছেড়ে দেবে এবং এসব আসনে জামায়াত প্রার্থীকে সমর্থন দেবে। ২৫টি আসনে সমঝোতার ভিত্তিতে উভয় দলের প্রার্থী থাকবেন। বাকি ২২৫টি আসনই জামায়াত বিএনপির সমর্থনে ছেড়ে দেবে এবং ওইসব আসনে বিএনপি প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার জন্য কাজ করবে ও ভোট দেবে। পরে জানা গেল, কর্নেল মুস্তাফিজ কেন এমন প্রস্তাবে জামায়াতের সাথে রাজি হলেন, এজন্য বিএনপির কয়েকজন হঠকারী নেতা তার সাথে অশোভন আচরণ করেন এবং এমন সমঝোতার কোনো প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেন।

আগের দিন জামায়াতের সাথে কর্নেল মুস্তাফিজের যেসব বিষয়ে ঐকমত্য হয় এবং জামায়াত যে ২৫টি আসন সম্পর্কে প্রস্তাব দিয়েছিল, সে সম্পর্কে কথা ছিল দলের নেত্রী ও দলের মতামত নিয়ে পরদিন সন্ধ্যায় জামায়াত কার্যালয়ে এসে জামায়াত নেতৃবৃন্দের সাথে রাতের খাবার খাবেন। কিন্তু হতবাক করে দিয়ে জামায়াতকে জানানো হয়—কর্নেল মুস্তাফিজ অসুস্থ, হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, কাজেই আজকের কর্মসূচি হচ্ছে না। এই খবরের মাধ্যমে মূলত আমরা বিএনপির নেতিবাচক মনোভাবের বার্তাটি পেয়ে গেলাম।

আসলে জামায়াতকে বিএনপির কতিপয় নেতা খুব বেশি অবমূল্যায়ন করে কার্যত বিএনপিরই ক্ষতি করেন। শুধু তা-ই নয়, সেদিন যদি বিএনপি-জামায়াত সমঝোতা হতো, তাহলে রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে কোণঠাসা করে দেওয়া সম্ভব হতো। সমঝোতা ভেঙে যাওয়ায় জামায়াত সকল আসনে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ২৮২টি আসনে শেষ পর্যন্ত প্রার্থী মনোনয়ন দান করে। জীবনে কোনো দিন নির্বাচনের চিন্তা করেননি, এমন প্রার্থীকেও জামায়াত নির্বাচনের মধ্যে ঠেলে দেয়।

রাজনৈতিক বিবেচনায় জামায়াতের এই সিদ্ধান্ত কতটুকু সঠিক বা দূরদৃষ্টির পরিচায়ক ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ রয়েছে। এত বিপুলসংখ্যক আসনে নির্বাচন করার অভিজ্ঞতা বা আর্থিক সক্ষমতাও জামায়াতের ছিল না। ওই নির্বাচনে জামায়াতের কারও সাথে কোনো ধরনের সমঝোতা ছাড়াই ১৮টি আসনে বিজয়ী হন জামায়াত প্রার্থীগণ। ৩৫টি আসনে দ্বিতীয় স্থান বা নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জামায়াত প্রার্থীগণ। অধিকাংশ আসনেই তৃতীয় বা চতুর্থ হন এবং বেশ কিছু আসনে জামায়াত প্রার্থীরা অনুল্লেখযোগ্য ভোট পান বা জামানত হারান।

www.pathagar.org

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায়, ৫৭টি আসনে বিএনপি ও জামায়াত প্রার্থীগণ ২৫০০ থেকে কম ভোটে অর্থাৎ খুব অল্প ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের কাছে পরাজিত হন। অর্থাৎ, জামায়াত-বিএনপি যদি সমঝোতা হতো, তাহলে ১৯৯১ সালের সেই নির্বাচনে এই জোট তিন-চতুর্থাংশের বেশি আসন লাভ করতে পারত। জামায়াত প্রাপ্ত ভোটের ১২.১১% শতাংশ লাভ করে ভোট প্রাপ্তির দিক থেকে তৃতীয় দল হলেও আসন পায় ১৮টি। আর ৮.১২% ভাগ ভোট পেয়ে জাতীয় পার্টি লাভ করে ৩৫টি আসন, যা ছিল একটি চমক। এরশাদ সাহেব পাঁচটি আসনেই বিজয়ী হয়েছিলেন। অবশ্য বেগম খালেদা জিয়াও পাঁচটি আসনে এবং শেখ হাসিনা তিনটি আসনে জয়লাভ করেন।

(রবিবার, সকাল ১১:০০ টা; ৬ অক্টোবর, ২০১৩)

www.pathagar.org

মাগুরা উপনির্বাচনের পর
আওয়ামী লীগ, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির যুগপৎ আন্দোলন

মাগুরা উপনির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ কেয়ারটেকার ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুভব করে। ফলে জামায়াত ও জাতীয় পার্টির সাথে আওয়ামী লীগের একটি যুগপৎ আন্দোলনের সমঝোতা হয়ে যায়। তখনকার বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সংসদীয় কার্যালয়ে এ নিয়ে অনেক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসব বৈঠকে তিন দলের লিয়াজোঁ কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত থাকতেন। জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটির সদস্য হিসেবে প্রতিটি বৈঠকেই মুজাহিদ ভাই ও আমি উপস্থিত থাকতাম। এরপর শুরু হয় যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচি।

কর্মসূচি ঠিক করার জন্য নিয়মিত বৈঠক হতে থাকে আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা আবদুস সামাদ আজাদের কলাবাগানের বাসভবনে। এসব বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আবদুস সামাদ আজাদ ছাড়াও নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন তোফায়েল আহমদ, মুহাম্মদ নাসিম ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। জামায়াতের পক্ষ থেকে মুজাহিদ ভাই, আবদুল কাদের মোল্লা ও আমি উপস্থিত থাকতাম। জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও কাজী জাফর আহমদ থাকতেন।

১৯৯৪ সাল থেকে শুরু হয়ে ৯৫ ও ৯৬ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে বিক্ষোভ, মহাসমাবেশ ও হরতাল। প্রথমে ১ দিনের হরতাল, পরে ২৪ ঘণ্টা, ৩৬ ঘণ্টা, ৪৮ ঘণ্টা, ৬৪ ঘণ্টা এবং ৯৬ ঘণ্টা পর্যন্ত হরতালের কর্মসূচি পালিত হতে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে, জামায়াতের সমর্থনে সরকার গঠনের পর বিএনপি জামায়াতকে কাছে টানার কোনো চেষ্টাই করেনি। এদিকে আওয়ামী লীগের সাথে জামায়াতের আন্দোলন করাকে আওয়ামীবিরোধী মহল মোটেও ভালোভাবে নেয়নি। বিএনপি ও বিএনপিপন্থি বুদ্ধিজীবী মহলও এটাকে

www.pathagar.org

জামায়াতের সুবিধাবাদী নীতি হিসেবে গণ্য করে। জামায়াত মূলত কেয়ারটেকার ইস্যুর কারণেই এই যুগপৎ আন্দোলনে অংশ নেয়। জামায়াত পাকিস্তান আমলেও আওয়ামী লীগের সাথে পিডিএম ও ডাক (ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি) গঠন করে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলন করেছে। যদিও-বা সেসব আন্দোলনের ফসল আওয়ামী লীগ এককভাবে ভোগ করেছে এবং আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে এসে অন্যদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। এসব নেতিবাচক তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও জামায়াত আওয়ামী লীগের সাথে যুগপৎ আন্দোলন করার ঝুঁকি নেয়।

এ কথা সত্য যে, আওয়ামী লীগের সাথে বিএনপির সরকার পতনের আন্দোলনে জামায়াতের অংশ নেওয়াকে সাধারণ ভোটাররা, এমনকি জামায়াতের অনেক নীরব ভোটাররাও ভালোভাবে নেয়নি। অনেকে এটাকে জামায়াতের রাজনৈতিক বোকামি বা নীতিভ্রষ্টতা বলেও আখ্যায়িত করেছেন। জামায়াত কেন তার আজন্ম শত্রু আওয়ামী লীগের সাথে মিলে বিএনপি সরকারের বিরোধিতা করছে, এটাকে অনেক বড়ো করে দেখা হয়েছে।

জামায়াতের সমর্থন নিয়ে বিএনপি সরকার গঠনের পর অধ্যাপক গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব না দিয়ে বা বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি না করে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলনের সুযোগ করে দেওয়া, গণ-আদালতে অধ্যাপক আযমের ফাঁসির আদেশ দিয়ে সংবিধান ও আইনের শাসন লঙ্ঘন করার পরও কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া এবং উপরন্তু অধ্যাপক আযমকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে বিএনপির কোনো সমালোচনা বিএনপিসমর্থক বুদ্ধিজীবী মহল করেনি। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগের সাথে কেয়ারটেকার আন্দোলন করায় আওয়ামী লীগ বিএনপির বিরুদ্ধে আন্দোলন করার সুযোগ পেয়েছে। আর এজন্য জামায়াতই দায়ী বলে অনেকে মন্তব্য করে। বলা হয়েছে, জামায়াত নিজের পায়ে কুড়াল মেরে আওয়ামী লীগকে সুযোগ করে দিয়েছে।

যাহোক, এই আন্দোলনের ১৭৩ দিবস হরতাল পালন, মহাসমাবেশ, অবস্থান কর্মসূচি ইত্যাদির পর আওয়ামী লীগ, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির সাংসদগণ একযোগে পদত্যাগ করেন। এ সময় একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য আন্তর্জাতিক মহলও অনেক চেষ্টা করে। কমনওয়েলথ মহাসচিব স্যার নিনিয়ান আসেন এবং উভয় পক্ষের সাথে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর তিনি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। তখন প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল,

www.pathagar.org

সরকার থেকে পাঁচজন ও বিরোধী দল থেকে পাঁচজন করে নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে নির্বাচন করার জন্য। কিন্তু বিএনপি তা মেনে নেয়নি।

নিরপেক্ষ কেয়ারটেকার সরকার সম্পর্কে তখনকার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন—'শিশু ও পাগল ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নন।' বিএনপির সাথে মেয়াদের শেষ দিকে এসে জামায়াতের যোগাযোগ হয়। জামায়াত সংঘাতের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য কেয়ারটেকার সরকারের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য বিএনপির প্রতি আহ্বান জানায়। আর বিএনপিকে এ কথাও জানানো হয় যে, কেয়ারটেকার সরকারের দাবি মেনে নেওয়ার ঘোষণা দিলেই জামায়াত নির্বাচনে যাবে। দাবি না মানা পর্যন্ত বিএনপির অধীনে কোনো নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল আওয়ামী লীগ, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির।

বিএনপির মহাসচিব আবদুস সালাম তালুকদার জানিয়েছিলেন, রাত ১০টার আগেই কেয়ারটেকার সরকার মেনে নেওয়ার একটি ঘোষণা আসবে। জামায়াত কর্মপরিষদের বৈঠক ডেকে বিএনপির সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করে। বিএনপি কেয়ারটেকার ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেওয়ায় সাথে সাথেই ত্বরিত গতিতে জামায়াত যদি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, তাহলে দেশের রাজনীতিতে এক বিরাট ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হবে। তখন আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টিরও নির্বাচনে আসা ছাড়া বিকল্প থাকবে না। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বিএনপির কাছ থেকে রাত দশটা বাজার পরও আর ফোন এলো না। অন্যদিকে বিএনপি ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিলো।

উল্লেখ্য, শেষ মুহূর্তে এসে জামায়াত আন্তরিকভাবেই বিএনপিকে সাহায্য করতে চেয়েছিল। জামায়াতের ধারণা ছিল, বিএনপির বিরুদ্ধে আন্দোলনটা মূলত রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের আন্দোলন। এ আন্দোলনে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা তেমন জোরালোভাবে ছিল না। কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে হয়তো-বা আবারও বিএনপিই ক্ষমতায় আসবে। জনগণের মধ্যে আওয়ামী লীগ সম্পর্কে আতঙ্ক তখনও দূর হয়নি। বিএনপি যদি সে সময় রাজনীতিটা ইতিবাচকভাবে করত, কিছু ছাড় দিয়ে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি মেনে নিত, তাহলে ইতিহাস ভিন্নতর হতে পারত।

www.pathagar.org

১৫ ফেব্রুয়ারি দেশের সকল প্রধান দলের বর্জনের মধ্য দিয়ে ফ্রিডম পার্টি ও কতিপয় নামসর্বস্ব দলকে নিয়ে বিএনপি ভোটারবিহীন একটি হাস্যকর নির্বাচন করে, যা মোটেই গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন যে কোনো গ্রহণযোগ্যতা পায়নি, তা বিএনপিও বুঝতে পেরেছিল। প্রহসনের নির্বাচনে গঠিত সংসদের অধিবেশন ডেকে অতি দ্রুততার সাথে বিএনপি সেই সংসদে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল পাশ করে। এই বিল পাশ করার পর সংবিধান অনুযায়ী সদ্যবিদায়ী প্রধান বিচারপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে করে বিএনপি। কথায় বলে—'সময়ের এক ফোঁড় আর অসময়ের দশ ফোঁড়।' বিএনপি যদি আগেই দাবিটি মেনে নিত, তাহলে কত ভালো হতো।

যেদিন ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেওয়া হলো, সেদিনও হরতাল চলছিল। মিন্টো রোডের যে বাড়িতে সাবেক প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান থাকতেন, বিকালে মগবাজার থেকে অধ্যাপক গোলাম আযমের নেতৃত্বে আমরা কয়েকটি রিকশায় করে সেখানে গেলাম। বিচারপতি হাবিবুর রহমান আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন। তার বৈঠকখানায় বেশ আন্তরিকতাপূর্ণ আলোচনা হলো। তিনি কেয়ারটেকার ফরমুলা দেওয়ার জন্য অধ্যাপক গোলাম আযমকে অনেক ধন্যবাদ জানালেন এবং বললেন—'রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আপনিই সর্বাগ্রে এই তত্ত্বটির কথা বলেছেন।' তিনি জামায়াতকে আশ্বস্ত করলেন যে, তার ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও যথাযথভাবে পালন করবেন। তিনি এটাও বললেন—'আপনাদের পক্ষ থেকে যেকোনো পরামর্শ থাকলে আমাকে জানাবেন।' অধ্যাপক গোলাম আযম আমাকে দেখিয়ে বললেন—'যেকোনো ব্যাপারে প্রয়োজন মনে করলে ওকে পাঠাব। আপনি তার কাছে আপনার কোনো বার্তা থাকলে দেবেন। আপনার শপথ হওয়ার পর তো আনুষ্ঠানিকভাবে আশা করি আবারও কথাবার্তা হবে।' বিচারপতি হাবিবুর রহমান সাহেব বললেন—'অবশ্যই। আমি সব দলের নেতাদের সাথে কথা বলেই কাজ করব।'

বিচারপতি হাবিবুর রহমান আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব গ্রহণের আগে অধ্যাপক আযমের পক্ষ থেকে উপদেষ্টা পরিষদের ব্যাপারে জামায়াতের পরামর্শ-সংবলিত একটি চিঠি নিয়ে মিন্টো রোডের বাসায় গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম, তিনি শর্ট পরে জগিং করছেন। আমি বৈঠকখানায় বসার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি এলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। আমি কাগজটি তার কাছে হস্তান্তর করলাম।

www.pathagar.org

তিনি যেহেতু জগিং করছিলেন, তাই আমি নিজে থেকেই সংক্ষিপ্ত কথা সেরেই বিদায় চাইলাম। তিনি অধ্যাপক সাহেবকে সালাম জানাতে বললেন এবং বিদায় নেওয়ার সময় আবার বললেন—'প্রয়োজনে যেকোনো সময় আসবে। তোমার নাম গেটে বলা আছে, কোনো অসুবিধা নেই।'

প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিচারপতি হাবিবুর রহমানের সাথে জামায়াত নেতাদের সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়। সেদিনও তিনি বলেন—'কেয়ারটেকার সরকারের যে তত্ত্ব আপনি দিয়েছেন, এখন তো বাইরের দেশ থেকেও অনেকে এ ব্যাপারে আগ্রহী হবেন এবং আপনার কাছে আসবেন এ সম্পর্কে জানতে।' অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবকে লক্ষ্য করে তিনি এসব কথা বলেন।

(সোমবার রাত ১১:০০ টা; ৭ অক্টোবর ২০১৩)

www.pathagar.org

জেনারেল নাসিমের ব্যর্থ অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা

রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস ব্রিগেডিয়ার হেলাল মোর্শেদসহ কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করেন। বিষয়টি সেনাবাহিনীপ্রধান নাসিম জানতেন না। বিষয়টি শোনার পর তিনি ক্ষুব্ধ হন। তার ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ এবং তাকে না জানিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার ব্যাপারটি তিনি মেনে নিতে পারেননি। কতিপয় ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে তিনি রাষ্ট্রীয় আদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তারপর সরকারকে অপসারণ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণে বিভিন্ন সেনানিবাসে তার ঘনিষ্ঠদের বার্তা পাঠান। এ সম্পর্কে মেজর জেনারেল সৈয়দ ইবরাহিমসহ অনেকেই লিখেছেন। তাই সে ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু লিখছি না।

সেনাপ্রধানের পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে পেরে রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস সর্বাধিনায়ক হিসেবে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ত্বরিত পদক্ষেপ নেন এবং জেনারেল নাসিমকে সেনাপ্রধানের পদ থেকে অপসারণ করেন। এদিকে ময়মনসিংহ থেকে সেনাবাহিনীর যে অংশটি বিদ্রোহ করে ঢাকার দিকে অগ্রসর হয়, সাভারের নবম ডিভিশন তাদের প্রতিহত করে।

জেনারেল নাসিমের ক্যু-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে মেজর জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান, মেজর জেনারেল আবদুল মতিন, বিগ্রেডিয়ার আবদুর রহীম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যশোরের জিওসি সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমও সেনাপ্রধানের আনুগত্য করার জন্য কিছু সৈন্য নিয়ে রওনা করেছিলেন বলে জানা যায়। অবশ্য অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে এ কাজটা করে সৈয়দ ইবরাহিম বড়ো ভুল করেন। কারণ, এই মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তার সেনাপ্রধান হওয়ার যে বিরাট সম্ভাবনা ছিল, এই ভুল পদক্ষেপের কারণে তার ক্যারিয়ার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

www.pathagar.org

রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস লে. জেনারেল মাহবুবুর রহমানকে নতুন সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন। উল্লেখ্য যে, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আকস্মিকভাবে লে. জে. নুরুদ্দীন খানকে সেনাবাহিনী থেকে বিদায় দিয়েছিলেন। তিনি এত অল্প সময়ে এ কাজটি করেন যে, জেনারেল নুরুদ্দীন খান সেনানিবাসগুলোতে নিয়মমাফিক বিদায় সংবর্ধনাও নিতে পারেননি। নুরুদ্দীন খানকে Extension দেওয়া হবে, এটাই ছিল সবার ধারণা।

অবসর নেওয়ার পর আমি আবদুল কাদের মোল্লাকে সাথে নিয়ে সেনানিবাসের যে বাড়িতে তিনি ছিলেন, সেখানে আলাপ করতে গিয়েছিলাম। সেদিন তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন—'আমার মেয়াদ শেষ হওয়ার মাত্র কয়েক দিন আগে ম্যাডাম এভাবে আমাকে বিদায় দেবেন, তা আমি ভাবতেই পারিনি!' সেদিন রাজনীতি নিয়ে তার সাথে অনেক কথা হলো। তিনি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অন্যতম কৃতী অফিসার ব্রিগেডিয়ার আমান আযমীর পিতা হিসেবে অধ্যাপক গোলাম আযমকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। অধ্যাপক সাহেবও তাকে পছন্দ করতেন। আমাদের কাছে তিনি নুরুদ্দীন খানকে একটি বার্তা পৌঁছাতে বলেছিলেন। তার বার্তাটি ছিল—নুরুদ্দীন খান যেন কোনো রাজনৈতিক দলে যোগদান না করেন। একজন নির্দলীয় লোক হিসেবে তিনি দেশের অনেক বেশি খেদমত করতে পারবেন। আমরা অবশ্য কথাটা একটু অন্যভাবে পেশ করলাম। আমরা বললাম—'আপনার মতো একজন নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক ব্যক্তি জামায়াতে এলে আমরা খুশি হব। তবে অধ্যাপক আযম চান, আপনি সরাসরি রাজনৈতিক দলে না গিয়ে নির্দলীয় ব্যক্তি হিসেবে কাজ করুন।' অধ্যাপক সাহেবের বার্তাটি আমরা পৌঁছানোর পর তিনি আমাদের ধন্যবাদ জানালেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, যখন জেনারেল নাসিমকে সেনাপ্রধান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন অনেকেই আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া জেনারেল নাসিমকেই সেনাপ্রধান নিয়োগ দেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটা বোধহয় প্রথম যে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে আবদুর রহমান বিশ্বাস সেনাপ্রধানকে চাকরি থেকে অপসারিত করেন। অর্থাৎ, একজন বেসামরিক রাষ্ট্রপতি এবং যিনি অমুক্তিযোদ্ধা, তিনি একজন নামকরা মুক্তিযোদ্ধা সেনাপ্রধানকে তার পদ থেকে অপসারিত করার মতো সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির এই সিদ্ধান্তের সাথে একমত ছিলেন না। কিন্তু আবদুর রহমান বিশ্বাস অনুগত

www.pathagar.org

সেনা কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্ষম হন এবং সঠিক সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সমর্থ হন। আমার ব্যক্তিগত বিবেচনায় আবদুর রহমান বিশ্বাস সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হিসেবে একটি সাহসী পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে দেশকে বিরাট সংকট থেকে বাঁচিয়েছিলেন। এজন্য তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় যে, লে. জে. নুরুদ্দীন খান বিএনপি থেকেই নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিএনপি তাকে মনোনয়নের আশ্বাস না দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত তিনি আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচন করেন। সত্যি কথা বলতে কী, নুরুদ্দীন খান কতটা আওয়ামী লীগের হতে পেরেছেন, তা আমার ধারণা নেই। তবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনেক সময় দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। আমার সাথে তিনি বরাবরই বন্ধুত্বপূর্ণ ও আন্তরিক ব্যবহার করেছেন। নির্বাচন অভিযানের সময় মারাত্মকভাবে তিনি আহত হন এবং নির্বাচনে বিজয়ী হন। পরবর্তী সময়ে অবশ্য তিনি রাজনীতিতে অনেকটাই নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বরাবর তাকে আমার একজন জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক মানুষ বলে মনে হয়েছে।

১৯৯৬ সালের নির্বাচন :
২১ বছর পর ক্ষমতায় ফিরে এলো আওয়ামী লীগ

১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ভোটারবিহীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে বিএনপি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। আন্দোলনের ফসল হিসেবেই বিএনপি কেয়ারটেকার সরকারের দাবি মেনে নেওয়ায় আওয়ামী লীগ অনেক কনফিডেন্ট ছিল। প্রধান সব কটি দলই এককভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনের ইস্যু নিয়ে দিনরাত অনেক বৈঠক ও যাচাই-বাছাই করে। এসব বৈঠকে যে পর্যালোচনা হাজির হয়, তার সারসংক্ষেপ হলো—কোনো না কোনো সময় জামায়াতকে তো তিনশত আসনে নির্বাচন করতেই হবে। যে দল সব আসনে নির্বাচন করতে পারে না, দেশের জনগণ সেই দলকে এক বা দুই নম্বর দল হিসেবে কিংবা অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী দল হিসেবে ভোট দেবে কেন!

www.pathagar.org

তা ছাড়া জামায়াতের যে ব্র্যান্ড স্লোগান—'আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন'-এর প্রতি দেশের জনগণের কতটা সমর্থন আছে, তাও যাচাই হওয়া উচিত। দলকে নির্বাচনমুখী করতে হলে সারা দেশেই সকল নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থী ও কর্মী তৈরি করা উচিত। অনেক এলাকা আছে, যেখানে জামায়াত কোনো দিন নির্বাচন করেনি এবং জামায়াতের নেতাকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা জামায়াতকে ভোট দেওয়ার কোনো সুযোগ পাননি। দীর্ঘদিন থেকেই জামায়াত ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে আন্দোলন করে আসছে এবং নির্বাচন ও শান্তিপূর্ণ পন্থায় জামায়াত দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিতে চায়। সুতরাং, জামায়াতের জাতীয় নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নেওয়া উচিত। নির্বাচন করলে তবেই নির্বাচনের অভিজ্ঞতা হবে। নির্বাচনের অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজনেও নির্বাচন করা উচিত। তা ছাড়া কোনো দিক থেকে নির্বাচনী সমঝোতার কোনো প্রস্তাবও আসেনি।

জামায়াত আন্দোলনে, সংগ্রামে, রাজপথে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। দেশের মানুষ জামায়াতকে কীভাবে মূল্যায়ন করে, তারও একটি পরীক্ষা হয়ে যাওয়া উচিত। কোনো কোনো এলাকায় জামায়াতের সংগঠন বেশ ভালো এবং কোনো কোনো এলাকায় বেশ জনসমর্থনের কথাও জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার অনেক সদস্য দাবি করেন। জামায়াতের সংগঠন আছে, কর্মী আছে আর অনেকে তো স্বতন্ত্র নির্বাচন করেও বিজয় লাভ করে থাকেন। তাহলে জামায়াত কেন নির্বাচনে ভালো করতে পারবে না?

জামায়াতের দলীয় প্রার্থীদের অধিকাংশেরই নির্বাচনে অর্থ ব্যয় করার সামর্থ্য নেই। সাধারণত গরিব, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত লোকদের সমাবেশ ঘটেছে জামায়াতে। উচ্চবিত্ত বা অর্থসম্পদের মালিকরা জামায়াতে ইসলামীতে নেই বললেই চলে। অনেকে বললেন—তাতে কী আসে যায়! আমার সারা দেশ থেকে কর্মীদের জামায়াতের নির্বাচনী ফান্ডে সাহায্য দিতে বলব। বলা হলো—'ভোট চাই, নোটও চাই'—এই আবেদন জানানো হবে। জামায়াতের সদস্যদের বেশি পরিমাণ আর্থিক কুরবানি দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হবে। এতে তহবিল গঠন যে ভালোই হয়েছিল, তাও স্বীকার করতে হবে। তিনশত আসনের কথা শুনে সারা দেশের কর্মী-সমর্থকরা বেশ উজ্জীবিত হন এবং তারা জামায়াতের নির্বাচনী তহবিলে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থ দান করেন। যাহোক, ব্যাপক মতবিনিময় ও আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে এবং পরামর্শ করেই কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা ঘোষণা করে।

www.pathagar.org

অন্যান্য দল যে অর্থে নির্বাচনমুখী দল, জামায়াত সে অর্থে নির্বাচনমুখী দল নয়। জামায়াতে নেতাকর্মীদের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা অনেক কম। জামায়াতের অনেক নেতা আছেন, যাদের নির্বাচনী রাজনীতিক অভিজ্ঞতা অন্য দলের মতো নেই। অন্যান্য দলের নেতারা নিজস্ব উদ্যোগে নির্বাচনের জন্য কাজ করেন এবং একাধিক ব্যক্তি মনোনয়নের আশায় একটি নির্বাচন শেষ হওয়ার পর থেকেই মূলত কাজ শুরু করে। নির্বাচনই ওইসব দলের একমাত্র কাজ বা প্রধান কাজ। পক্ষান্তরে জামায়াতের সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী আসনে নিজ উদ্যোগে নির্বাচনের কথা চিন্তাও করতে পারেন না। কেন্দ্রীয় সংগঠনের সিদ্ধান্ত ছাড়া কেউ নিজে থেকে নির্বাচনের আগ্রহ প্রকাশ করলে বা সে উদ্দেশ্যে কোনো তৎপরতা চালালে তাকে জামায়াতের পক্ষ থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য অযোগ্য মনে করা হয়।

সাধারণত জামায়াত ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার, কর্মী গঠন, সংগঠন গড়ে তোলা, ইসলামের কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার পক্ষে জনমত গঠন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে সারা বছরব্যাপী। যারা জামায়াতের সংগঠনে শামিল হন, তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়ার জন্য কুরআন-হাদিস তথা ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন, পাঠচক্র, শিক্ষা বৈঠক ইত্যাদি কার্যক্রম নিয়েই জামায়াতের ইউনিট পর্যায়ে বা তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করতে হয় নিয়মিত। দেশের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হয় এবং দলের পক্ষ থেকে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি দেওয়া হলে তা নিষ্ঠার সাথে সাধ্যমতো বাস্তবায়ন করে জামায়াতের শাখা সংগঠনগুলো। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে জামায়াতের নেতাকর্মীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে বা নিজেকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা নিয়ে তেমন কোনো চিন্তা করেন না। এ রকম একটা প্রেক্ষাপটে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জামায়াতের ৩০০ আসনে অংশগ্রহণটা ছিল একটি বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত।

এজন্য সংগঠনকে নির্বাচনমুখী করা বা তৃণমূল পর্যায়ের নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সংগঠন ও কর্মীবাহিনীকে প্রস্তুত করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা না করেই জামায়াত ৩০০ আসনে নির্বাচন করার একটি বড়ো ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জামায়াতের অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিও তৃণমূল পর্যায় অর্থাৎ, ইউনিয়ন পরিষদ বা স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার প্রশ্নে দ্বিধাবোধ করেন। এমনকি এমন অনেককে দেখেছি, যারা মনে করেন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ না নেওয়াই ভালো। কারণ হিসেবে তারা মনে করেন যে, স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনে অংশ নিলে

www.pathagar.org

সংশ্লিষ্টরা নানা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়তে পারেন, যা দলের আদর্শিক অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। তৃণমূল পর্যায়ে অংশ না নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচনে ভালো করা কি সম্ভব? মোদ্দাকথা, নির্বাচনে ভালো করতে হলে সব পর্যায়ের নির্বাচনেই অংশ নিয়ে সংগঠনকে নির্বাচনমুখী করতে হবে এবং নির্বাচনী কর্মী তৈরি করতে হবে। এটাই বাস্তবতা। কিন্তু জামায়াত ওইসব পর্যায় অতিক্রম না করেই ৩০০ আসনে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত যে চিন্তাভাবনা থেকে নিয়েছিল, তা কতটা বাস্তবসম্মত ছিল, সে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

যাহোক, এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ খুশি হয়েছিল এজন্য যে, সমমনা বিএনপি থেকে জামায়াতকে বিচ্ছিন্ন করা গেছে। জামায়াতের ভোট যদি বিএনপির ভোটের সাথে যোগ হতো, তাহলে আওয়ামী লীগের পক্ষে অত বেশি আসন লাভ করা সম্ভব ছিল না। এ কারণেই জামায়াত যাতে নির্বিঘ্নে এককভাবে নির্বাচনী অভিযান চালাতে পারে, সেজন্য কৌশলী আওয়ামী লীগ পরিবেশও সৃষ্টি করে।

অধ্যাপক গোলাম আযম জামায়াতের আমীর হিসেবে সারা দেশে জামায়াতের প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালান। যে অধ্যাপক গোলাম আযমকে ১৯৯২ সালে গণ-আদালতে বিচার করার জন্য ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির পৃষ্ঠপোষকতা করে আওয়ামী লীগ, সেই অধ্যাপক আযমকে কোনো বাধাবিপত্তি ছাড়াই সারা দেশে নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে আওয়ামী লীগ কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি। অথচ ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও অধ্যাপক গোলাম আযম নির্বিঘ্নে কোনো জনসভা করতে পারেননি। ওই সময় তার প্রায় প্রতিটি জনসভায় আওয়ামী লীগ হামলা চালিয়েছে। এমনকি পল্টন ময়দানে জামায়াতের আয়োজিত জনসভায় হামলা চালিয়ে আওয়ামী লীগ তা পণ্ড করে দিয়েছিল। জামায়াতের তদানীন্তন আমীর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ১৯৭০ সালের ১৮ জানুয়ারি পল্টনের জনসভায় আওয়ামী লীগের হামলার কারণে ভাষণ দিতে পারেননি। আওয়ামী লীগের হামলায় জামায়াতের তিনজন কর্মী শহীদ হন এবং পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মী আহত হন।

আওয়ামী লীগ এজন্যই জামায়াতকে বিনা বাধায় সভা-সমাবেশ করতে দিয়েছে যে, জামায়াত যা ভোট টানবে, তা আওয়ামী লীগের বিজয়কেই নিশ্চিত করবে। বাস্তবে ঘটেছিলও তা-ই। ওদিকে জামায়াত বিএনপির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সাথে যুগপৎ আন্দোলন করায় যারা জামায়াতের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিল, তারা ক্ষোভে ও অভিমানে জামায়াতকে ভোট দেয়নি।

www.pathagar.org

নির্বাচন হওয়ার পর দেখা গেল, জামায়াত ১৯৯১ সালে যেসব আসন পেয়েছিল, সেই ১৮টি আসনের মধ্যে মাত্র তিনটি আসনে বিজয়ী হয় এবং দেশের অন্য কোথাও আসন লাভে ব্যর্থ হয়। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, কাজী শামসুর রহমান (সাতক্ষীরা) ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে লতিফুর রহমান তাদের আসনে পুনরায় বিজয়ী হতে সক্ষম হন।

৩০০ আসনে নির্বাচন করে মাত্র তিনটি আসন লাভের এই ফলাফল ছিল জামায়াতের জন্য একটি বড়ো ধাক্কা। আগেই উল্লেখ করেছি যে, অল্প ভোটের ব্যবধানে বিএনপি ও জামায়াত ৫৭টি আসন হারিয়েছে। জামায়াত যদি ওইসব আসনে নির্বাচন না করত বা সমঝোতা হতো, তাহলে ওইসব আসনে নিশ্চিতভাবেই জামায়াত বা বিএনপি বিজয়ী হতো। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৪৮টি এবং বিএনপি ১১৬ আসনে জয়লাভ করে। জামায়াত আলাদাভাবে সব আসনে নির্বাচন করায় খুব কম ভোটে কোথাও জামায়াত আবার কোথাও বিএনপি আসন হারায়। ফলে ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরে আসার সুযোগ পায়। প্রাপ্ত ভোটের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ৩১% এবং বিএনপি ৩০% ভোট পায়। জামায়াতের ভোট আগের বারের চাইতে কমে ৮%-এ এসে দাঁড়ায়। আনোয়ার জাহিদ এজন্য ঠাট্টা করে একদিন আমাকে বললেন—'কেয়ারটেকার সরকার, গোলাম আযম রাজাকার, জামায়াত ছারখার।'

এ নির্বাচন ছিল জামায়াতের জন্য বড়ো রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা। বিএনপি রাজনৈতিকভাবে ভুল করেছিল জামায়াতকে দূরে সরিয়ে দিয়ে। আর জামায়াতের রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশেও ভুল ছিল আওয়ামী লীগের সাথে যুগপৎ আন্দোলনে যাওয়া এবং তিনশত আসনেই নির্বাচন করা। মূলত বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে সৃষ্ট দূরত্বের সুযোগ নিয়ে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়।

১৯৯১ সালে সরকার গঠনের মতো এত বড়ো একটা ব্যাপারে জামায়াত বিএনপিকে সহযোগিতা করল কোনো বিনিময় ছাড়া। অথচ বিএনপি জামায়াতকে সাথে রাখতে পারল না। এটা নিঃসন্দেহে বিএনপির ব্যর্থতা। জামায়াতের যেটা ভুল সেটা হলো—আওয়ামী লীগের মতো একটি বিশ্বাসঘাতক দলের সাথে যুগপৎ আন্দোলন করা এবং ৩০০ আসনে নির্বাচন করে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় যাওয়ার পথ সুগম করে দেওয়া। অবশ্য আমি নিজেও আওয়ামী লীগের সাথে যুগপৎ আন্দোলনের একজন শক্ত সমর্থক ছিলাম। এটা ছিল আমার অভিজ্ঞতার অভাবজনিত ভুল।

www.pathagar.org

আওয়ামী লীগের সাথে আন্দোলন : কতিপয় ঘটনা

দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদী। আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের কথা মুখে বলে, কিন্তু গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। পাকিস্তান আমলে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন একমাত্র কনভেনশন মুসলিম লীগ ছাড়া সব দলই করেছে। আওয়ামী লীগ ও জামায়াতসহ অন্যান্য দল মিলিতভাবে কাজ করেছে, পিডিএম বা ডাকের আন্দোলনেও বিভিন্ন দল একযোগে কাজ করেছে। কিন্তু আন্দোলন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছে, তখন আওয়ামী লীগ অন্যদের উপেক্ষা করেছে। যেমন, ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলন শুরু করে পিডিএম (পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক মুভমেন্ট), আওয়ামী লীগ, জামায়াত, পিডিপি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ এসব দলের সমন্বয়ে। ডাক (ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি), আওয়ামী লীগ, জামায়াত, পিডিপি, ন্যাপ কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, নেজামে ইসলাম পার্টি প্রভৃতি দলের সমন্বয়ে ছিল। কিন্তু আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠল, তখন অন্য দলের নেতাদেরকে মঞ্চেই উঠতে দেওয়া হলো না এবং গোটা আন্দোলনের নেতৃত্ব আওয়ামী লীগ নিয়ে নিল। দুঃখজনকভাবে এ কাজটি করা হলো ছাত্রদের ব্যবহার করে।

১৯৬৯ সালের আন্দোলনে সকল দল কারাবন্দি শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি করল এবং আইয়ুব খান তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন। গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। সেই বৈঠকে মওলানা ভাসানীর দল ন্যাপ (ভাসানী) ছাড়া সব দল অংশ নিল। আইয়ুব খানের কারণে ও কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতার অনমনীয়তার কারণে বৈঠকটি ব্যর্থ হলো। কিন্তু আওয়ামী লীগের তদানীন্তন নেতা শেখ মুজিব একটি বার্তা পাঠিয়ে দিলেন—'পূর্ব পাকিস্তান থেকে যেসব নেতা গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের কারণে আইয়ুবের কাছ থেকে দাবি আদায় করা গেল না।' অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা তার বিরোধিতা করায় আইয়ুব খান তা মেনে নেননি। কিন্তু নুরুল আমিন, আবদুল সালাম খান, মৌলভী ফরিদ আহমদসহ পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা যখন লাহোর থেকে ফিরে এসে তেজগাঁও বিমানবন্দরে আগমন করেন, তখন ছাত্রদের লেলিয়ে দিয়ে বিমানবন্দরে তাদের অপদস্থ করা হয় ।

www.pathagar.org

একদিনের ঘটনা এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। আবদুস সামাদের বাসভবনে আওয়ামী লীগ, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির লিয়াজোঁ কমিটির মিটিং হচ্ছে। কেয়ারটেকার সরকারের দাবিতে তখন পর্যায়ক্রমে ৪৮, ৬৪ ও ৯৬ ঘণ্টার মতো টানা হরতাল চলছে। লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকের পর প্রতিদিন সাংবাদিকদের ব্রিফ করা হয় অথবা প্রয়োজনে প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়। অনেক সময় জামায়াত অফিসের ফ্যাক্স থেকেই পত্রিকা অফিসে ফ্যাক্স করা হতো তিন দলের লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত। প্রতিদিনের পত্রিকায় এসব খবর ছাপা হতো। অনেক সময় আমি প্রেস ব্রিফিং বা প্রেস বিজ্ঞপ্তির খসড়া তৈরি করে দিতাম এবং সব সময়ই আওয়ামী লীগ নেতা মুহাম্মদ নাসিম সাংবাদিকদের ব্রিফ করতেন। আমি তার সাথে উপস্থিত থাকতাম।

একদিন লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকের বক্তব্য পত্রিকার আট কলামে বা ছয় কলামে প্রথম পাতায় শিরোনাম হয়। ঘটনাক্রমে সেই দিনের বক্তব্য আমি ড্রাফট করে দিয়েছিলাম। বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথেই মুহাম্মদ নাসিম আমাকে অভিনন্দন জানালেন এবং বুক মেলালেন এই বলে—'ভাই, আপনাকে অভিনন্দন। গতকাল আপনি যে ড্রাফট করে দিয়েছিলেন, আজকের অধিকাংশ পত্রিকায় সেটাই প্রধান খবর হিসেবে প্রথম পাতায় শিরোনাম হয়েছে।' এ সময় সুরঞ্জিত সেন রসিকতা করে বললেন—'কামরুজ্জামান শোনেন, এখন তো নাসিম বুক মেলাচ্ছে, প্রয়োজন হলে এই বুকে ছুরি মারতেও সে দ্বিধাবোধ করবে না, মানুষ চিনলেন না!' এই বলে তিনি একটা অট্টহাসি দিলেন। তিনি আবার বললেন—'দরকার হলে সে বুক মেলায় আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে পেছনে ছুরি মারতেও সিদ্ধহস্ত।' তার এ কথা নিয়ে অনেক হাসাহাসি হলো। তখন কে জানি একজন বললেন—'সুরঞ্জিত নরমাল নাই, খাওয়াটা বোধ হয় বেশি হয়ে গিয়েছে!'

আরেক দিনের ঘটনা, তোফায়েল আহমদ বৈঠক শুরু হওয়ার আগে মুহাম্মদ নাসিমকে বললেন—'তুমি পার্টির বৈঠকে উপস্থিত থাকো না, শুধু লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠক নিয়ে ব্যস্ত। নেত্রী তোমার ওপর খুব ক্ষেপেছেন।' নাসিম সাহেব বললেন—'তার এ ব্যাপার আমার কী যায় আসে! সে প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে, আমিও প্রধানমন্ত্রীর ছেলে! আমি কি তার ধার ধারি?' তোফায়েল আহমদ এটাও বললেন—'পত্রিকায় দলের বক্তব্য পাঠালে যথাযথ গুরুত্ব দেয় না; কিন্তু লিয়াজোঁ কমিটির বক্তব্যকেই বেশি ফলাও করে। এ ব্যাপারেও নেত্রী অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, তাই তোমাকে জানালাম।'

www.pathagar.org

আরেক দিনের কথা। আবদুস সামাদ আজাদের বাসভবনে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, সাবেক স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ও শাহ এ এম এস কিবরিয়া সাহেব অপেক্ষা করছেন। যথারীতি লিয়াজোঁ কমিটির অন্য সদস্যরা চলে এলেন। বৈঠকের শুরুতেই হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বললেন—'জামায়াত নেতাদের ধন্যবাদ জানানোর জন্য আমরা এসেছি। সেদিন সিলেটের কোর্ট পয়েন্টে আমাদের সমাবেশে বিএনপির ছাত্রদলের ছেলেরা আমাদের ওপর হামলা চালালে আমাদের জীবন একরকম বিপন্ন হয়ে পড়ে। এমন সময় শিবিরের ছেলেরা এসে বিএনপির হামলাকারীদের প্রতিহত করে। ফলে আমরা প্রাণে বেঁচে যাই। শিবিরের ছেলেরা যদি তখন আমাদের সাহায্যে এগিয়ে না আসত, তাহলে আমরা প্রাণে বাঁচতাম না। এজন্য আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।' ওই দিনের বৈঠকে আওয়ামী লীগের লিয়াজোঁ কমিটির সাথে তারাও উপস্থিত ছিলেন।

অন্য আরেক দিনের ঘটনা। আমরা আবদুস সামাদ আজাদের বাসভবনে বৈঠক শুরু করেছি। এমন সময় ড. ওয়াজেদ মিয়া বৈঠকে প্রবেশ করেন। আবদুস সামাদ আজাদ বললেন—'জামাই, বসেন।' ড. ওয়াজেদ আমাদের আবদুল কাদের মোল্লার পাশে সোফায় বসেই মোল্লাকে লক্ষ করে বলা শুরু করলেন—'আপনি তো মাওলানা মানুষ। আপনিই বলুন, আট বছর যাবৎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক তা যদি না থাকে, তাহলে বিয়ে থাকে কি না?' মোল্লার লম্বা দাড়ি ও জামার কারণে ড. ওয়াজেদ তাকে মাওলানা ভেবেছেন! যদিও মোল্লা পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তার এই আকস্মিক প্রশ্নে আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিলাম। আবদুস সামাদ আজাদ বললেন—'জামাই, আপনি বাসার ভেতরে যান। আপনার জন্য আপনার চাচি পিঠা নিয়ে অপেক্ষা করবেন।' এসব বলে তিনি ড. ওয়াজেদকে ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় তিনি আবার বললেন—'আমি কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব চাই।' আরও বললেন—'আপনারা আমাকে দায়িত্ব দিন। আমি টেলিফোন করলেই বিএনপি নেত্রী ফোন ধরবেন এবং আমার সাথে কথা বলবেন।' এসব বলতে বলতে তিনি আজাদ সাহেবের সাথে ভেতরে গেলেন, মানে আজাদ সাহেব তাকে একরকম জোর করেই নিয়ে গেলেন।

সুরঞ্জিত সেন বললেন—'মনে হয় ড. সাহেব আজ একটু বেসামাল!' এ সময় আবদুস সামাদ আজাদ এসে বললেন—'আল্লাহ বাঁচাইছে! কোনোমতে সামাল দেওয়া গেছে। ওসব থাক, এখন আমরা আমাদের কাজ শুরু করি।'

www.pathagar.org

শেখ হাসিনার সাথে ড. ওয়াজেদের সম্পর্ক যে মোটেই ভালো ছিল না, এ কথা সবাই জানতেন। অনেক পারিবারিক কলহ, মারামারি ও হাতাহাতির ঘটনাও নাকি প্রায়ই ঘটত। তবে শেখ হাসিনা ধানমন্ডিতে ড. ওয়াজেদের নবনির্মিত বাড়িতেই থাকতেন। তাদের দাম্পত্য কলহ নিয়ে নানান কথা মানুষে বলাবলি করত। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর একদিন কক্সবাজার থেকে বিমানে আসার পথে কক্সবাজার বিমানবন্দরে ড. ওয়াজেদের সাথে খুব বিষণ্ন অবস্থায় আমার সাথে দেখা হলো। সেদিন স্বাভাবিক কথাবার্তা হলো এবং তাকে দেখলাম খুবই বিষণ্ন। ড. ওয়াজেদ তো আরেকটা রেকর্ড করেছেন। তিনি একসময় গিয়ে বঙ্গভবনে ওঠেন এবং প্রায় মাসখানেক সেখানেই থাকেন। বলা হয়ে থাকে, শেখ হাসিনার অত্যাচারেই নাকি ড. ওয়াজেদ বঙ্গভবনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। স্বামীর প্রতি শেখ হাসিনা যে খুব একটা যত্নবান ছিলেন না, তা অনেকেরই জানা। নানা ব্যাপারে নিত্যদিন ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত এবং প্রায়ই ওসব ঝগড়া বিব্রতকর পর্যায়ে পৌঁছে যেত।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর একদিন আবদুস সামাদ আজাদের সাথে আমার টেলিফোনে কথা হচ্ছিল। জামায়াত মাত্র তিনটি আসনে জয়লাভ করেছে বলে তিনি 'খুব দুঃখজনক' বলে মন্তব্য করলেন। তিনি বললেন—'কীভাবে যে এটা হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। এটা তো হওয়ার কথা নয়। যাহোক যোগাযোগ করবেন, কথা হবে।'

সরকার গঠনের পর থেকেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতা সংহত করার জন্য দ্রুত নানা পদক্ষেপ নিতে থাকে। এতদিন জামায়াতের সাথে যে সখ্যের সম্পর্ক ছিল, তা শেষ হয়ে যায়। আওয়ামী লীগ সরকারি ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে পর্যন্ত জামায়াতকে উপেক্ষা করতে থাকে। জামায়াত নেতাদের কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানেই আমন্ত্রণ জানানো হতো না।

(রাত ১১:০০ টা; ১২ অক্টোবর, ২০১৩)

www.pathagar.org

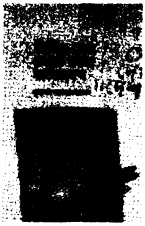

১৯৯৬ সালের নির্বাচনের বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা জামায়াতের

সত্যিকার অর্থেই ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে মাত্র তিনটি আসনে জামায়াতের প্রার্থী নির্বাচিত হওয়াটা ছিল একটি বড়ো ধরনের বিপর্যয়। ওদিকে ৩০০ আসনে নির্বাচন করতে গিয়ে জামায়াতকে বড়ো ধরনের ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছিল। নির্বাচনের পর সংগঠনকে ঋণমুক্ত করার জন্য জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম সব পর্যায়ের জামায়াতের সদস্য, সহযোগী সদস্যদের প্রতি একটি চিঠিতে আবেদন জানান। এত বড়ো বিপর্যয়ের পরও জামায়াতের জনশক্তি আমীরের আবেদনে সাড়া দিয়ে বিপুলভাবে জামায়াতের তহবিলে দান করেন। ফলে জামায়াত ঋণমুক্ত হতে সক্ষম হয়। এই ঘটনায় জামায়াত নেতৃবৃন্দ উৎসাহিত হন এবং আদর্শিক আন্দোলন হিসেবে তাদের আস্থা বৃদ্ধি পায়। কেন নির্বাচনে বিপর্যয় হলো, তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে পরবর্তী নির্বাচনের জন্য কৌশল গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় সরকারসহ সব ধরনের নির্বাচনে অংশ নিয়ে কর্মীদের জড়তা কাটাতে এবং দলকে নির্বাচনমুখী করার চিন্তাভাবনা করা হয়। সেইসাথে সম্ভাবনাময় আসনগুলোতে বিশেষভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয় এবং রাজনৈতিক ইস্যুতে বিরোধী দল হিসেবে জনতার অধিকার আদায়ে সোচ্চার ভূমিকা পালনের বিষয়টাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। গঠনমূলক সমালোচনা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

এ সময় পত্রপত্রিকায় জামায়াতের অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী জামায়াতের কড়া সমালোচনা করেন। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের সাথে জামায়াতের যুগপৎ আন্দোলনে আওয়ামী লীগই লাভবান হয়েছে বলে মন্তব্য করা হয়। যেসব ভোটার আওয়ামী লীগকে একটি ইসলামবিরোধী দল মনে করতেন, জামায়াত আওয়ামী লীগের সাথে যুগপৎ আন্দোলন করায় তাদের এই নেতিবাচক ধারণা

www.pathagar.org

অনেকটাই দূর হয়েছে বলে মনে করা হয়। পক্ষান্তরে একটি সেক্যুলার দলকে ক্ষমতায় আনতে জামায়াত পরোক্ষভাবে ভূমিকা রেখেছে এবং বিএনপি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। এমনকি অনেকে বিএনপিকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে আওয়ামী লীগকে ২১ বছর পর ক্ষমতার ফিরিয়ে আনার জন্য এককভাবে জামায়াতকে দায়ী করেন।

প্রাপ্ত ভোটের বিশ্লেষণ করে অনেক দেখিয়ে দেন যে, ৩০০ আসনে জামায়াত নির্বাচন করার পুরো বেনিফিট পেয়েছে আওয়ামী লীগ। অন্যথায় আওয়ামী লীগ কোনো অবস্থাতেই ক্ষমতায় আসতে পারত না। বিএনপি যে জামায়াতের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করার পর জামায়াতকে কাছে ধরে না রেখে দূরে ঠেলে দিলো, এ কথাটা সমালোচকরা বেমালুম চেপে গিয়ে সব দোষ জামায়াতের ওপর চাপালেন। জামায়াত গঠনমূলক বক্তব্য দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার চেষ্টা করে। তবে একপর্যায়ে বিএনপির মধ্যেও উপলব্ধি সৃষ্টি হয় এবং ক্রমান্বয়ে আবার বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে দূরত্ব কমতে থাকে।

সম্ভবত আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের তিন মাসের মাথায় প্রেসক্লাবে একটি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত রাজনীতিক আনোয়ার জাহিদের সাথে আমিও যোগদান করি। এ অনুষ্ঠানে বিএনপির আরও কতিপয় নেতা ও জাতীয়তাবাদী বেশ কজন বুদ্ধিজীবীও উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানেই সর্বপ্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করা হয়। পরদিন বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় আমার বক্তব্যও অন্যদের সাথে প্রকাশিত হয়।

মাত্র কিছুদিন আগে আওয়ামী লীগের সাথে জামায়াত যুগপৎ আন্দোলন করেছে এবং বিএনপি কেয়ারটেকার সরকারের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। আর আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পরপরই জামায়াত আবার আওয়ামী লীগের সমালোচনা শুরু করেছে—এই মর্মে কেউ কেউ আমার বক্তব্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ধারণা ছিল, যেহেতু জামায়াতকে বিরোধী দল হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হবে, তাই আওয়ামী লীগের অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জামায়াতকে কথা বলতেই হবে।

বিএনপির বিরুদ্ধে আন্দোলনে আওয়ামী লীগ জামায়াতের অবস্থানকে মেনে নিলেও সুবিধাবাদী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ তার দলীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য

www.pathagar.org

দেবে। আন্দোলনে জামায়াতের ভূমিকাকে আওয়ামী লীগ কখনও মূল্যায়ন করবে না। অতীতেও এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং আজ হোক কাল হোক, জামায়াতকে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধেই অবস্থান নিতে হবে। তাই এ নিয়ে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকা ঠিক নয়। আর এ কারণেই অনেকটা বেপরোয়া হয়েই আমি জাতীয় প্রেসক্লাবের সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করে আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনা করে বক্তব্য রেখেছিলাম। এ ব্যাপারে আমাদের দলের একজন সিনিয়র নেতা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমি বলেছিলাম— 'আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আমাদের রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে এবং এখন থেকেই তার সূচনা করা উচিত।' ইতিহাস বলে, পরবর্তী সময়ে আমাদের তা-ই করতে হয়েছিল।

বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে দূরত্ব ক্রমান্বয়ে কমে আসায় নিয়মিত বিএনপির লিয়াজোঁ কমিটির সাথে যোগাযোগ ও বৈঠক শুরু হয়। সত্যি কথা বলতে কী, দেশের সকল ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য এ সময় প্রখ্যাত বামপন্থি নেতা আনোয়ার জাহিদ নিরলস পরিশ্রম করেন। এজন্য আমরাও তাকে উৎসাহিত করি।

রাজনৈতিক যোগাযোগের পাশাপাশি স্বাধীনতা ফোরাম, যুবসমাজ, ন্যাশনাল ইয়ুথ ফোরামসহ বিভিন্ন ছোটো ছোটো সংগঠনের মাধ্যমে প্রধানত জাতীয় প্রেসক্লাবভিত্তিক গোলটেবিল বৈঠক, আলোচনা সভা ও সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের কাজ শুরু হয়। প্রতি সপ্তাহেই এ ধরনের কয়েকটি করে অনুষ্ঠান হতে থাকে। এসব অনুষ্ঠানের অধিকাংশগুলোতেই জামায়াতের পক্ষ থেকে আমাকেই আমন্ত্রণ জানানো হতো এবং আমি সব অনুষ্ঠানেই যোগদান করতাম। আওয়ামী লীগের একদলীয় কায়দায় দেশ পরিচালনার বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টিতে এসব কর্মসূচি একটি বড়ো ধরনের অবদান রেখেছে।

(মঙ্গলবার ১২:০০ টা; ২২ অক্টোবর ২০১৩)

www.pathagar.org

চারদলীয় জোট গঠন :
সরকারবিরোধী আন্দোলনের নতুন মাত্রা

কাজী জাফর আহমদের প্রচেষ্টায় জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বিএনপি ও জামায়াতের সাথে এক কাতারে আসতে সম্মত হয়। এ সময় জামায়াতের কৌশল ছিল, সাবেক যুক্তফ্রন্টের মতো একটি জোট গঠন করা এবং এ ব্যাপারে আনোয়ার জাহিদের পুরাপুরি ঐকমত্য ছিল। অনেক দৌড়ঝাঁপ ও পরিশ্রমের পর বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোটের সমন্বয়ে চারদলীয় জোট গঠনের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। এ সময় আমাদের প্রায় সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় মিন্টো রোডস্থ বিরোধীদলীয় নেত্রীর সরকারি বাসভবন। মূলত এটি চারদলীয় জোটের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ইসলামী ঐক্যজোটে কয়েকটি দল শামিল ছিল। কিন্তু জোট গঠনের সময় ইসলামী ঐক্যজোটকে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবেই গণ্য করার সিদ্ধান্ত হয়। ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান ছিলেন দেশের একজন শ্রদ্ধাভাজন আলেম শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক এবং মহাসচিব ছিলেন একজন বিপ্লবী আলেম মুফতি ফজলুল হক আমিনী।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একজন মহিলার নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী একটি রাজনৈতিক জোটে অংশ গ্রহণ করতে পারে কি না বা এমন জোটে জামায়াতের যাওয়া ঠিক হবে কি না, এ নিয়ে বড়ো ধরনের একটি প্রশ্ন ছিল। যেহেতু পাকিস্তান আমলেই কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহকে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী করা হলে সকল দলমতের শীর্ষ আলেমগণ এ সম্পর্কে ফতেমা জিন্নাহকে সমর্থন করার প্রশ্নে একমত হয়ে একটি ফতোয়া দিয়েছিলেন, তাই একটি স্বৈরসরকারের বিরুদ্ধে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে একটি

www.pathagar.org

জোটে যোগদান করার প্রশ্নে জামায়াত কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে বলে মনে করেনি। তবে আশঙ্কা ছিল যে, এই ইস্যুতে অন্য ইসলামী দল বা ব্যক্তির পক্ষ থেকে জামায়াতকে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হবে। যাদের পক্ষ থেকে সমালোচনা আসতে পারে, সেই ইসলামী ঐক্যজোট সম্পর্কে জানা গেল, তারা জোটে যোগদান এবং শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ সিদ্ধান্ত ছিল জামায়াতের জন্য খুবই ইতিবাচক। জোটে এলেও খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে কোনো বৈঠকে সরাসরি শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক অংশগ্রহণ করবেন কি না, তা নিয়ে ইসলামী ঐক্যজোটেও কিছু লোকের ভিন্নমত ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা জানতে পারি যে, সম্ভবত শায়খুল হাদিস নিজেই শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন।

শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সম্মেলন করার উদ্দেশ্য ছিল যে, চারদলীয় জোটের নেতারা একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করবেন এবং দেশবাসীকে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য ডাক দেবেন। এজন্য আমাদের কয়েকজনকে সদস্য করে চারদলীয় লিয়াজোঁ কমিটির পক্ষ থেকে ঘোষণাপত্রের খসড়া তৈরির জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। ঘোষণাপত্রের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনার জন্য লিয়াজোঁ কমিটির পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে শীর্ষ নেতাদের সাথে বৈঠক শুরু হয়। লিয়াজোঁ কমিটির সদস্যগণ বেগম খালেদা জিয়া, অধ্যাপক গোলাম আযম, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও আল্লামা আজিজুল হকের সাথে আলাদা আলাদাভাবে বৈঠক করে তাদের মতামত ও নির্দেশনা গ্রহণ করেন। তারা প্রত্যেকেই কী ধরনের ঘোষণাপত্র হবে এবং কী কী বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করা হবে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট বক্তব্য ও পরামর্শ দেন।

খসড়া প্রণয়ন কমিটির প্রধান ছিলেন আনোয়ার জাহিদ। জামায়াতের পক্ষ থেকে আমি ছিলাম ঘোষণাপত্রের খসড়া প্রণয়ন কমিটিতে। অধ্যাপক গোলাম আযমের দিকনির্দেশনা নিয়ে আমিও একটি খসড়া তৈরি করি। সেই আলোকেই কমিটিতে বক্তব্য রাখি এবং মোটামুটিভাবে মূলনীতি ঠিক করে খসড়া চূড়ান্ত করার জন্য আনোয়ার জাহিদকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়। খসড়া প্রণীত হলে লিয়াজোঁ কমিটিতে তা অনুমোদন হওয়ার পর আবার শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সাথে আমরা সাক্ষাৎ করে খসড়া পাঠ করে শোনাই। খসড়া তৈরির সময় লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকে দুটো বিষয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে মতামত দিতে অপারগতা প্রকাশ করা হয়। একটি হলো ইসলামী আদর্শ কথাটি থাকবে কি না এবং

www.pathagar.org

বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলের বিষয়টি সন্নিবেশিত হবে কি না। আমাদের পক্ষ থেকে জোরালো মতামত দেওয়া হয়, এ দুটোই থাকতে হবে। বিএনপি ধর্মীয় আদর্শ কথাটি রাখার পক্ষে মতামত দেয় এবং জানায় যে, বিশেষ ক্ষমতা আইন সম্পর্কে ম্যাডাম মতামত দেবেন।

এ পর্যায়ে ইসলামী আদর্শ সমুন্নত করার বিষয়টিও বেগম খালেদা জিয়ার কাছে উত্থাপন করার ব্যাপারে মত দিয়ে ধর্মীয় আদর্শ সমুন্নত করার কথা লিখেই খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। এ ব্যাপারে খসড়া নিয়ে বেগম খালেদা জিয়ার সাথে যখন আলোচনা হয়, তখন আমরা আপত্তি জানিয়ে বলি—'ধর্মীয় আদর্শ কথার পরিবর্তে ইসলামী আদর্শ লিখতে হবে।' বেগম খালেদা জিয়া বললেন, 'ইসলামী আদর্শের কথা বলতে অসুবিধা কোথায়, ওখানে লিখে দিন—ইসলামী আদর্শ সমুন্নত করা হবে।'

বিএনপির লিয়াজোঁ কমিটির নেতারা বিষয়টি নিয়ে কেন এতটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন, আমরা বুঝতে পারিনি। যাহোক, এটা ছিল আমাদের জন্য একটি নৈতিক বিষয়। কারণ, আমরা জোটে থাকব আর এতে ইসলামী আদর্শের কথাটা উল্লেখ থাকবে না—এটা ছিল আমাদের জন্য খুবই বিব্রতকর। যেদিন শীর্ষ সম্মেলন হবে, সেদিন সম্মেলন শুরুর কিছু আগেই দেখার জন্য বেগম খালেদা জিয়াকে খসড়া দেওয়া হলে তিনি তার পাশে উপবিষ্ট ডা. বি. চৌধুরী ও সাইদুর রহমানকে ভালো করে পড়ে দেখার জন্য দিলেন। বি. চৌধুরী সাহেব খসড়া পড়ে নিজেই বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলের বিষয়টি সংযোজন করেন এবং সাইফুর রহমান তা সমর্থন করলে বেগম জিয়াও ঐকমত্য পোষণ করলেন। বিষয়টি সংযুক্ত করে পুনরায় তা সংশোধন করা হলো এবং এভাবে আমরা যেমনটি চেয়েছিলাম, ঘোষণাপত্রটি তেমনই হলো।

বিরোধীদলীয় নেত্রীর সরকারি বাসভবনে শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। সম্মেলনে দলের সভাপতি ও সেক্রেটারি ছাড়াও লিয়াজোঁ কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। তবে বিএনপির আরও দুজন সিনিয়র নেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও সাইফুর রহমান বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে প্রাথমিক আলোচনা শেষে চার নেতা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলেন। বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণাপত্র পাঠ করার পর দুআর মাধ্যমে শীর্ষ সম্মেলনের কর্মসূচি সমাপ্ত হলো।

www.pathagar.org

জোট রাজনীতির এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করল বাংলাদেশ। ঘোষণাপত্রের মূল প্রতিপাদ্য ছিল, জোটবদ্ধভাবে একসাথে আন্দোলন এবং একসাথে নির্বাচন। কিন্তু ঘোষণাপত্র পাঠ করার সময় বেগম খালেদা জিয়া নিজে থেকেই আরেকটি কথা সংযোজন করে বলে দিলেন—জোটগতভাবে একসাথে আন্দোলন, একসাথে নির্বাচন ও একসাথে সরকার গঠন। একসাথে সরকার গঠনের বিষয়টি ঘোষণাপত্রে উহ্য রাখা হয়েছিল।

যাহোক, পরে তো এটা স্লোগানে পরিণত হয়ে গেল—'একসাথে আন্দোলন, একসাথে নির্বাচন এবং একসাথে সরকার গঠন।' চার নেতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে সেদিন বাংলাদেশে জোট রাজনীতির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। এর ফলে দেশের জনগণের ওপর ব্যাপক ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। জনগণ সেদিন থেকেই ধরে নিয়েছিল যে, আগামী নির্বাচনে চারদলীয় জোট বিপুল বিজয় লাভ করবে। এই ঘোষণার পর আমরা যেখানেই সফরে গিয়েছি, সেখানেই গ্রামের সাধারণ কৃষকও বলেছেন—'আপনাদের জোটের ঐক্য ঠিক রাখুন। দেশের মানুষ আপনাদের আগামী নির্বাচনে বিজয়ী করবে। শেখ হাসিনার শাসনের মধ্যে একদলীয় শাসনের দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আপনাদের ঐক্যই আপনাদের বিজয়ী করবে।' বাংলাদেশে এভাবে জোটবদ্ধ হয়ে ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরের মাধ্যমে অতীতে কোনো জোট একসাথে নির্বাচন ও সরকার গঠনের ঘোষণা দেয়নি।

(বুধবার ১১:০০ টা; ২৩ অক্টোবর, ২০১৩)

www.pathagar.org

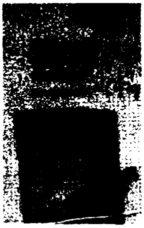

চারদলীয় জোটের শীর্ষ নেতাদের জনসভা শুরু পল্টন থেকে

চারদলীয় জোটের শীর্ষ নেতাগণ প্রথমে বিভাগীয় শহরে এবং পুরাতন জেলা হেডকোয়ার্টারে জনসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জোটের জনসভার আয়োজন, বক্তার তালিকা, মঞ্চ নির্মাণ, শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সভা পরিচালনা ইত্যাদি নিয়ে লিয়াজোঁ কমিটির অনেক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শীর্ষ নেতাদের সারিতে বিএনপির ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ অলি আহাদকে শামিল করা হয়। সিদ্ধান্ত হয়—শীর্ষ নেতাদের সাথে মঞ্চে থাকবেন শুধু লিয়াজোঁ কমিটির সদস্যগণ। পল্টনের জনসভায় সভাপতিত্ব করবেন সাদেক হোসেন খোকা। সভা পরিচালনা করবেন মহানগর বিএনপির সেক্রেটারি আবদুস সালাম এবং তাকে সহযোগিতা করবেন মহানগরী জামায়াতের সেক্রেটারি হামিদুর রহমান আযাদ। সিনিয়র নেতাদের আসন গ্রহণের জন্য মঞ্চের পাশে চেয়ার দিয়ে ব্যবস্থা করা হয়। জোটের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের জনসভায় বক্তৃতা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য দুপুর ২টা থেকেই জনসভা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হয়। শীর্ষ নেতারা সাড়ে তিনটা থেকে চারটার মধ্যে মঞ্চে আসার সিদ্ধান্ত হয়। বড়ো দল হিসেবে বিএনপি থেকে বেশিসংখ্যক বক্তাকে সুযোগ দেওয়া হয়। এরপর জামায়াত, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোটের সিনিয়র নেতাদের সুযোগ দেওয়া হয়; মহানগরীর নেতাদেরও বক্তার তালিকায় রাখা হয়।

কানায় কানায় পূর্ণ জনসভাস্থল। এদিকে বায়তুল মোকাররম থেকে ওদিকে জীবনবীমা ভবনের সামনের সড়ক থেকে আশেপাশের রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনাপূর্ণভাবে সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশ অনুষ্ঠান জোটনেতাদের আস্থা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। এরপর পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, রংপুর, বগুড়া, সিলেট, দিনাজপুর, খুলনা, যশোরে জনসভার আয়োজন করা হয়।

www.pathagar.org

এরশাদের চারদলীয় জোট ত্যাগ

অনেকটা আকস্মিকভাবে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ চারদলীয় জোট ত্যাগ করেন। আসলে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং আওয়ামী লীগের যোগসাজশেই তিনি জোট ত্যাগ করেন। বলা হয়ে থাকে যে, যেকোনো কারণেই হোক, প্রতিবেশী দেশ ভারতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া নাকি এরশাদের পক্ষে সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, ভারতে প্রশিক্ষণরত থাকা অবস্থায় হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পদোন্নতি হয় এবং তিনি দেশে ফেরার পর তাকে সেনাবাহিনীর উপপ্রধান করেন জেনারেল জিয়া। পরবর্তী সময়ে সেনাবাহিনীতে পাকিস্তানফেরত ও মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের মধ্যে ভারসাম্য আনার জন্য বা অন্য কোনো কারণেই হোক এরশাদকেই সেনাপ্রধান নিয়োগ করেন জিয়া।

এরশাদ ছিলেন একজন পাকিস্তানফেরত সেনা কর্মকর্তা। তিনি পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক সেনা কর্মকর্তাদের বিচারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতের কুচবিহারের বাসিন্দা এই সেনা কর্মকর্তা অত্যন্ত চতুর ও ধুরন্ধর ব্যক্তি। তিনি নিজের ব্যক্তিগত অবস্থানকে বেশ সংহত করে নেন। ব্যক্তিগত জীবনে চরিত্রহীনতার বদনাম থাকলেও তার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মধুর এবং যেকোনো লোককে মুগ্ধ করার মতো। তার সম্পর্কে নানা ধরনের কাহিনি প্রচলিত আছে, যা পরবর্তী সময়ে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

যাহোক, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ চারদলীয় জোট ত্যাগ করলেও জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক নাজিউর রহমান মঞ্জু চারদলীয় জোটে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে জাতীয় পার্টি দুই ভাগ হয়ে যায়। প্রায় ১৭ জন সাবেক মন্ত্রী ও সাংসদসহ নাজিউর রহমান মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি চারদলীয় জোটে থেকে যাওয়ায় জোট অক্ষুণ্ন থাকে। এতে জোটেরও কোনো ক্ষতি হয়নি; বরং ডিগবাজি খাওয়ার জন্য জনগণ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদেরই নিন্দা করে। উল্লেখযোগ্য আর যারা ছিলেন, তারা হলেন সাবেক মন্ত্রী কাজী ফিরোজ রশিদ, এবিএম গোলাম মোস্তফা, সুনীল গুপ্ত, মোস্তফা কামাল হায়দার প্রমুখ।

(বৃহস্পতিবার, ১১:০০ টা; ২৪ অক্টোবর, ২০১৩)

www.pathagar.org

সংবিধানবিরোধী পার্বত্য শান্তিচুক্তি : চারদলীয় জোটের লংমার্চ

পার্বত্য গণসংহতি পরিষদের নেতা সন্তু লারমার সাথে আওয়ামী লীগ সরকার একটি তথাকথিত শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে। বাংলাদেশের আয়তনের দশ ভাগের এক ভাগ এই পার্বত্য এলাকায় অন্যান্য জেলার অধিবাসীদের জমির মালিক হওয়ার অধিকার রহিত করে সম্পাদিত এই চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করা হয়। কার্যত পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িকে বাংলাদেশ থেকে ভবিষ্যতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পথ সুগম করে দেওয়া হয় এই চুক্তির মাধ্যমে।

বাংলাদেশের সংবিধান লঙ্ঘন করে একটি সশস্ত্র সংগঠন—যাদের হাতে অসংখ্য বাংলাদেশি নিহত হয়েছে এবং যারা কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধিও নয়, তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদনের কোনো যৌক্তিকতাই নেই। তা ছাড়া বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত একটা এলাকার কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের সাথে চুক্তি করে সরকার রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও সংবিধান লঙ্ঘন করায় চারদলীয় জোট জাতীয় স্বার্থবিরোধী এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে। এই তথাকথিত শান্তিচুক্তি বাতিলের দাবিতে চারদলীয় জোট পার্বত্য চট্টগ্রাম অভিমুখে লংমার্চের কর্মসূচি ঘোষণা করে।

সিদ্ধান্ত হয়, ঢাকা থেকে চারদলীয় জোট নেতৃবৃন্দ একসাথে রওনা করে চট্টগ্রাম পৌঁছাবেন। পরদিন চট্টগ্রাম থেকে বিএনপির নেতৃত্বে বান্দরবান এবং জামায়াতের নেতৃত্বে রাঙামাটিতে জনসভা করার মাধ্যমে লংমার্চ সমাপ্ত হবে। তবে বান্দরবানের জনসভায় জামায়াতের একজন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখবেন এবং রাঙামাটির জনসভায় বিএনপির একজন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখবেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমাকে বিএনপির সমাবেশে বক্তব্য রাখার জন্য বান্দরবান

www.pathagar.org

যেতে হয়। আমি চারদলীয় জোটের নেতৃবৃন্দের সাথে বান্দরবানের জনসভায় বক্তব্য রাখি এবং সেখানে প্রধান বক্তা ছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। রাঙামাটিতে জামায়াতের জনসভার প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক গোলাম আযম এবং বিএনপির প্রতিনিধি হিসেবে রাঙামাটিতে বক্তৃতা করেন আবদুল মতিন চৌধুরী।

আওয়ামী লীগের সরকার লংমার্চে বাধা দেওয়ার জন্য কাঁচপুর সেতুর আগেই সড়কের ওপর ট্রাক দিয়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী সন্ত্রাসী শামীম ওসমানের নেতৃত্বে সশস্ত্র আওয়ামী গুন্ডারা রাজপথে ব্যারিকেডের সৃষ্টি করে। সেইসাথে পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনীর লোকেরাও লংমার্চের শত শত গাড়ি কাঁচপুর সেতুর আগেই আটকে দেয়। সেখানেই নেতৃবৃন্দ সকাল থেকে অবস্থান করতে থাকেন।

সাত ঘণ্টা আটক রাখার পর একপর্যায়ে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করে রাস্তা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। এ সময় কর্মসূচি নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এখান থেকে লংমার্চগামী সব গাড়ি নিয়ে ঢাকা শহরে প্রবেশ করে রাজধানী অচল করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু আমরা খবর পাচ্ছিলাম, ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম সড়কের উভয় পাশে লক্ষ লক্ষ জনতা লংমার্চের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করার জন্য দিনভর অপেক্ষা করছে। এ সময় বেগম জিয়ার সাথে আমার যোগাযোগ হয় কয়েকবার। তিনি দৃঢ়তার সাথে জানান—'এই প্রতিরোধ ভেঙেই আমরা লংমার্চ অব্যাহত রাখব। সবাই এখানেই অবস্থান করুন।' এ ব্যাপারে তিনি আমাদের মতামত জানতে চাইলে জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমও একই মত প্রকাশ করেন।

আমাদের গাড়ির বহর ছিল শনির আখড়ার পাশে। তার উলটো দিকে একটি বাড়িতে দুপুরের পর জুহরের নামাজ আদায়ের জন্য আমাদের স্থানীয় নেতাকর্মীরা ব্যবস্থা করেন। অধ্যাপক সাহেবসহ আমরা সেখানে যাই। প্রচণ্ড গরমে আমি হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হই। আমার অবস্থা বুঝতে পেরে আলমগীর নামক আমাদের এক কর্মী আমাকে তার গাড়িতে এসি ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এরপর যখন অধ্যাপক সাহেবের সাথে আমরা উল্লিখিত বাড়িতে নামাজের জন্য যাই, তখন আমি গোসল করার সুযোগ গ্রহণ

www.pathagar.org

করি এবং বেশ সুস্থ বোধ করি। আমাদের স্থানীয় নেতারা সেখানেই দুপুরের খাবারের আয়োজন করেন। আমরা দুপুরের খাবার খাই। যারা রাস্তার ওপর গাড়িতে অবস্থান করছিলেন, তাদেরকেও যেভাবে সম্ভব দুপুরে কিছু খেয়ে নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। আমাদের নেতাকর্মীরা কিছু খাবার কিনে বা স্থানীয় ভাইদের সহযোগিতায় কোনোমতে ব্যবস্থা করেন।

আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার রাজপথে গাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করি। আসরের নামাজও আমরা রাস্তায় আদায় করে ফেলি। সাড়ে চারটার দিকে আমাদের কাছে একটি কল আসে এবং আমাকে বলা হয়, বেগম জিয়া অধ্যাপক সাহেবের সাথে কথা বলতে চান। আমি দৌড়ে মোবাইলটা নিয়ে অধ্যাপক সাহেবকে দিলাম। ফোনে সালাম বিনিময়ের পর শুনলাম অধ্যাপক সাহেব বললেন—'আমি তো গাড়িতে বসে আপনার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করছি। আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমি পুরোপুরি একমত। আমিও গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছি এবং আমার গাড়ি চিটাগাংয়ের দিকে মুখ করেই দাঁড়িয়ে আছে।'

তাদের ফোনালাপ শেষ হতেই অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব বললেন—'আমাদেরকে রওনা করতে হবে এক্ষুনি।' এসব আলাপ শুনেই অধ্যাপক সাহেবের গাড়ির চালক আবদুস সাত্তার গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। সাথে সাথেই সবাই রওনা করলেন।

উল্লেখ্য যে, লংমার্চের সমন্বয়কারী হিসেবে আমার ওপর দায়িত্ব ছিল। অর্থ সংগ্রহ থেকে সমন্বয়ের কাজ আমাকেই দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে হয়েছে। একপর্যায়ে অর্থের খুব সংকট ছিল। তখন আমাদের মুহাম্মদ ইউনুস ভাই এ ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা করেছেন এবং সাহস জুগিয়েছেন। সেদিনও ফোনে ইউনুস ভাই খবর নিচ্ছিলেন।

যাহোক, আমরা রওনা করলাম। পথে পথে লক্ষ করলাম, অসংখ্য মানুষ রাস্তার দুই ধারে অপেক্ষা করছিল। আমাদের মাত্র কয়েক গাড়ি আগেই ছিল বেগম জিয়ার গাড়ি। কুমিল্লা, ফেনী, বারৈয়ারহাট, মীরসরাই, সীতাকুণ্ড ইত্যাদি স্থানে পথসভায় খালেদা জিয়া বক্তব্য রাখেন।

সীতাকুণ্ড পৌঁছার আগেই ফজরের নামাজের সময় হয়ে যায়। রাস্তার পাশের একটি মসজিদে নামাজ আদায় করে আমরা আবার রওনা করি। চট্টগ্রামের

www.pathagar.org

স্থানীয় নেতারা হাজার হাজার গাড়ি ও লংমার্চে যোগদানকারীদের জন্য খাওয়াদাওয়া ও অবস্থানের ভালোই ব্যবস্থা করেছিলেন। সিদ্ধান্ত হয় নাশতা ও বিশ্রামের পর ১১ টায় আমাদের লংমার্চের বহর একসাথেই রওনা করবে বান্দরবান ও রাঙামাটির উদ্দেশে।

(শুক্রবার, রাত ১২:০০ টা; ২৫ অক্টোবর, ২০১৩)

www.pathagar.org

চারদলীয় জোটের প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য কমিটি গঠন

জোটবদ্ধ নির্বাচন করার জন্য চারদলীয় জোট ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। বিএনপি থেকে চারজন এবং অন্য দলগুলো থেকে তিনজন করে সদস্য নিয়ে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য এই কমিটি গঠন করা হয়। নীতি ঠিক হয়—কমিটি প্রার্থীদের তালিকা তৈরি করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য শীর্ষ নেতাদের কাছে পেশ করবে এবং শীর্ষ নেতৃবৃন্দই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

কমিটিতে বিএনপির পক্ষ থেকে ছিলেন শামসুল ইসলাম, ড. আর এ গণি ও তরিকুল ইসলাম। জামায়াতের পক্ষ থেকে মাওলানা আবদুস সুবহান, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও মুহাম্মদ কামারুজ্জামান। জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে ছিলেন কাজী ফিরোজ রশিদ, এ বি এম গোলাম মোস্তফা ও বাবু সুনীল গুপ্ত। ইসলামী ঐক্যজোটের পক্ষে ছিলেন মুফতি ফজলুল হক আমিনী, আবদুল লতিফ নেজামী ও এআরএম আবদুল মতিন। কমিটির মোট ২২টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। একটি একটি করে নির্বাচনী আসন নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে যে আসনে যে দলের প্রার্থী যোগ্য ও জনপ্রিয় এবং সাংগঠনিক অবস্থানও ভালো, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করে প্রার্থীর নাম তালিকাভুক্ত করা হয় সর্বসম্মতভাবে।

কমিটির সামনে বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল মনোনয়নপ্রার্থীদের তদবির। বিশেষ করে বিএনপির যেহেতু প্রতিটি আসনেই নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার মতো একাধিক ব্যক্তি রয়েছেন এবং নির্বাচনের জনমত অনেকটাই বিএনপির বা চারদলীয় জোটের পক্ষে, তাই অনেকেই মনোনয়ন পেতে আগ্রহী ছিলেন। এমনকি প্রবাসে থাকেন এমন অনেক বিত্তবান লোকও মনোনয়ন লাভের জন্য প্রচেষ্টা চালান। অনেক প্রার্থী তাদের জীবনবৃত্তান্তের চমৎকার প্রোফাইল তৈরি করে স্পাইরাল বাইন্ডিং করে আমাদের কাছে পৌঁছাতেন এবং যোগাযোগ করতেন।

www.pathagar.org

স্মার্ট প্রার্থীরা কমিটির একাধিক সদস্যের সাথে আলাদাভাবে যোগাযোগ করেছেন। নানাভাবে পরিচয়ের সূত্র ধরে আমার সাথে অনেক মনোনয়নপ্রার্থী সাক্ষাৎ করেন। এতে আমারও অনেক কিছু জানার সুযোগ হয় এবং মনোনয়ন প্রত্যাশী অনেক তরুণ নেতার সাথে সখ্যও গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে অনেক যোগ্য ও সম্ভাবনাময় ব্যক্তি ছিলেন। নির্বাচনী এলাকায় প্রবীণ ও গত নির্বাচনে বিজয়ী বা শক্তিশালী নিকটতম প্রার্থী থাকায় নবীনদের মধ্যে যোগ্য অনেককেই মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি।

দুটো ঘটনা এখানে উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে হয়। আমাদের সিলেটের সংগঠন ডা. শফিকুর রহমানের আসনটি নেওয়ার জন্য খুব চাপ সৃষ্টি করে। ডা. শফিক সিলেট শহরে আগেরবার অর্থাৎ, ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে সম্ভবত ৩৭ হাজার ভোট পান। তিনি প্রার্থী হিসেবে খুবই যোগ্য এবং চারদলীয় জোটের সিলেটের একজন শীর্ষ নেতা হিসেবে স্থানীয় রাজনীতিতে তিনি যথেষ্ট প্রভাবশালী একজন নেতা। তার গ্রামের বাড়ি কুলাউড়া। কুলাউড়া থেকে তাকে প্রার্থী করার চিন্তা করা হয়। সেখানে আমাদের সংগঠন তেমন শক্তিশালী ছিল না। তা ছাড়া ডা. শফিকের কর্মক্ষেত্রও কুলাউড়া ছিল না। সেই আসনে ১৯৭৯ সালে মুসলিম লীগ নেতা এএনএম ইউসুফ নির্বাচিত হয়েছিলেন। কুলাউড়ার আসন সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। তবে আমাদের সংগঠনের লোকেরা বিশেষ করে সিলেট শহরের ভাইয়েরা বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে কুলাউড়ায় কাজ শুরু করেন। ওদিকে নিউইয়র্কস্থ *সাপ্তাহিক ঠিকানা* পত্রিকার মালিক শাহীন অনেক দিন থেকেই সেই আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পাওয়ার জন্য কাজ করে আসছিলেন। তিনি ব্যাপক গণসংযোগ ও স্থানীয়ভাবে নির্বাচনী কর্মীও সংগ্রহ করেন।

সিলেটে জামায়াতের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রভাব বিএনপির পক্ষে সর্বাত্মক কাজে লাগানোর স্বার্থে মরহুম সাইফুর রহমানও কুলাউড়া আসনটি জামায়াতের প্রার্থী ডা. শফিকুর রহমানের জন্য ছেড়ে দিতে বেগম জিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। ওদিকে শাহীনের সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ও সুসম্পর্ক থাকায় তিনি আমার সাথে যোগাযোগ রাখছিলেন এবং একপর্যায়ে আমার বাসায়ও দেখা করতে আসেন। তার ছোটো ভাইয়ের সাথেও আমার পরিচয় ছিল। শাহীন যখন বুঝতে পারেন, যেকোনো কারণেই হোক সাইফুর রহমান সাহেব শাহীনকে মনোনয়ন দেওয়ার বিরুদ্ধে এবং ডা. শফিকুর রহমানকে

www.pathagar.org

মনোনয়ন দেওয়ার পক্ষে, তখনই তিনি আমার কাছে ছুটে আসেন। শাহীন নির্বাচনী এলাকার সার্বিক অবস্থা তুলে ধরে বলেন, সেই আসনে ডা. শফিকুর রহমানের জয়লাভের কোনো সম্ভাবনাই নেই। যদি তাকে দিয়ে নির্বাচন করানো হয়, তাহলে আসনটি আওয়ামী লীগের দখলে চলে যাবে; অর্থাৎ, ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সুলতান মুহাম্মদ মনসুর জয়লাভ করবেন। সেই আসনে ডা. শফিকের জয়লাভ করার অবস্থা থাকলে শাহীন নিজে সরে দাঁড়াতেন বলে আমাকে জানান। আমি খোঁজখবর নেব বলে তাকে আশ্বস্ত করি।

ইতোমধ্যে আমার এক সাংবাদিক বন্ধু স্বঃপ্রণোদিত হয়ে আমাকে জানান যে, শাহীন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করলেও সেখান থেকে জয়লাভ করবে বলে তার কাছে রিপোর্ট আছে। এদিকে বিএনপির আরেক নেতা মোফাজ্জল করিম সাহেবও কুলাউড়া থেকে মনোনয়নপ্রার্থী ছিলেন। তিনিও চাচ্ছিলেন, যদি দল তাকে মনোনয়ন না দেয়, তাহলে ডা. শফিককেই যেন মনোনয়ন দেওয়া হয়। অর্থাৎ, তিনি চাচ্ছিলেন, শাহীন যেন মনোনয়ন না পায়। তখন সিদ্ধান্ত অনেকটা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। যেহেতু সাইফুর রহমান সাহেব সমর্থন করেছেন, তাই বেগম খালেদা জিয়া আসনটি জামায়াতকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর জামায়াতও চাচ্ছিল যে, জামায়াতের একজন উদীয়মান নেতা হিসেবে ডা. শফিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক। ময়দানের বাস্তব অবস্থা ভালোভাবে পর্যালোচনা ছাড়াই জামায়াত সেই আসনটিতে ডা. শফিকুর রহমানকে দিয়ে নির্বাচন করতে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে। সিলেট শহরের যেসব জনশক্তি ইতোমধ্যে সেখানে কাজ শুরু করেছিলেন, তারাও উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়ার কথাই কেন্দ্রকে অবহিত করেন।

শাহীন শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং তিনিই জয়লাভ করেন। নির্বাচনের পর জামায়াত বুঝতে পারে, আসলে কুলাউড়ার আসনে ডা. শফিকুর রহমানকে নির্বাচন করানোটা সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল না। আমার ব্যক্তিগত ধারণা ছিল, ডা. শফিকের সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের জন্য ক্ষেত্র তৈরি করা এবং ভবিষ্যতে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত। সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হওয়ার জন্য তিনি একজন খুবই যোগ্য ও গ্রহণযোগ্য প্রার্থী হতে পারতেন। অবশ্য এটা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত চিন্তা।

www.pathagar.org

যেহেতু আমি সারা দেশেই ছাত্রজীবন থেকে সফর করেছি এবং জামায়াতে যোগদানের পরও প্রায় সব জেলাতেই রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রয়োজনে সফর করেছি, তাই বিভিন্ন আসনে কোন প্রার্থীর অবস্থান কী, সে সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল। আমি যখনই কোনো জেলা সফর করতাম, তখন সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান ও সম্ভাব্য প্রার্থী কে হতে পারেন, তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম বা জানার চেষ্টা করতাম এবং নোট রাখতাম। উপরন্তু দলের প্রয়োজনে এবং জোটের প্রয়োজনেও খোঁজখবর রাখতাম। বিভিন্ন সূত্র থেকেও ধারণা পেতাম।

১০ বছর *দৈনিক সংগ্রাম*-এর নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালনকালেও যখন মফস্বল সংবাদদাতাদের বিষয়টা দেখাশোনা করার দায়িত্ব আমার ওপর ছিল, তখন তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কে তথ্য পেতাম। সম্পাদক হিসেবে *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*-র জেলা সংবাদদাতাদের মাধ্যমেও খোঁজখবর নিতাম। ১৯৯১ সালে যখন বিএনপির সাথে আমাদের সমঝোতার বিষয়ে প্রায় পাকাপাকি কথা হচ্ছিল, তখন একদিন কর্নেল মুস্তাফিজুর রহমানের বাসভবনে বেগম খালেদা জিয়া ও অন্যান্য বিএনপি নেতাদের সাথে জামায়াত নেতাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। বৈঠকের পর বেগম জিয়া আমাকে এবং *সংগ্রাম* সম্পাদক আবুল আসাদকে দায়িত্ব দেন—'বিভিন্ন আসনে বিএনপি প্রার্থীদের কার কী অবস্থান, এ সম্পর্কে আপনারা একটি সঠিক রিপোর্ট দেবেন। আগামীতে যখন বৈঠক হবে, আপনাদের হাতে আমি এ বিষয়ক একটি ফাইল দেখতে চাই। ৩০০ আসনেই আমাদের প্রার্থীদের অবস্থা সম্পর্কে আপনাদের বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য মোতাবেক একটি পর্যবেক্ষণ দেবেন।' এজন্য আমি কিছু কাজও করেছিলাম। দেশের ৩০০ আসন সম্পর্কেই কোন দলের কোথায় কী অবস্থান, তা নিয়ে কথা বলি।

আমি এ বিষয়ে বেশ গভীরভাবে স্টাডি করেছিলাম। তবে চারদলীয় জোটের আসন বন্টনের জন্য যে কমিটি হয়, তাতে আমার স্টাডি বা অভিজ্ঞতা তেমনভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ হয়নি। কারণ, সেখানে প্রার্থী নিয়ে আলোচনা ছিল অনেকটাই সীমিত। যেসব আসনে আগেরবার বিএনপির মন্ত্রী-এমপি ছিলেন, সেসব আসন সম্পর্কে তো আলোচনাই হতো না। নীতিগতভাবে তা ছিল বিএনপির। আবার যেসব জায়গায় আগে জামায়াতের এমপি ছিল, সেসব আসনও প্রায় সব কটিই জামায়াতকেই দেওয়া হয়।

www.pathagar.org

এরপরও আমার আওতার বাইরের বিষয় হলেও আমি জোরালো মতামত দিয়েছি যে, কোন আসনে বিএনপির প্রার্থী কে হওয়া উচিত। এমন একটি আসন ছিল জামালপুরের মাদারগঞ্জের আসন। এই আসনটি যখন বিএনপি জাতীয় পার্টিকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, আমি তার বিরোধিতা করি। এ আসনে বিএনপির প্রার্থী ছিলেন তরুণ রাজনীতিক সাবেক ছাত্রনেতা মুস্তাফিজুর রহমান বাবুল। বাবুল বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। বেশ কিছুদিন মস্কোতেও ছিলেন। দেশে ফিরে বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত হন। জামালপুরের ছেলে হিসেবে আমার সাথে তার যোগাযোগ ছিল এবং বলা যায় সখ্যও ছিল। আমি মাদারগঞ্জ সফর করি জামায়াতের জনসভায় বক্তৃতা করার জন্য। সেখানে মুস্তাফিজসহ বিএনপি নেতাদের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে আমার বৈঠক হয়।

আমাদের স্থানীয় সংগঠনের নেতাদের কথা ছিল, এই আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে পরাস্ত করতে হলে মুস্তাফিজুর রহমান বাবুলের বিকল্প নেই। জাতীয় পার্টিকে আসনটি দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করায় বৈঠকে উপস্থিত জাতীয় পার্টির সদস্যগণ আমার ওপর খানিকটা অসন্তুষ্টও হন।

যাহোক, জনগণের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মুস্তাফিজুর রহমান বাবুল স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবেই নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং আমার সহযোগিতা কামনা করেন। আমাদের স্থানীয় নেতাদের সাথে আলাপের পর আমি বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যাই! কারণ, তাদের ইচ্ছা তারা বাবুলের পক্ষেই কাজ করতে চান এবং এ ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত চান। অবশেষে আমি সবদিক বিবেচনা করে তাদেরকে বলি বাবুলের জন্যই কাজ করতে। নির্বাচনে বাবুল ১ লক্ষ ৭ হাজার ভোট পেয়েছিলেন, কিন্তু জয়লাভ করতে পারেননি। সামান্য ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন আওয়ামী লীগের প্রার্থীর কাছে। তাকে মনোনয়ন দিলে তিনি অনেক বেশি ভোটেই বিজয়ী হতেন।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। দরকষাকষির রাজনীতিতে অভিজ্ঞতার অভাবে আমরা আসন বন্টনের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়েছি বা আমাদের ঠকানো হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা ছিল, আমরা যেসব আসন চাই এবং যেসব আসনে নির্বাচনে আমাদের ভালো অবস্থান হতে পারে, তার একটি তালিকা তৈরি করে নির্দিষ্ট আসন লাভের চেষ্টা করলে ভালো হতো।

www.pathagar.org

ক্রমানুসারে একটি তালিকা প্রধান দল বিএনপিকে দিয়ে সেই তালিকা মোতাবেক আসন চাইলে হয়তো-বা আমরা কাঙ্ক্ষিত আসন পেতে পারতাম। কতটা আসন আমাদের দাবি এবং কতটা বিএনপি আমাদের জন্য ছেড়ে দিতে পারে, তা যদি নির্ধারণ করার জন্য দরকষাকষি করা হতো, তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হতো।

যে পদ্ধতিতে পর্যালোচনা করে আসন বণ্টিত হলো, তাতে আমাদের সম্ভাবনাময় বেশ কিছু আসন আমরা পাইনি। সিরাজগঞ্জ, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, কক্সবাজার, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, বগুড়া এসব জেলার আমাদের খুবই সম্ভাবনাময় আসনগুলোর কোনোটাই জামায়াতকে দেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে উত্তরবঙ্গে প্রধানত জাতীয় পার্টির প্রভাবাধীন এলাকায় আমাদের জন্য আসন দেওয়া হয়েছে। কোনোক্রমেই বিএনপি উল্লিখিত জেলাগুলোতে আমাদের আসন দেয়নি। অথচ ওইসব জেলায় জামায়াতের সংগঠন শক্তিশালী এবং বিশাল ভোটব্যাংক আছে। এর ফলে আমাদের সারা দেশের নেতাকর্মীদের মাঝে অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে মাত্র ২৯টি আসন দেওয়া হয়। জোটের সিদ্ধান্তের বিপরীতে গিয়ে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করার অনুমতিও আমরা কোথাও কাউকে দিতে পারিনি বা দিইনি।

(শনিবার, রাত ১২:০০ টা; ২৬ অক্টোবর, ২০১৩)

www.pathagar.org

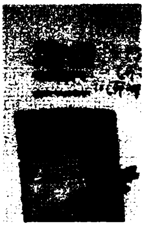

নির্বাচনে চারদলীয় জোটের বিপুল বিজয়

২০০১ সালে একটি কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন হলো। সে নির্বাচনে বিএনপি ১৯৪টি আসনে এবং জামায়াত ১৭টি আসনে বিজয়ী হয়। আওয়ামী লীগ ৫৮ আসনে জয়লাভ করে। 'একসাথে আন্দোলন, একসাথে নির্বাচন এবং একসাথে সরকার গঠন'—খালেদা জিয়া তার এই কথা রেখেছিলেন। এককভাবেই বিএনপিই সরকার গঠন করতে পারত। কিন্তু সরকারে জামায়াতের দুইজন নেতাকে মন্ত্রী করা হয়। জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে টেকনোক্র্যাট কোটায় মন্ত্রিসভায় শামিল করা হয়। কারণ, তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশ নেননি; অর্থাৎ, তিনি সংসদ সদস্য ছিলেন না।

বেগম খালেদা জিয়া প্রথমে একটি ছোটো মন্ত্রিসভাই করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় কয়েকজন উপদেষ্টাসহ এক বিরাট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এত বড়ো মন্ত্রিসভার পক্ষে আমরা ছিলাম না। কিন্তু জোটের শরিক দল হিসেবে মন্ত্রিসভা গঠনে আমাদের কোনো ভূমিকাই ছিল না বা এ ব্যাপারে আমাদের কোনো মতামতও কার্যত নেওয়া হয়নি। জামায়াতের আমীর মতিউর রহমান নিজামীকে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুজাহিদকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সদস্যসংখ্যা অনুপাতেও যদি মন্ত্রিসভার আসন বণ্টন করা হতো, তাহলেও জামায়াত হতে পাঁচজনকে মন্ত্রিত্ব দেওয়া উচিত ছিল। এক্ষেত্রেও জামায়াতকে ঠকানো হয়েছে। তবে জামায়াতও তেমন দরকষাকষি করতেও সক্ষম হয়নি। ইসলামী ঐক্যজোট ও জাতীয় পার্টি (নাজিউর)-কে মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত না করাটা ছিল জামায়াতের জন্য বিব্রতকর। আমাদের বিবেচনায় এত বৃহৎ মন্ত্রিসভা যেখানে গঠন করা হয়েছে, তাতে এই দুই দল থেকে একজন করে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হলে সবদিক থেকেই ভালো হতো। মাত্র দুটি

www.pathagar.org

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির পদ জামায়াতকে দেওয়া ছাড়া সরকারি দায়িত্ব ও নিয়োগে আর কোথাও জামায়াত বা জোটের অন্য শরিক দলের কাউকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। এরপরও জামায়াত সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মন্ত্রিসভায় যোগদান করার ব্যাপারে জামায়াতের মধ্যে ঐকমত্য ছিল। তবে সংগঠনের আমীর মন্ত্রিসভায় যোগদান করাটা কতটা সঠিক হবে, তা নিয়ে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। পরে আলোচনার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সুতরাং, জামায়াত সাংগঠনিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েই জোটের মন্ত্রিসভায় যোগদান করে।

জোটবদ্ধ নির্বাচন করে মন্ত্রিসভা গঠন এটাই প্রথম। জামায়াত নিজস্ব প্রতীক দাঁড়িপাল্লা নিয়েই নির্বাচন করে। এর আগে ১৯৯১ সালে জামায়াতের সমর্থনে বিএনপি সরকার গঠন করলেও জামায়াত মন্ত্রিসভায় যোগদান করেনি। আর তা ছাড়া সে সময় আসন বণ্টন করে নির্বাচন হয়নি। জামায়াত এককভাবে নির্বাচন করে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি ও জাসদের সমর্থনে সরকার গঠন করলেও সেই ঐক্য হয় নির্বাচনের পর। জাতীয় পার্টির আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও জাসদের আ স ম আবদুর রব শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। এসব বিবেচনায় চারদলীয় জোটের সরকার গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশে জোট রাজনীতির একটি ধারা সংযোজিত হয়।

(সোমবার, রাত ১১:১০ টা; ৪ নভেম্বর, ২০১৩)

www.pathagar.org

চারদলীয় জোটের সরকার পরিচালনা ও রাজনীতি

দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী চারদলীয় জোট সরকার গঠনের পর জোটের লিয়াজোঁ কমিটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অনেক বলার পরও নিয়মিত কোনো বৈঠক বা মতবিনিময়ের সুযোগ সীমিত হয়ে আসে। ফলে জোটের দলগুলোর মধ্যে কমবেশি কিছু দূরত্ব সৃষ্টি হয়। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ এ ধরনের বৈঠকের ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। একপর্যায়ে আমি নিজে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাই লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠক করার জন্য। তিন মাস অন্তর হলেও প্রধানমন্ত্রী লিয়াজোঁ কমিটির সদস্যদের সাথে একটি অনানুষ্ঠানিক বৈঠক বা চা পান করতে পারেন। জোটের শীর্ষ নেতাদের কোনো আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়নি। সম্ভবত উপনির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের জন্য কয়েকটি বৈঠক হয়েছিল। বিএনপি-জামায়াতের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের ব্যাপারেও প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়। জামায়াতের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ চাচ্ছিলেন, এমন বৈঠক হোক।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে কথাটা বলার পর তিনি বলেন—'আপনাদের দুই শীর্ষ নেতার সাথে তো নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ ও মতবিনিময় হচ্ছে।' আমি বললাম—'তারা তো আমাদের পক্ষ থেকে আপনার মন্ত্রিসভার সদস্য। এর বাইরে আমাদের অনেক প্রধান নেতা রয়েছেন, তাদের সাথে আপনার সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় হওয়া জরুরি।' তিনি বললেন—'আমি তো আমার দলের নেতাদের সাথেই বসার সময় করতে পারছি না।' জামায়াত নেতাদের সাথে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার একটি বৈঠক হয়েছিল একেবারে সংসদের শেষ বছরে এসে। সেই বৈঠক ছিল জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টিকে জোটে ফেরত আনার বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য। এমনকি আমাদের যে ২১ জন সংসদ সদস্য ছিলেন, তারা প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাদাভাবে তাদের এলাকার কিছু ব্যাপার নিয়ে কথা বলার সুযোগ চেয়েছিলেন; কিন্তু সেটাও সম্ভব হয়নি। এমনকি যৌথভাবে চারদলীয় জোটের সংসদীয় দলের কোনো বৈঠকও হয়নি।

www.pathagar.org

আমাদের কয়েকজনের উপর্যুপরি অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে জোটের দলগুলোর মহাসচিব পর্যায়ে বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয়। এই বৈঠকে প্রতি দল থেকে লিয়াজোঁ কমিটির ২-৩ জন করে সদস্যকে আমন্ত্রণ জানানো হতো। এ ধরনের মাত্র কয়েকটা বৈঠক হয়েছে। আর সেই বৈঠকগুলোতে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই ধরনের বৈঠকেই আমি প্রস্তাব করেছিলাম একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা এবং প্রতি জেলায় নিয়মিত লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য। শরিকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে অনেক অভিযোগ রয়েছে, যা এ ধরনের বৈঠকের মাধ্যমে নিরসন হতে পারে। অন্যান্য শরিকদলের নেতারা সমর্থন করলে সমন্বয় কমিটি গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। জেলাপর্যায়ে লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে বিএনপির মহাসচিব মান্নান ভূঁইয়ার পক্ষ থেকে যথাযথভাবে জেলা কমিটিগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। স্থানীয় এমপি-মন্ত্রীগণও জোটের বৈঠকের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না।

স্থানীয় বিএনপি নেতারা মনে করতেন, জোটের বৈঠক না হওয়াই ভালো। বৈঠক হলে হয়তো-বা শরিকদলের লোকেরা এটা-সেটা দাবি করবে। সুতরাং, বৈঠক না হওয়াই ভালো। এর মাধ্যমে যে জোটের রাজনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সেটা বোঝার ক্ষমতাও যেন তাদের ছিল না।

দেশের জনগণ বুকভরা আশা নিয়ে চারদলীয় জোটকে নির্বাচনে সমর্থন দিয়েছিল। চারদলীয় জোটের জন্য জনগণের এ সমর্থন কাজে লাগিয়ে জোটের অবস্থান অনেক সংহত ও জনসমর্থন বৃদ্ধির এক বিরাট সুযোগ এসেছিল। সাধারণ মানুষ আওয়ামী ফ্যাসিস্ট চক্রের হাত থেকে বাঁচার জন্যই জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে চারদলীয় জোটের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেছিল। জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির যে সম্মিলিত রাজনীতির মধ্যে জনগণ মুক্তি খুঁজে পেতে চেয়েছিল; দুর্ভাগ্যের বিষয়! চারদলীয় জোট সেই রাজনীতিকে এগিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়। আনোয়ার জাহিদ বলতেন—'চারদলীয় জোট তার নিজস্ব রাজনীতিটাই করছে না।'

(রাত ১২:০০ টা; ৫ নভেম্বর, ২০১৩)

www.pathagar.org

জামায়াতের দুই মন্ত্রীর সততা ও নিষ্ঠা

জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী প্রথমে কৃষিমন্ত্রী ও পরে শিল্পমন্ত্রী হিসেবে এবং সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ সমাজকল্যাণ মন্ত্রী হিসেবে অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যেও তাদের তৎপরতার একটি ভালো প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তারা মফস্বলে সফরের ব্যাপারে কিছু নিয়ম চালু করেন। যেমন—তাদের সংবর্ধনার জন্য কোনো ধরনের তোরণ নির্মাণ, মোটর সাইকেল শোভাযাত্রা বা কোনো প্রকার সাজসজ্জা নিষেধ করে দেন। সার্কিট হাউসে অবস্থানকালে স্থানীয় জামায়াত নেতাদের ব্যবস্থাপনায় তাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ, জেলাপ্রশাসন বা সরকারি খরচে কোনো খানার ব্যবস্থা নিষেধ করে দেওয়া হয়। জেলাপ্রশাসকদের জন্য এটা ছিল এক নতুন ও ভিন্ন অভিজ্ঞতা। সরকারি কর্মসূচির অগ্রাধিকার দিয়ে তা শেষ করার পর বিকেলের সময়টা দলীয় কোনো সমাবেশ করতেন। তা ছাড়া যে সময় সংশ্লিষ্ট জেলায় পৌঁছানোর কথা, ঠিক সেই সময়ই পৌঁছার চেষ্টা করতেন। তাদের এই সময়ানুবর্তিতা ছিল একটি ভালো দৃষ্টান্ত।

কৃষিমন্ত্রী হিসেবে মতিউর রহমান নিজামী কৃষি প্রতিমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে মন্ত্রণালয়ের কিছু কাজ বণ্টন করে দিয়েছিলেন। প্রতিমন্ত্রী নিজেই সেসব ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতেন। মির্জা ফখরুল ইসলাম গ্রেফতার হয়ে দুইবার এই কাশিমপুর কারাগারে কিছুদিন আটক ছিলেন। তখন আমরা একসঙ্গে সুরমা ভবনে থাকতাম। তিনি নিজেই আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি অত্যন্ত স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে কাজ করেছেন; যা অন্য কোনো প্রতিমন্ত্রীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এমনকি মন্ত্রীর যেসব দাওয়াত আন্তর্জাতিক কোনো সম্মেলনে বা ওয়ার্কশপে থাকত, সেখানেও মন্ত্রী মহোদয় প্রতিমন্ত্রীকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পাঠিয়েছেন। এটা সাধারণত অনেকেই করে না। কিন্তু নিজামী সাহেব

www.pathagar.org

তার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীকে এসব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। প্রতিমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নিজে এ ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

কৃষিমন্ত্রী হিসেবে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে সক্রিয় করেন। বিশেষ করে ব্লক সুপারভাইজারদেরকে মাঠে-ময়দানে গিয়ে কৃষকদের সহযোগিতা করে সক্রিয় ভূমিকা পালনে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে ইতিবাচক অবদান রাখেন। ব্লক সুপারভাইজারদের দাবি অনুযায়ী সহকারী কৃষিকর্মকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ায় তাদের মধ্যেও উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।

'চাষির বাড়ি বাগান বাড়ি' প্রকল্প নামে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে চাষিদের মধ্যে প্রণোদনা সৃষ্টি করা হয়। বিশেষ করে প্রতিটি জেলা সফরকালে *চাষির বাড়ি বাগান বাড়ি প্রকল্প* পরিদর্শন করে তৃণমূল পর্যায়ে কৃষকদের সাথে মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ স্থাপন করায় কৃষকরা সরাসরি মন্ত্রীর সাথে কথা বলার এবং তাদের সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারে মতবিনিময়ের সুযোগ পেয়ে উৎসাহিত হন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণের অভিযান পরিচালনা করায় সারা দেশে বৃক্ষরোপণের ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে যে দশটি গবেষণা সংস্থা রয়েছে, কৃষিমন্ত্রী হিসেবে মতিউর রহমান নিজামী ওইসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সহস্রাধিক কৃষিবিজ্ঞানীকে তাদের কার্যক্রমে উৎসাহিত করেন এবং সারা দেশের হাজার হাজার কৃষিবিদ এতে খুবই অনুপ্রাণিত হন।

(রাত ১১:০০ টা; ৭ নভেম্বর, ২০১৩)

www.pathagar.org

কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ে মাওলানা নিজামী

সম্ভবত সরকার গঠনের ২২ মাস পর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া আকস্মিকভাবে মন্ত্রণালয়ে রদবদল করে জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামীকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেন। আর কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেন এম কে আনোয়ারকে। দায়িত্ব পরিবর্তনের আগে প্রধানমন্ত্রী মাওলানা নিজামী সাহেবের সাথে কোনো আলোচনা করেননি। এমনকি নিজামী সাহেব মিডিয়ার মাধ্যমেই এই রদবদলের কথা জানতে পারেন।

স্বাভাবিকভাবেই নিজামী সাহেব বিব্রত হন এবং এতে জামায়াতের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া হয়। খবর শোনার পরপরই নিজামী সাহেবের সাথে কথা বলে আমি জানতে পারি, তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। এ ব্যাপারে বিবিসি আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমিও এমন সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করি। ওদিকে কয়েকটি পত্রিকা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লার কাছে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনিও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

রাত ১২ টার দিকে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হারিস চৌধুরী আমাকে জানান, পরদিন দুপুরে প্রধানমন্ত্রী লাঞ্চের সময় আমাকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ইতোমধ্যে বিবিসির লন্ডন অফিস থেকে নবনীতা চৌধুরী আমার আরেকটি সাক্ষাৎ গ্রহণ করেন এবং আমি তাকে অনেকটা খোলামেলাভাবে কথা বলি। যদিও-বা কোন মন্ত্রীকে কী দায়িত্ব দেবেন তা প্রধানমন্ত্রীরই এখতিয়ার; কিন্তু এক্ষেত্রে জামায়াত একটি ভিন্ন দল। আর মাওলানা নিজামী সেই দলের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী তার সাথে বিষয়টি আগেই আলাপ করে নিতে পারতেন। তাকে আদৌ না জানিয়ে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পরিবর্তন করায় মাওলানা নিজামীর জন্য তা ছিল খুবই বিব্রতকর। উপরন্তু বিএনপির কোনো এক সিনিয়র নেতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় যে, নিজামী সাহেবের পারফরম্যান্স সন্তোষজনক নয় বলেই রদবদল করা হয়েছে। এই মন্তব্য ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত।

www.pathagar.org

কারণ, মাওলানা নিজামী খুবই সন্তোষজনকভাবে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন এবং মন্ত্রণালয়ে একটা প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। সুতরাং, এই রদবদলে আমাদের মধ্যেও ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং বিবিসির সাথে সাক্ষাৎকারে সেই ক্ষোভের প্রকাশ ঘটে। বিবিসি সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সংক্ষেপে এবং রাত সাড়ে দশটা, পরদিন সকাল সাড়ে দশটা ও সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বিস্তারিতভাবেই আমার সাক্ষাৎকার প্রচার করে।

দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়ে দেখি, সেখানে আবদুল কাদের মোল্লাকেও ডাকা হয়েছে। যাহোক, আমরা প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। সাক্ষাতের আগে মোল্লা ভাইকে বললাম—'আপনি চুপ থাকবেন, যা বলার আমিই বলব।' এর কারণ ছিল, প্রথম আলোর সাথে সাক্ষাৎকারে মোল্লা ভাই যে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন, তা বেশ কড়া ছিল, যাতে প্রধানমন্ত্রীর রুষ্ট হওয়ারই কথা।

প্রথমেই প্রধানমন্ত্রী বললেন—'আমার সাথে আলাপ না করেই আপনারা মিডিয়ায় এমন প্রতিক্রিয়া দিলেন, যাতে বিরোধী মহল মনে করতে পারে, চারদলীয় জোটে নিশ্চয় ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে।'

আমি বললাম—'এটাকে খুব বড়ো করে দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। জোট সরকারে এমন ঘটনা ঘটতেই পারে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রীর দায়িত্বে পরিবর্তন করার এখতিয়ার আপনার আছে এবং আপনি তা করেছেন। ওদিকে পরিবর্তন আকস্মিকভাবে এবং কোনো আলাপ-আলোচনা ছাড়া হওয়ায় আমাদের পক্ষ থেকে যে প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে, সেটাও যুক্তিসংগত। আমি যখন নিজামী সাহেবের কাছে জানতে পারলাম যে, তিনি কিছুই জানতেন না, তখন আমার মধ্যেই প্রতিক্রিয়া হয়। আপনি আগেই তাকে জানালে ভালো হতো এবং আমাদের মধ্যেও কোনো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হতো না। আপনার দলের কাউকে উদ্ধৃত করে নিজামী সাহেবের পারফরম্যান্সের ব্যাপারে নেতিবাচক কথা মিডিয়ায় বলায় আমাদের মধ্যে আরও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। আর এই ক্ষোভের সঞ্চার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ, সব মহলই এটা স্বীকার করবে যে, নিজামী সাহেব বেশ ভালোভাবেই মন্ত্রণালয় চালাচ্ছেন।'

তখন প্রধানমন্ত্রী বললেন—'নিজামী সাহেব কৃষি মন্ত্রণালয় ভালোভাবে চালাচ্ছেন বলেই আমি তাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় শিল্প মন্ত্রণালয় দিয়েছি। যাতে করে তিনি এই মন্ত্রণালয়ও সাফল্যের সাথে চালান। আমি ভালো উদ্দেশ্যেই রদবদলটা করেছি, নিজামী সাহেবকে হেয় করার জন্য নয়।'

www.pathagar.org

আমাদের কথায় প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করলেন এবং বললেন—'আগে আলাপ করে নিলেই ভালো হতো। আমি চেষ্টাও করেছিলাম। মুজাহিদ সাহেবকে বলার জন্য খুঁজেছিলাম; কিন্তু তিনি তো বরিশাল সফরে ছিলেন।'

তখন আমি হেসে বললাম—'প্রধানমন্ত্রীর জন্য একজন মন্ত্রীর সাথে কথা বলা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, কথা বলা সম্ভব ছিল। তা ছাড়া নিজামী সাহেবকে সরাসরি না বলতে চাইলে আপনি আমাদেরকেও ব্যাপারটা জানাতে পারতেন।'

প্রধানমন্ত্রী বললেন—'আমি কিন্তু এম কে আনোয়ারকেও আগে জানাইনি।'

আমি বললাম—'তিনি তো আপনার দলের লোক। তা ছাড়া নিজামী সাহেব তো একটি দলের প্রধান এবং এ বিবেচনায় তার সাথে আলাপ করা হলে এই বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হতো না। আমাদের যখন মন্ত্রণালয় দেওয়া হয়েছে, তখন কিন্তু জামায়াতের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়া হয়নি। আপনি যেভাবেই দিয়েছেন, জামায়াত সন্তুষ্টচিত্তে সেভাবেই গ্রহণ করেছে। আকস্মিকভাবে মন্ত্রণালয় পরিবর্তন এবং পত্রিকায় কিছুটা বিরূপ মন্তব্য আসায় আমাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া যা হয়েছে, তা খুবই স্বাভাবিক। জোটের ঐক্যের ওপর এসবের কোনো প্রভাবই পড়বে না। আপনার এ ব্যাপারে শঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।'

এরপর প্রধানমন্ত্রী বললেন—'এখান থেকে যখন বের হবেন, মিডিয়া তো আপনাদের কথা শুনতে চাইবে, তখন কী বলবেন?'

আমি বললাম—'বলব, মন্ত্রণালয় থেকে অপসারণ বা রদবদল প্রধানমন্ত্রীর অধিকার। তিনি যেকোনো সময় যেকোনো মন্ত্রীর মন্ত্রণালয় রদবদল করতে পারেন। আগে থেকে আলোচনা না করায় আমাদের মধ্যে কিছুটা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নিজামী সাহেব সাফল্যের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয় চালিয়েছেন। তিনি যাতে শিল্প মন্ত্রণালয় আরও সাফল্যের সাথে চালান, এজন্যই আমি রদবদল করেছি। মন্ত্রণালয় রদবদলের এই ঘটনা জোটের ঐক্যে কোনো প্রভাব ফেলবে না। চারদলীয় জোটের ঐক্য আরও সুদৃঢ় হবে। এতে সরকারবিরোধীদের খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই।'

আমার কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী আমাদের হাসিমুখে বিদায় দিলেন।

www.pathagar.org

তারপর আমরা নামাজ পড়ে, লাঞ্চ করে বের হয়ে গেটে সাংবাদিকদের তা-ই বললাম, যা প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলাম।

তবে এদিন নিজামী সাহেব অফিসে যাননি। সন্ধ্যায় জামায়াতের বৈঠকে বিষয়টা পর্যালোচনা হয় এবং সবাই একমত হন যে, আমাদের প্রতিক্রিয়া জানানোটা সঠিক হয়েছে। তবে এই ইস্যুতে এরচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া দেখানোর প্রয়োজন নেই। আমরা নিজামী সাহেবকে অনুরোধ করি, নতুনভাবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার জন্য। নিজামী সাহেব নতুন উদ্দীপনা নিয়ে সে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এসেও সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

(রাত ১২:০০ টা; ৮ নভেম্বর, ২০১৩)

www.pathagar.org

জোট সরকারের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মহানগর নাট্যমঞ্চের অনুষ্ঠান

চারদলীয় জোট সরকারের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মহানগর নাট্যমঞ্চে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আমাদের দুই মন্ত্রী রাজধানীর বাইরে থাকায় জামায়াতের পক্ষ থেকে আমাকে সেই আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে হয়। কী বলব, তা নিয়ে কারও সাথে আলাপ করার সুযোগও আমার হয়নি। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে আমি কিছু কথা সেই আলোচনা সভায় বলি।

আমি বলি—'দুর্নীতি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আমাদের চারদলীয় জোট সরকারের অর্জনগুলোকে ম্লান করে দিচ্ছে। আমি এটাও বলি যে, উপমহাদেশ ও এশিয়ায় অনেক দেশে ক্ষমতাসীনদের স্বজন ও আত্মীয়দের দুর্নীতির কারণে অনেক বিখ্যাত রাজনৈতিক দলকে খেসারত দিতে হয়েছে।'

আমার বক্তব্যের পর সভার সভাপতি সাদেক হোসেন খোকা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন—'ভালো বলেছেন।'

পরের দিনের *যুগান্তর* পত্রিকায় মান্নান ভূঁইয়ার বক্তব্য ও আমার বক্তব্য পাশাপাশি দিয়ে বড়ো শিরোনাম করে। আমি যা বলেছি, মান্নান ভূঁইয়া তার বিপরীত কথা বলেছেন। অর্থাৎ, দুর্নীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা তিনি অস্বীকার করেন। বিপরীতমুখী বক্তব্য যুগান্তরে ছাপা হওয়ায় অনেকে খানিকটা বিব্রত হন বলে শুনেছি। এভাবে সমালোচনা না করাই উচিত বলে কেউ কেউ আমাকে নসিহত করেন।

ওই সপ্তাহেই আমি আমার স্ত্রী ও মেঝো ছেলে হাসান ইকরামকে নিয়ে ওমরা করতে সৌদি আরব যাই। সেখানে গিয়ে *ইনকিলাব* পত্রিকায় দেখলাম, আমার সেদিনকার বক্তব্য যা *যুগান্তর*-এ প্রকাশিত হয়েছে, সেই পেপারকাটিং নিয়ে

www.pathagar.org

জাতীয় পার্টির প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে অভিযোগ করেছে, জামায়াত সরকারে থেকে সরকারের সমালোচনা করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিষয়টি তিনি দেখবেন। অবশ্য দেশে ফিরে আসার পর যখন প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমার দেখা হয়েছে, তবে তিনি এ ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলেননি।

(রাত ১১:০০ টা; ৯ নভেম্বর, ২০১৩)

www.pathagar.org

জামায়াতের ইফতার পার্টিতে এরশাদের দাওয়াত প্রসঙ্গ

প্রতি বছর রমজান মাসে কেন্দ্রীয় জামায়াতের পক্ষ থেকে দুটো ইফতার মাহফিল করা হয়। একটি ইফতার পার্টি রাষ্ট্রদূতদের সম্মানার্থে এবং অপর একটি ইফতার পার্টি দেওয়া হয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জন্য। বলা যায়, দীর্ঘদিন থেকে এ দুটো ইফতার পার্টিতে মেহমানদের কার্ড পৌঁছানো থেকে শুরু করে অভ্যর্থনার দায়িত্বের সাথে আমি সম্পৃক্ত আছি। বিশেষভাবে কূটনীতিকদের ইফতার পার্টির পুরো আয়োজনটাই আমি করে আসছি।

হোটেল সোনারগাঁওয়ে আয়োজন করা হয় রাজনৈতিক নেতাদের ইফতার। কোনো কোনো বছর একান্ত বাধ্য হয়ে অফিসার্স ক্লাবে আয়োজন করতে হয়েছে। কূটনীতিকদের ইফতার পার্টি হতো শেরাটন অথবা সোনারগাঁওয়ে। এ যাবৎ বেশিরভাগ ইফতার পার্টি হোটেল সোনারগাঁওয়ে হয়েছে। ঢাকা রিজেন্সিতেও কখনও কখনও ইফতার পার্টি আয়োজন করতে হয়েছে।

চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় রাজনৈতিক নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানে হোটেল সোনারগাঁওয়ে এমনই এক ইফতার পার্টি আয়োজন করা হয়। সেই পার্টিতে আওয়ামী লীগের নেতাদেরও দাওয়াত করা হয়। সাবেক রাষ্ট্রপতিদের তালিকায় হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নামও ছিল। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমরা তাকেও দাওয়াত করি।

হেড টেবিলে কাকে কোথায় বসতে দিতে হবে, সেই তালিকা আমাদের সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে পৌঁছালে তিনি জানান—এরশাদ সাহেব যদি দাওয়াতে আসেন, তাহলে তো সমস্যা। সম্ভবত তিনি আমাদের আমীরের সাথেও আলাপ করেন। তারপর আমাকে সিদ্ধান্ত জানানো হয় যে, এরশাদ সাহেবকে আসার জন্য অনুরোধ করতে হবে না! কারণ, এতে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে বা হবে। এরশাদ সাহেবের আমন্ত্রণের কার্ড আমি নিজে গিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। ইফতারের দাওয়াত দিয়ে দাওয়াত ফেরত নেওয়া বড়ো রকমের অভদ্রতা ও অসৌজন্যমূলক কাজ। আর এই কাজটি আমাকেই করতে হবে।

www.pathagar.org

প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি নেতারা অসন্তুষ্ট হবেন বা ভুল বুঝবেন—এমন একটি সম্ভাব্য ধারণার ওপর আমাদের নেতৃবৃন্দ ইফতারের দাওয়াত ফেরত নেওয়ার মতো একটি কাজ করতে আমাকে বাধ্য করলেন। তাদের পেরেশান অবস্থা দেখে আমিও বোকার মতো প্রথমে মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদারের সহযোগিতা চাইলাম। আমি তাকে বললাম—'এরশাদ সাহেব এলে এখানে বিএনপির লোকেরা একটা বিব্রতকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, যা আমরা চাই না। আপনি স্যারকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন।' তিনি বললেন—'ভাই, আপনিই সরাসরি কথা বলুন। আপনি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে স্যার রাজি হয়ে যাবেন। যদিও-বা তিনি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছেন।' আমি বেকুবের মতো এরশাদ সাহেবকে ফোন করে অনেক ইনিয়ে-বিনিয়ে ব্যাপারটা বললাম। তিনি তো খুব চালাক মানুষ। তিনি বললেন—'ঠিক আছে, আমি তো রওনা দিয়েছিলাম। তুমি যেহেতু বললে, তোমাদের জন্য বিব্রতকর অবস্থা হচ্ছে, তাহলে আমি আর যাব না।' আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

সন্ধ্যার আগেই অর্থাৎ ইফতারের আগে আগে বিভিন্ন পত্রিকা থেকে আমার কাছে ফোন আসা শুরু হলো যে, আমি এরশাদ সাহেবের থেকে ইফতারের দাওয়াত ফেরত নিয়েছি এবং তিনি আমার ফোন পেয়ে রওনা করেও ফেরত গেছেন। একপর্যায়ে আমি একটু চালাকির আশ্রয় নিলাম; মানে আমার সেলফোনটি বন্ধ করে দিলাম। পরদিন সব পত্রিকায় খবরটি ছাপা হলো। আমাদের অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ফোন করে আমাদের তিরস্কার করলেন। আমার এক ঘনিষ্ঠ যুবক শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যবসায়ী তো দারুণ ক্ষোভ প্রকাশ করলেন এবং টেলিফোনে অনেক কথা বললেন। সত্যি বলতে কী, ব্যাপারটাতে আমি দারুণভাবে লজ্জিত বোধ করেছি। এ কাজটি করা আদৌ ঠিক হয়নি। এজন্য আজও আমি অনুতপ্ত।

একজন রাজনৈতিক নেতাকে ইফতারের দাওয়াত করে সেই দাওয়াতে তাকে না আসতে বলার মতো অভদ্র ও গর্হিত কাজটাই আমি করেছি। আমাদের নেতারা না হয় আমাকে বলেছিলেন, আমি তো এ কাজটা না করলেও পারতাম। এক্ষেত্রে আমারও প্রজ্ঞার অভাব ছিল। রাজনীতিতে আমাদের অভিজ্ঞতা কম থাকাটাও এজন্য দায়ী। বিষয়টি নিয়ে যখন ভাবি, তখন নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত বোধ করি।

www.pathagar.org

ওই ঘটনার পর আমি খুব সহজে এরশাদ সাহেবের সামনে পারতপক্ষে পড়িনি। কিন্তু হঠাৎ করে এক অনুষ্ঠানে দেখা হয়ে গেল তার সাথে। আমি তো খুব শঙ্কিত ছিলাম। কিন্তু তিনি এতটাই স্বাভাবিক আচরণ করলেন, যেন আমাদের মধ্যে কোনো ঘটনাই ঘটেনি। তিনি আগে যেমনটি দেখা হলে প্রথমে অধ্যাপক গোলাম আযমের কথা জিজ্ঞেস করতেন, সেদিনও তা-ই করলেন এবং অধ্যাপক সাহেবকে তার সালাম পৌঁছাতে বললেন।

(রাত ১২:৩০ টা; ১০ নভেম্বর, ২০১৩)

www.pathagar.org

জামায়াতের দুই মন্ত্রীর সততা সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে

জামায়াতের দুই মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের সততা সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চারদলীয় জোটের কোনো কোনো মন্ত্রী ও ক্ষমতাসীনদের কারও কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে এবং এ নিয়ে পত্রপত্রিকায় অনেক লেখালিখি হয়।

সাংবাদিকদের একটি গ্রুপ জামায়াতের দুই মন্ত্রীর দুর্নীতি খুঁজে বের করার জন্য অনেক চেষ্টা করেও পারেননি। এমনকি দুর্নীতির অনুসন্ধান করতে গিয়ে *মানবজমিন* পত্রিকার রিপোর্টার কেরামতউল্লাহ বিপ্লব জামায়াতের দুই মন্ত্রীর সততার কথা তুলে ধরেন। দুর্নীতিমুক্তভাবে তাদের মন্ত্রণালয় পরিচালনার চিত্র তুলে ধরতে তিনি বাধ্য হন। ব্যক্তিগতভাবে তারা যেমন দুর্নীতিমুক্ত ছিলেন, তেমনি দলীয় লোকেরাও মন্ত্রণালয়ের কোনো ধরনের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেননি। আর এ ব্যাপারে দলের লোকদের তারা বিন্দুমাত্র প্রশ্রয়ও দেননি।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী হিসেবে আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ নিয়ে অনেক কর্মকর্তার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জামায়াতের প্রতি বৈরী মিডিয়াও জামায়াতের দুই মন্ত্রীর কোনো দুর্নীতি আবিষ্কার করতে না পেরে হতাশ হয়। এরপরও দুয়েকটি পত্রিকা ব্লক সুপারভাইজার নিয়োগ করে কৃষিমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামীর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলেছিল। অথচ তার সময় এমন কোনো নিয়োগই হয়নি। নিয়োগ হলে তো দুর্নীতির প্রশ্ন ছিল বা প্রশ্ন তোলা যেত।

সমাজকল্যাণমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দলীয় ব্যক্তিদের পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন দেওয়ার একটি মিথ্যা অভিযোগ কেউ তুলেছিল, যা ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কূটনৈতিক মহলেও জামায়াতের দুই মন্ত্রীর সততার প্রশংসা করা হয়েছে।

www.pathagar.org

এমনকি আন্তর্জাতিক মিডিয়ার প্রতিবেদনে এই দুই মন্ত্রীকে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পশ্চিমা রাজনীতিকদের মধ্যে যাদের সাথেই আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তারা আমাদের দুই মন্ত্রীর সততার প্রশংসা করেছেন।

(রাত ১১:৩০ টা; ১২ নভেম্বর, ২০১৩)

www.pathagar.org

গণমাধ্যম ও জোট সরকার

চারদলীয় জোট সরকার গঠনের পর থেকেই আমি চেষ্টা করেছিলাম, অবাধ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রবাহের জন্য বেসরকারি পর্যায়ে কিছু পত্রিকা ও স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল গড়ে তুলতে উৎসাহিত করতে। আমি যেহেতু নিজে এ ব্যাপারে আগ্রহী ছিলাম, তাই নিজে থেকেই উদ্যোগ নিয়েছিলাম। জেলাপর্যায়ে আঞ্চলিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারেও আমি উৎসাহিত করি এবং বেশ কয়েকটি জেলায় আমাদের সমমনা অনেকেই কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

মীর কাসেম আলী একটি বড়ো কাজ করেন *নয়া দিগন্ত* নামে একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করে। আমি এতে খুবই আনন্দিত হই। এজন্য বাইরে থেকে যতটুকু সহযোগিতা করা সম্ভব, আমি তা করেছি। তবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অভিজ্ঞ মীর কাসেম সাহেব দলীয় প্রভাবমুক্ত বাণিজ্যিকভাবে সফল একটি জনপ্রিয় অথচ সুস্থ সংবাদপত্র উপহার দিতে সচেষ্ট ছিলেন। আমি মনে করি, এ ব্যাপারে *নয়া দিগন্ত* সূচনা থেকেই সফল হয়েছে।

একটি নতুন পত্রিকা প্রথম দিন তিন লক্ষাধিক সার্কুলেশন নিয়ে প্রকাশিত হওয়া এবং প্রথম কাতারের ২-৩টি পত্রিকার মধ্যে শামিল হওয়াটা নিঃসন্দেহে সাফল্যের দাবি করতে পারে।

একটি টিভি চ্যানেলের আত্মকথা

ব্যক্তিগতভাবে *নতুন পত্র* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে গিয়ে কোনো দিক থেকে সহযোগিতা না পেয়ে আমি খানিকটা বিক্ষুব্ধ ও হতাশ ছিলাম। জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে জামায়াতের যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে আমাকে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে সময় দিতে হয়েছে। জামায়াতের পক্ষ থেকে কূটনৈতিক যোগাযোগের মতো

www.pathagar.org

জটিল দায়িত্বটাও আমার ওপর ছিল। ওদিকে *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*-র সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। এটি জামায়াতের দলীয় মুখপত্র হলেও রাজনৈতিক বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদনের কারণে পত্রিকাটির ভালো সার্কুলেশন ছিল। বলা যায় সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে সর্বোচ্চ প্রচারসংখ্যার অধিকারী পত্রিকাটি। ফলে পত্রিকার মান ও গ্রাহক ধরে রাখার জন্য আমাকে পর্যাপ্ত সময় দিতে হতো।

জামায়াতের নেতাদের অনেকেই মনে করতেন, যেহেতু *সোনার বাংলা* দলীয় মুখপত্র, কাজেই পত্রিকাটিতে জামায়াত নেতাদের বড়ো বড়ো দাবি ও খবর ছাপাতে হবে। পুরো সপ্তাহে জামায়াত একটি বড়ো দল হিসেবে যেসব কর্মসূচির আয়োজন করত, তাতে এই পত্রিকার ১২ পৃষ্ঠায় সংকুলান করাও কঠিন ছিল। বিশেষ করে প্রথম পাতায় রাজনৈতিক বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদনের পরিবর্তে জামায়াতের খবর বা ছবি দলের নেতাদের চাহিদা মোতাবেক প্রকাশ করা কঠিন হতো। জামায়াতের শীর্ষ পর্যায় থেকে এসব ব্যাপারে আমার বিরুদ্ধে অনেক সময় অভিযোগ করা হয়েছে এবং অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করা হয়েছে। যেসব খবর ছাপার জন্য অথবা কোনো জনসভায় ভাষণের পূর্ণ বিবরণ ছাপার জন্য চাপ দেওয়া হতো, তা হয়তো-বা কদিন আগেই জামায়াতের মুখপত্র *দৈনিক সংগ্রাম* পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

সোনার বাংলা-র সার্কুলেশন যেহেতু বেশি, তাই জামায়াত নেতাদের অনেকেই চাইতেন, তাদের ভাষণের পূর্ণ বিবরণ যেন *সোনার বাংলা*-য় ছাপানো হয়। ওদিকে দৈনিক পত্রিকায় আগেই প্রকাশিত হওয়ার কারণে ওসব খবরের প্রতি পাঠকরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলতেন। *সোনার বাংলা*-র পাঠকদের পক্ষ থেকে আপত্তি আসত পুরোনো খবর এত বিস্তারিতভাবে ছাপানো প্রসঙ্গে। সাংবাদিকতার ছাত্র হিসেবে আমার কাছেও ব্যাপারগুলো ছিল বিব্রতকর ও অনাকাঙ্ক্ষিত। তা ছাড়া বাংলাদেশে দলীয় পত্রিকার সাফল্য সম্পর্কে বরাবরই আমার সংশয় ছিল। *আজাদ* টেকেনি। *ইত্তেহাদ* টেকেনি। *দেশ* টেকেনি। *দৈনিক জনতা*ও অগ্রসর হতে পারেনি বা *দৈনিক সংগ্রাম*ও ভালো করতে তথা গ্রাহক-পাঠক আকৃষ্ট করতে পারছে না।

আমার একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, সবাই যেন একটি মানসম্মত পত্রিকা হিসেবে *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা* হাতে নেয়। দল ও পাঠকদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে আমি হিমশিম খাচ্ছিলাম। যাহোক, বলা যায় শেষ পর্যন্ত দলেরই বিজয়

www.pathagar.org

হয়েছে। যদিও *সোনার বাংলা*-য় রাজনৈতিক প্রতিবেদন ও কলাম প্রকাশনা অনেক সংগ্রাম করে অব্যাহত রেখেছে। ফলে পত্রিকাটির গ্রাহক সংখ্যা দিনদিন বেড়েছে এবং পাঠক ধরে রাখতে এখনও সক্ষম হচ্ছে।

জামায়াতের সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে আমি আবার কেন একটি *সাপ্তাহিক নতুন পত্র* ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রকাশ করতে গেলাম, এ প্রশ্ন তোলা হলো। একটি ম্যাগাজিন সাইজ সাপ্তাহিক পত্রিকার ডিক্লারেশন নিয়ে তা প্রকাশের চেষ্টা করছি—এ কথাটি আমি তদানীন্তন জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমকে জানিয়ে রেখেছিলাম। ফলে সংশ্লিষ্ট অভিযোগ থেকে রক্ষা পেলাম বটে; কিন্তু কারও সহযোগিতা পেলাম না।

আমার ইচ্ছা ছিল, মাত্র ৬ টাকায় ২৪ পৃষ্ঠার একটি ম্যাগাজিন *যায় যায় দিন*-এর মোকাবিলায় নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দেবো। সাম্প্রতিককালে *যায় যায় দিন* পত্রিকাটি পরকীয়া ও নানা অবৈধ-অশালীন প্রেমকাহিনি ছেপে আমাদের নতুন প্রজন্মের চরিত্রকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছিল। এ কারণে *যায় যায় দিন*-এর হাত থেকে নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করার একটি তাগিদ অনুভব করছিলাম। ভিন্ন স্বাদের এবং স্বপ্ন দেখার মতো উদ্দীপনামূলক কোনো কিছু সামনে না দিয়ে *যায় যায় দিন*-এর সমালোচনা করে তো কোনো লাভ নেই।

আবেগের আতিশয্যে আমি আলাদা অফিস নিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশ শুরু করে দিলাম। বিদেশে থাকা কয়েকজন বন্ধুর কাছ থেকে পত্রিকায় বিনিয়োগ করার জন্য কিছু আর্থিক সহায়তা নিলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে কিছু বিনিয়োগ করলাম। এমন একটি পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রবাস থেকে অনেকে উৎসাহিত করেছিলেন। প্রবাসে দায়িত্বপালন করেন এমন একজনকে কিছু পত্রিকার কপি দিয়ে পরে জানতে পারলাম, তিনি ওসব নিয়ে যাননি।

পত্রিকাটি প্রকাশের পর জামায়াতের দায়িত্বশীলদের সৌজন্য কপি বণ্টন করার জন্য অফিসের একজন পিয়নকে দিই। সে আমার সম্পাদনায় একটি নতুন পত্রিকা বের হয়েছে দেখে উৎসাহের সাথে তা বিতরণ করে। তাকে পত্রিকাটি বিতরণ করতে দেখে জামায়াতের একজন বড়ো দায়িত্বশীল ধমক দিলে বেচারা কেঁদে ফেলে। বেশ পরে আমি ঘটনাটি জানতে পারি। অথচ জামায়াত অফিসে এ ধরনের অনেক পত্রিকা ও বই সৌজন্য হিসেবে আসে এবং তা অফিসের সহকারী বা পিয়ন যারা থাকে, তারাই নেতাদের টেবিলে টেবিলে বিতরণ করে থাকে। এই ঘটনায় আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে যাই। পত্রিকাটি বাজারজাত

www.pathagar.org

করার জন্য সহজাত যে চ্যানেল ছিল, তা আমার পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব হলো না। অনেকেই এটাকে আমার ব্যক্তিগত ব্যবসা মনে করেছেন। অথচ পত্রিকায় বিনিয়োগ করে ঝুঁকি নিতে যাবেন, এমন বোকা লোক কজনই-বা পাওয়া যাবে। ব্যবসা করতে হলে তো আরও অনেক লাভজনক ব্যবসা আছে।

একদিন অধ্যাপক গোলাম আযম *নতুন পত্র* সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন। আমি সব খুলে বললাম। তিনি বললেন—'এতসব দায়িত্ব পালন করে তুমি ওটা চালাবে কীভাবে? লোকসান বেশি হওয়ার আগেই প্রয়োজনে বন্ধ করে দাও।' শেষ পর্যন্ত প্রায় আট লাখ টাকা লোকসান দিয়ে আমি পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হই। আমি পরাস্ত হয়ে গেলাম। যাদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়েছিলাম, তাদের জানালাম। তাদের মধ্যে একজন নাছোড়বান্দার টাকা ক্রমান্বয়ে পরিশোধ করলাম। জানানোর পর দুইজন মেনে নিয়েছেন। অন্য একজন কিছু বলেননি; তবে লিখিত কাগজটি তার কাছে রেখে দিয়েছেন।

আমার চিন্তা ছিল, মিডিয়ার দিক থেকে আমাদের একটি সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। আমি নিজেও এ ব্যাপারে লিখিতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছি, যাতে মিডিয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। আমি নিজেও একটি স্যাটেলাইট চ্যানেলের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করে একটি দরখাস্ত জমা দিলাম তথ্য মন্ত্রণালয়ে। শামসুল ইসলাম সাহেব ছিলেন তথ্যমন্ত্রী এবং ব্যারিস্টার হায়দার আলী ছিলেন তথ্য সচিব। বিএনপির লিয়াজোঁ কমিটির প্রধান ছিলেন শামসুল ইসলাম সাহেব। তার সাথে বেশ দীর্ঘদিনের পরিচয় আমার। তা ছাড়া জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটির সদস্য হিসেবে আমরা অনেক বৈঠক করেছি একসাথে। বলা যায় একটা ভালো সম্পর্ক আছে।

দরখাস্ত দেওয়ার পর শামসুল ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি জানালেন, প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলে ব্যবস্থা করবেন। তিনি আমাকে বলেন, আমি যেন নিজেও প্রধানমন্ত্রীকে বলি। সামগ্রিক পরিস্থিতির ব্যাপারে আমার কিছু পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ দিই। আমি লিখিতভাবেই ওসব পরামর্শ দিই। কয়েকটা ব্যাপারে আমার পরামর্শ ছিল :

১. লিয়াজোঁ কমিটির নিয়মিত বৈঠক এবং সমন্বয় কমিটিকে সক্রিয় করা।

২. দুই-তিন মাস সময়ের ব্যবধানে হলেও লিয়াজোঁ কমিটির সাথে প্রধানমন্ত্রীর অনানুষ্ঠানিক বৈঠক বা চা-চক্র করা, যেখানে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে মতবিনিময় করা যেতে পারে।

www.pathagar.org

৩. যেসব মন্ত্রী, এমপি ও সরকারি কর্মকর্তার ব্যাপারে দুর্নীতির অভিযোগ আছে, তাদেরকে সরকার থেকে অবিলম্বে বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪. দেশ থেকে ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদে ব্যাপকভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এজন্য এনজিওদের ব্যবহার করা।

৫. নারীর মর্যাদা সমুন্নত করার স্বার্থে পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদ ও তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬. মিডিয়া সেক্টরে চারদলীয় জোটের অবস্থান মজবুত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।

৭. সুশীল সমাজ ও বিশিষ্ট পেশাজীবীদের উৎসাহিত করা ও কাজে লাগানো।

৮. আগামীতে দুর্নীতি একটি বড়ো ইস্যু হবে, এজন্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করা। আগামীতে ক্ষমতায় এলে দুর্নীতি নির্মূলে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে মর্মে জাতির কাছে প্রতিশ্রুতি প্রদান এবং এজন্য সহযোগিতা কামনা।

আমার উদ্যোগে HTV-Horizontal Television-এর জন্য একটি লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতে কথা বললে তিনি আমার কাছে বিস্তারিতভাবে শোনেন। আমার পরিকল্পনা শুনে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন—'ঠিক আছে, তথ্যমন্ত্রীকে বলবেন।' একদিন তথ্যমন্ত্রীকে আমার উপস্থিতিতেই তিনি বলেন—'কামারুজ্জামান যে টিভি চ্যানেলের কথা বলছে, তা দিয়ে দেন।' তথ্যমন্ত্রী শামসুল ইসলাম বললেন—'তারা তো দুইটা টিভির লাইসেন্স চেয়েছেন।' সেদিনই আমি জানলাম, দিগন্ত মিডিয়া কর্পোরেশন *দিগন্ত টিভি* নামে একটি দরখাস্ত করেছে। আমি দিগন্তের দেড় বছর আগে দরখাস্ত করেছিলাম।

টিভির অনুমোদনের জন্য সবার আগে আমি দরখাস্ত করেছিলাম। আমার দরখাস্তের একটি কপি হারিস চৌধুরীকে দিয়েছিলাম। এরপর আরও বেশ কয়েকটি দরখাস্ত বিএনপির কারও কারও পক্ষ থেকে করা হয়। বলা যায়, সরকারের তৃতীয় বছরে এসে প্রধানমন্ত্রী যখন আমার লাইসেন্স দিতে বললেন, তখন তথ্যমন্ত্রী শামসুল ইসলাম দিগন্তের দরখাস্তটার কথা বলে একটা সমস্যার সৃষ্টি করলেন। দিগন্তের জন্য অন্যদিক থেকেও প্রধানমন্ত্রীর কাছে আদেশ করা হয়েছে। তথ্যমন্ত্রী যদি বাধার সৃষ্টি না করতেন, তাহলে দুটোরই অনুমোদন হয়ে যেত।

www.pathagar.org

এরপর তথ্যমন্ত্রী শামসুল ইসলাম আমাকে বললেন—'আপনার নেতা অর্থাৎ জামায়াতের আমীর বিদেশে আছেন, তিনি ফিরে এলে তার সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' আরও এক মাস চলে গেল। এরপর একদিন আমাকে আমাদের সেক্রেটারি জেনারেল মুজাহিদ সাহেব ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন—'মীর কাসেম দরখাস্ত করেছে, তুমিও করেছ। কিন্তু সরকার তো একটা দেবে। তুমি ও মীর কাসেম মিলিতভাবে কাজটা করো।' এ ব্যাপারে আমি দ্বিমত করলাম। এরপর আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আমাদের আমীর ও সেক্রেটারি জেনারেল সম্ভবত পরামর্শ করে মীর কাসেম সাহেবের দরখাস্তটি বিবেচনা করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিলেন। এ কারণে সত্যি কথা বলতে আমি ভীষণ কষ্ট পাই ও বিক্ষুব্ধ হই। তবে মীর কাসেম ভাই যদি একটি টিভি চ্যানেল করেন, তাহলে তাতেও আমার উদ্দেশ্য সাধন হবে। অর্থাৎ, আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম, মীর কাসেম ভাইও তা-ই করতে চান, এটাই ছিল আমার সান্ত্বনা।

মুজাহিদ ভাই এটাও জানান—"মীর কাসেমের আর্থিক সংগতি ভালো এবং এ বিষয়টিও বিবেচনা করা হয়েছে।' আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হলো। তবে দিগন্ত টিভি চালু হওয়ায় আমি অনেক বেশি খুশি হয়েছিলাম।

(ভোর ২:৩০ টা; ১৪ নভেম্বর, ২০১৩)

www.pathagar.org

চারদলীয় জোট সরকারে জামায়াতের অর্জন

জোট সরকারে জামায়াতের দুই প্রধান নেতা আমীরে জামায়াত ও সেক্রেটারি জেনারেল মন্ত্রী হিসেবে যোগদান করার পর তাদের জন্য বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল মন্ত্রী হিসেবে যোগ্যতা ও সততার সাথে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সংগঠনে নেতৃত্ব দান। তারা অবশ্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বশক্তি নিয়োজিত করে দায়িত্বপালনের চেষ্টা করেছেন। উভয় কূল রক্ষার জন্য তারা যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু তাদের ফোকাসটা ছিল মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বপালন।

মন্ত্রী হিসেবে বিভিন্ন জেলা সফরকালে বিকেলের সময়টায় দলীয় কর্মী সম্মেলন বা সাংগঠনিক কর্মসূচিতে সময় দেবেন, মানে বক্তব্য রাখবেন বা প্রশ্নোত্তর দেবেন। সংগঠনের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সাহেবকে নিজের নির্বাচনী এলাকার জন্যও সময় দিতে হতো। এজন্য তাকে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হতো।

সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের ওপর অনেক দায়িত্ব ছিল। সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব কমিটির দায়িত্ব ছিল তার ওপর। সাংগঠনিক কমিটি, রাজনৈতিক কমিটি, ছাত্রবিষয়ক কমিটি, লিয়াজোঁ কমিটিসহ অনেক কমিটির তিনিই প্রধান ছিলেন। অফিস ও নিরাপত্তাবিষয়ক যাবতীয় দায়িত্ব তার ওপর ছিল। অন্যান্য কমিটিরও তিনি সদস্য ছিলেন। *দৈনিক সংগ্রাম* পত্রিকার চেয়ারম্যানও ছিলেন তিনি। সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে সবকিছুর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখাটা তিনি তার দায়িত্ব বলেই মনে করতেন। ছয়জন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল থাকা সত্ত্বেও সেক্রেটারি জেনারেল যাবতীয় দায়িত্ব নিজেই পালন করতেন।

বাংলাদেশকে প্রায় ১৫টি অঞ্চলে ভাগ করে আঞ্চলিকভাবে সংগঠনের কাজ দেখাশোনা করার জন্য একেকজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সহকারী সেক্রেটারি

www.pathagar.org

জেনারেলগণও একেকটা এলাকার দায়িত্ব পালন করতেন এবং সামগ্রিকভাবে সংগঠনের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ তাদের ছিল না। আর আগ বাড়িয়ে দায়িত্ব পালন করতে যাওয়াটা যেহেতু দোষণীয়, তাই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রে একটি শক্তিশালী টিম গড়ে তোলা যায়নি বা তোলা হয়নি। জামায়াত পাঁচ বছরে কী অর্জন করতে চায়, সেজন্য সেক্রেটারি জেনারেলের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটির পরিচালনা নীতি তৈরি করতেই প্রায় এক বছর লেগে যায়। মনিটরিংয়ের অভাবে এই কমিটির কাজও তেমনটা বাস্তবায়িত হয়নি।

পাঁচ বছর সরকারে থেকে জামায়াত কী অর্জন করল বা কোনো সমস্যা বা ভুলত্রুটি ছিল কি না, সে ব্যাপারেও জামায়াতের নীতিনির্ধারণী ফোরামে কোনো পর্যালোচনা হয়নি। এ বিষয়টি উপর্যুপরি দৃষ্টি আকর্ষণ এবং লিখিতভাবে অনুরোধ করার পরও আমাদের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ তা অ্যাজেন্ডা হিসেবে আলোচনায় আনেননি। আমি নিজে অনুরোধ করেছিলাম, পাঁচ বছর সরকারে থেকে জামায়াত কী অর্জন করেছে বা আমাদের ভুলত্রুটি কী ছিল, তার একটা পর্যালোচনা হওয়া উচিত। এটাও দাবি করেছি, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনে জোট সরকারের পাঁচ বছরের কার্যক্রমও পর্যালোচনা করা উচিত। এতে আমাদের লাভ ও ক্ষতি কতটা হয়েছে, তাও খতিয়ে দেখা দরকার।

জামায়াতের আমীর হিসেবে নিজামী সাহেব এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ কেন নেননি, তার ব্যাখ্যা আজও আমি জানি না। সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে মুজাহিদ ভাই একজন খুবই সক্রিয় ও উদ্যোগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও কেন এসবের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কোনো পদক্ষেপ নিলেন না, তাও আমার জানা নেই। আমার পক্ষ থেকে ব্যক্তিগতভাবে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করে তার কপি আমীরে জামায়াত ও নির্বাহী পরিষদের অন্যান্য সদস্যের হাতে আমি দিয়েছি। তারা এটা পাঠ করেছেন কি না বা আদৌ এটার কোনো গুরুত্ব দিয়েছেন কি না, তাও আমার জানা নেই। তবে নির্বাহী সদস্যগণ কেউ কেউ আমার পর্যালোচনায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

যাহোক, আমার কাছে ব্যাপারটা এখনও স্পষ্ট নয় যে, সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব একই ব্যক্তি পালন করার সুবিধা-অসুবিধা কী অথবা এসব ব্যাপারে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না?

www.pathagar.org

কর্মবণ্টনের মাধ্যমে এটার সমাধান দায়িত্বে থেকেও করা যেতে পারে বলে আমার মনে হয়। এসবই গবেষণা ও চিন্তাভাবনার ব্যাপার বলে আমি মনে করি। এক ব্যক্তির ওপর কয়টা দায়িত্ব দিলে তিনি সঠিকভাবে পালন করতে পারবেন, সেটাও বোধ হয় বিবেচনার প্রয়োজন আছে।

(ভোর ২:০০ টা; ১৫ নভেম্বর, ২০১৩)

www.pathagar.org

চারদলীয় জোট সরকারের পারফরম্যান্স

অস্বীকার করার উপায় নেই, চারদলীয় সরকারের বিশাল মন্ত্রিসভা ছিল। প্রধানমন্ত্রীর কতিপয় উপদেষ্টাসহ মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় সত্তরের মতো। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে কোনো সিনিয়র রাজনীতিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আরও Pro-active লোক নেওয়া উচিত ছিল। অনেকেই মনে করেন, ২০০১-এর মন্ত্রিসভার চাইতে বিএনপির ৯১ সালের মন্ত্রিসভার পারফরম্যান্স বা সক্রিয়তা ভালো ছিল এবং দুর্নামও কম ছিল। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে সিনিয়র ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া উচিত ছিল এবং তা প্রধানমন্ত্রীর ভাবমর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হতো।

মন্ত্রিসভায় যারা ভালো কাজ করেছেন, তারা প্রশংসিত হয়েছেন। অপরদিকে বেশ কিছু মন্ত্রীর ও মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি সম্পর্কে সমালোচনা ও অভিযোগ ছিল। সেসব ব্যাপারে ত্বরিত পদক্ষেপ নিতে না পারাটা ছিল জোট সরকারের ব্যর্থতা ও বিপর্যয়ের বড়ো কারণ।

ব্যক্তিগতভাবে জোট সরকারের পারফরম্যান্স সম্পর্কে আমি বরাবর অসন্তুষ্ট ছিলাম। সচিবালয়ে কোনো কোনো মন্ত্রীকে তদবিরবাজদের দ্বারা প্রভাবিত হতে দেখেছি। দেখেছি বিএনপি দলের মন্ত্রী-এমপিরা নিজেদের লোকদের খুব বেশি সমালোচনা করতেন। সমন্বয়ের অভাব ছিল যথেষ্ট। কিছু মন্ত্রণালয় ছিল খুবই নিষ্ক্রিয়। নিষ্ক্রিয় মন্ত্রণালয়ের মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছিল অন্যতম। বিদেশি বন্ধু ও উন্নয়ন সহযোগীদের নিয়মিত ব্রিফিং দেওয়া, পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের অবহিত রাখা এবং তাদের সহযোগিতা কামনা করার ব্যাপারে ছিল বড়ো ধরনের দুর্বলতা। অনেক কূটনীতিক আমার কাছে অভিযোগ করতেন, তোমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমাদের নিয়মিত ব্রিফিং করে না। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগ আমাদের সাথে অনেক বেশি যোগাযোগ রাখে এবং এ কাজ করার জন্য তাদের লোকও আছে অনেক।

www.pathagar.org

দুর্নীতির যেসব অভিযোগ উঠেছে, তার সবটা ঠিক না হলেও বেশ কিছু মন্ত্রী-এমপি যে দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে ব্যক্তিগত ভাগ্যোন্নয়নের পেছনে দৌড়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই।

তারেক রহমানকে কেন্দ্র করে যত দুর্নীতির প্রচার হয়েছে, তা অনেকাংশেই অবাস্তব। তাকে ব্যবহার করে কেউ কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন। সাঈদ ইসকান্দর সাহেব যা কিছু করেছেন, তার বদনামের অংশীদার হয়েছেন তারেক রহমান। তাদের দুর্নীতির মাধ্যমে তারেক রহমান কোনো সম্পদের মালিক হয়েছেন, এমন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। মানি লন্ডারিংয়ের যে মামলাটি হয়েছে, সেটা তো তার বন্ধু গিয়াসউদ্দিন আল মামুনের। তারেক রহমান প্রতিনিধি সম্মেলন করার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে দলকে সুসংগঠিত করায় মনোযোগ দিলে প্রতিবেশী দেশের গোয়েন্দা সংস্থা তার দিকে নজর দেয়। এটা ঠিক যে, ২০০১-এর নির্বাচনে বিএনপির বিজয়ের পেছনে তারেক রহমানের একটা অবদান ছিল। বগুড়ায় যে দৃষ্টিনন্দন উন্নয়নের কাজ করে দলের আস্থাকে সুসংহত করেন তারেক, সেটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল।

তারেক রহমান যে রাজনীতিতে আসছেন, এটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর তার চরিত্রহননের অংশ হিসেবেই তিলকে তাল করে প্রচার করা হয়েছে। তবে আরাফাত রহমান কোকোকে দলেরই কিছু স্বার্থপর লোক ব্যবহার করেছে। তাদেরকে টার্গেট করে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা এমন ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়, যা মানুষের মুখে মুখে চলে যায়। বিশেষ করে সেনাবাহিনীর মাঝে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দারুণ রকম বিষাক্ত প্রচারণা চালানো হয়েছে। এজন্য তারেক বা হাওয়া ভবনের কিছু কর্মকাণ্ড দায়ী ছিল, তা প্রমাণসাপেক্ষ। কিন্তু দুর্নীতি দমন কমিশন তো এই দীর্ঘ সময়ে তেমন কোনো জোরালো মামলা তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারেনি। প্রমাণাদি থাকলে শেখ হাসিনার সরকার কোনোভাবেই সুযোগ হাতছাড়া করত না। অনেকের মন্তব্য শুনেছি, তারেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তেমন কোনো প্রামাণ্য অভিযোগ তারা পায়নি।

(রাত ১২:০০ টা; ১৬ নভেম্বর, ২০১৩)

www.pathagar.org

বিএনপি-জামায়াত সম্পর্ক ও খালেদা জিয়া

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময় থেকেই বিএনপির সাথে জামায়াতের একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জিয়াউর রহমান যখন একদলীয় শাসনের অবসান ঘটিয়ে সর্বদলীয় রাজনীতি চালুর উদ্যোগ নেন, তখন তিনি জাতীয় ঐক্য ও সমন্বয়ের রাজনীতির কথা বলেন। আর তখনই তিনি জামায়াতের নেতাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন।

আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ ও ন্যাপের নেতাদের অনেকেই নবগঠিত দল বিএনপিতে যোগদান করলেও জামায়াতের কোনো নেতা বিএনপিতে যোগদান করেননি। মাওলানা আবদুর রহীম ও আব্বাস আলী খানসহ জামায়াতের অনেক নেতার সাথে শহীদ জিয়া সরাসরি যোগাযোগ করেছিলেন। জামায়াত, পিডিপি, নেজামে ইসলামের নেতারা ইসলামিক ডেমোক্র্যাটিক লীগ নামে দল গঠন করে আলাদাভাবে কাজ শুরু করেন।

আবদুস সবুর খান প্রথমে আইডিএলে যোগ দিতে চেয়েও মুসলিম লীগ পুনরুজ্জীবিত করেন এবং শহীদ জিয়ার সাথে একটি ভালো সম্পর্ক তার ছিল। শহীদ জিয়া যখন সর্বপ্রথম ১৯৭৯ সালে প্রাথমিকভাবে নির্বাচনের উদ্যোগ নেন, তখন আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনের বিরোধিতা করে। তখন সামরিক আইন প্রত্যাহারের স্বার্থে সর্বপ্রথম জামায়াতই (তখন ছিল আইডিএল) নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দেয়। এরপর খান এ সবুর সাহেবও নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। অতঃপর আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশ নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। জামায়াতের ইতিবাচক ভূমিকার কারণে জিয়াউর রহমান জামায়াতের ব্যাপারে নমনীয় হন।

১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ছাত্রশিবির সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রধান প্রধান কলেজগুলোতে বেশ শক্তিশালী অবস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

www.pathagar.org

চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, খুলনা বিএল কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, রংপুরের কারমাইকেল কলেজ, সিলেটের এমসি কলেজে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির ভালো অবস্থান সৃষ্টি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজধানীর অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইসলামী ছাত্রশিবির দৃশ্যমান শক্তিতে পরিণত হয়। ফলে রাজনৈতিক অঙ্গনে জামায়াতকে উপেক্ষা করা সহজ ছিল না। তবে জিয়ার শাসনামলে জামায়াতের রাজনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ শুরু হলেও প্রতিবন্ধকতাও তখনই শুরু হয়। বিশেষ করে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিএনপির ছাত্রসংগঠন ছাত্রদলের সাথে ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষ হয় এবং উভয় পক্ষে হতাহতের ঘটনা ঘটে। এমনকি ছাত্রশিবিরের অনেক সম্ভাবনাময় নেতা ও কর্মী ছাত্রদলের হাতে খুন হয়। ওদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবির পূর্ণ প্যানেলে বিজয়ী হওয়ার পর জিয়াউর রহমানের কান ভারী করা হয়। বামপন্থি একটি চক্র মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে জামায়াত ও শিবিরের বিরুদ্ধে উসকানি দিয়ে মাঠে নামায়। দেশের অসংখ্য জেলায় জামায়াত ও শিবিরের অফিসে হামলা-অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের প্ররোচনায় ছাত্রদল শিবিরের বিরোধিতা করে।

১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের শাহাদাতের পর জামায়াত বিএনপিকে প্রকাশ্যেই সমর্থন করে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও বিচারপতি আবদুস সাত্তারের প্রতি জামায়াত সমর্থন জানায়। তারও আগে জিয়াউর রহমান যে রেফারেন্ডাম আহ্বান করেন, তার প্রতিও জামায়াত জোরালো সমর্থন জানিয়েছিল। আর ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এরশাদ ক্ষমতা দখল করার পর জামায়াত এরশাদের সামরিক শাসনের বিরোধিতা করে সর্বপ্রথম প্রচারপত্র বিতরণ করে। তখন থেকেই বিএনপির সাথে জামায়াতের নিয়মিত যোগাযোগ শুরু হয়।

বেগম জিয়া যখন বিএনপির দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটি তার সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রেখেছে। ফলে অন্যান্য নেতাদের চাইতে বেগম জিয়ার সাথেই জামায়াত নেতাদের বেশি যোগাযোগ হতে থাকে। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে বিএনপি ও বেগম জিয়ার সাথে জামায়াতের খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তা ছাড়া মাঠে-ময়দানে জামায়াতের তৎপরতায় বেগম জিয়া নিজে সন্তুষ্ট ছিলেন।

www.pathagar.org

১৯৯১ সালের নির্বাচনে বেগম জিয়ার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বিএনপির নেতৃত্বের একাংশের কারণে বিএনপির সাথে জামায়াতের নির্বাচনী সমঝোতা হয়েও শেষ পর্যন্ত তা ভেঙে যায়। জামায়াত এককভাবে নির্বাচন করে ১৮টি আসন লাভ করে এবং কোনো কিছু না নিয়েই বিএনপিকে সরকার গঠনে সমর্থন করে। বেগম খালেদা জিয়ার অনুরোধে কোনো শর্ত ছাড়াই তদানীন্তন জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম সমর্থন দেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হন। জামায়াতের আন্তরিকতা, কথা ও কাজের মিল এবং নিঃস্বার্থভাবে দেশের স্বার্থে কাজ করার প্রবণতা বেগম জিয়া নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন। এসব কারণেই বিএনপির সাথে জামায়াতের একটা সখ্য ও সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া চারদলীয় জোট গঠন হওয়ায় পর নির্বাচন ও মাঠে-ময়দানে সারা দেশেই জামায়াতের নেতাকর্মীরা যেভাবে আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন, তা বিএনপির অনেক নেতাই স্বীকার করেন। এজন্য বিএনপি নেতাদের অনেকেই সরাসরি জামায়াত কার্যালয়ে এসে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

বামপন্থি ও আওয়ামী লীগাররা প্রকাশ্যেই বিএনপিকে জামায়াতের সাথে সম্পর্ক না রাখার জন্য প্রচারণা চালিয়ে আসছে, যা বর্তমানে আরও প্রচণ্ড রূপ নিয়েছে। বিএনপির মধ্যেও কিছু লোক আছেন, প্রোপাগান্ডার কারণে হোক বা রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণেই হোক, জামায়াতের ব্যাপারে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন না। কিন্তু জামায়াতের ব্যাপারে বেগম খালেদা জিয়ার কথা অত্যন্ত পরিষ্কার। তাকে কেউই জামায়াতের বিরুদ্ধে বলে সুবিধা করতে পারেনি। বেগম জিয়া যদি শক্ত ভূমিকা পালন না করতেন, তাহলে বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে কোনো জোট হওয়া হয়তো সম্ভব হতো না।

অনেক ঘটনা ও চড়াই-উতরাইয়ের মধ্যে জামায়াত-বিএনপির মধ্যকার রাজনৈতিক সমঝোতা টিকে আছে।

১৯৯১ সালে জামায়াতের সমর্থনে বিএনপি সরকার গঠনের পর আশা করা হয়েছিল, অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ইস্যুটি সমাধান করা হবে। কিন্তু বিএনপি তা করেনি; বরং ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গণ-আদালত গঠন করে রাজপথে বিচারের প্রহসন করে। একপর্যায়ে বিএনপি সরকার অধ্যাপক সাহেবকে গ্রেফতার করে এবং ১৬ মাস কারাগারে কাটানোর পর আইনি লড়াইয়ে তিনি নাগরিকত্ব লাভ করেন। হাইকোর্টের রায় নাগরিকত্বের পক্ষে

www.pathagar.org

আসার পর জামায়াত মনে করেছিল, সরকার হয়তো আপিল করবে না। কিন্তু বিএনপি সরকার অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্বের বিরুদ্ধে আপিল করে। অবশ্য আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে সর্বসম্মতভাবে অধ্যাপক গোলাম আযম তার নাগরিকত্ব ফিরে পান।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বিএনপির সাথে জামায়াত চারদলীয় জোট গঠন করে। চারদলীয় জোট গঠনের ব্যাপারে এবং এই জোটে ইসলামী দলগুলোকে (জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোট) সংযুক্ত করার ব্যাপারেও বেগম খালেদা জিয়াই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

(ভোর ২:৩০ টা; ১৭ নভেম্বর, ২০১৩)

www.pathagar.org

চারদলীয় জোট সরকারের শেষের দিকের কিছু ঘটনা

চারদলীয় জোটের মেয়াদের শেষের দিকে আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা সাবেক প্রধান বিচারপতি হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে আন্দোলন শুরু করে। তাদের অভিযোগ ছিল, বিচারপতিদের চাকরির বয়স দুই বছর বাড়িয়ে যাতে বিএনপির অনুগত বিচারপতি হাসান অবসরের পর প্রধান উপদেষ্টা হতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ সময় আমেরিকা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার রাষ্ট্রদূত অনেক সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং একপর্যায়ে জাস্টিস হাসান প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন। তাকে একদিকে যেমন হুমকি দেওয়া হচ্ছিল, অন্যদিকে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের কেউ কেউ তাকে এ দায়িত্ব না নিতে বলেন। পর্দার অন্তরাল থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কাজ করেছেন। তবে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত বিউটেনিস এবং ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

আওয়ামী লীগ চেয়েছিল সাবেক প্রধান বিচারপতি মাহমুদুল আমিন চৌধুরীকে প্রধান উপদেষ্টা করতে। কিন্তু কীসব তথ্যের ভিত্তিতে বেগম খালেদা জিয়া তাতে রাজি হননি। আমরা শুনেছিলাম, তিনি নাকি ছাত্রজীবনে আবদুস সামাদ আজাদের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেছেন ইত্যাদি। তবে জামায়াতের আমীর মতিউর রহমান নিজামী তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অনুরোধ করেন—'এই দাবি মেনে নিয়ে বিচারপতি মাহমুদুল আমিন চৌধুরীকে টেলিফোন করে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করুন।' জনাব নিজামী আমাদের সামনেই ঢাকা মহানগরী জামায়াতের অফিস থেকে এ টেলিফোন করেন। কিন্তু বেগম খালেদা জিয়াকে কেউ বিচারপতি মাহমুদুল আমিনের ব্যাপারে নেতিবাচক তথ্য দেওয়ায় তিনি এতে সম্মতি দেননি। তবে এসব তথ্য সঠিক ছিল বলে মনে হয় না।

www.pathagar.org

রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ দুই প্রধান দলের মহাসচিব যথাক্রমে আওয়ামী লীগের আবদুল জলিল ও বিএনপির আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে আলোচনার জন্য বঙ্গভবনে আমন্ত্রণ জানান। সংবিধান মোতাবেক সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি দায়িত্ব নিতে রাজি না হলে তার আগের জন, তিনি রাজি না হলে আপিল বিভাগের কোনো জ্যেষ্ঠ বিচারপতি, তিনিও রাজি না হলে কোনো বিশিষ্ট নাগরিক এবং বিশিষ্ট কোনো নাগরিকের ব্যাপারে সমঝোতা না হলে বা না পাওয়া গেলে সর্বশেষ অপশন ছিল রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি নিজেই সেই দায়িত্ব নিয়ে নির্বাচনকালীন উপদেষ্টা গঠন করে নির্বাচন পরিচালনা করবেন।

কিন্তু রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ সবগুলো অপশন বিবেচনা না করেই প্রস্তাব করেন—তিনি নিজে দায়িত্ব নিলে কেমন হয়? বিএনপি হয়তো মনে করেছিল, এটা তাদের জন্য ভালো হবে। আবার রাষ্ট্রপতি সরাসরি নিজের কথা বলায় সামনাসামনি কোনো আপত্তি না করে আবদুল জলিল সাহেবও মেনে নেন। পরে তার দলের নেতা শেখ হাসিনা ও অন্যরা এটা মানতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নিজেকে প্রধান উপদেষ্টা ঘোষণা করেন। অবশ্য তিনি দুই দলের পক্ষ থেকে পরামর্শ নিয়ে ড. আকবর আলী খান, সিএম শফি সামি, সুলতানা কামাল, জেনারেল হাসান মশহুদ চৌধুরীসহ মোটামুটি একটি ভালো টিমকে নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন।

ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ ভালো টিম গঠন করলেও টিমওয়ার্ক করেননি এবং উপদেষ্টা পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিপরীত বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আলোচনা ছাড়াই কাজ করতে থাকেন। ওদিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুল আজিজকে নিয়ে সংকট সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগ তার পদত্যাগ দাবি করে। নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করতে গিয়ে যাদেরকে আনা হয়, তারা সেই অর্থে নিরপেক্ষ ছিলেন না। এতেও বিপত্তি সৃষ্টি হয় এবং অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রপতির সাথে উপদেষ্টাদের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। উপদেষ্টা পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিপরীত কাজ করতে থাকেন রাষ্ট্রপতি। তখন যে ব্যাপারগুলো ঘটছিল, তাতে আওয়ামী লীগের অভিযোগ ছিল—রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ অন্য জায়গা থেকে নির্দেশ নিয়ে তা বাস্তবায়ন করেন।

এ রকম একটা পরিস্থিতিতে অবস্থা বোঝার জন্য ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক ও আমি উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য জেনারেল হাসান মশহুদ চৌধুরীর

www.pathagar.org

সাথে একটি বৈঠক করি। তার বাসভবনের ভাড়াটিয়া মেজর (অব.) আফসারের মধ্যস্থতায় বৈঠকটি মেজর আফসারের ফ্ল্যাটেই অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দুই ঘণ্টার এই বৈঠকে তিনি আমাদের যা জানান, তাতে আমরা খুবই হতাশ ও বিব্রত হই। তিনি পকেট থেকে নোট বের করে অনেক প্রমাণ দেন, উপদেষ্টা পরিষদকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্রপতি কাজ করছেন। কেউ তার ওপর সন্তুষ্ট নন।

জেনারেল হাসান মশহুদ চৌধুরী এটাও বলেন, তিনি নিজে পদত্যাগপত্র সব সময় তার পকেটে রেডি রাখেন এবং যেকোনো মুহূর্তেই পদত্যাগ করতে পারেন। ঘটনাক্রমে তিনি আমাদের কাছে জানতে চান—'লোকেরা বলে থাকেন, আপনারা নাকি আমাকে উপদেষ্টা করার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। কেন তা করলেন এবং আপনাদের কারও সাথে তো আমার জানাশোনা নেই বা আপনারা এ ব্যাপারে আমার সাথে কথাও বলেননি।' আমরা বলি, তার সৎ জীবনযাপন সম্পর্কে জানতে পেরেই আমরা তার নাম সুপারিশ করেছি। আর যেহেতু এতে আমাদের কোনো ধরনের স্বার্থ হাসিল বা সুবিধা লাভের চিন্তা ছিল না, তাই আমরা কিছু জানানোর প্রয়োজন মনে করিনি। তিনি বললেন—'যেহেতু আমাকে কোনো কিছু না জানিয়ে বা আমার সাথে আলাপ ছাড়াই আপনারা আমার নাম প্রস্তাব করেছিলেন, তাই আমারও আগ্রহ ছিল আপনাদের সাথে কথা বলার। আফসারের উদ্যোগে সেটাও হয়ে গেল। চেষ্টা করে দেখব, যদি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করতে পারি, তাহলে থাকব। আর যদি না পারি, তাহলে পদত্যাগ করব; যা সব সময় পকেটেই রাখি।'

আমাদের এই আলাপের কিছুদিন পরই ড. আকবর আলী খান, শাফি সামি, সুলতানা কামালসহ জেনারেল হাসান মশহুদ পদত্যাগ করেন। ফলে আবার একটি সংকট সৃষ্টি হয়। এরপর তাদের পরিবর্তে যাদেরকে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য করা হয়, তারাও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। তারা হলেন বিচারপতি ফজলুল হক, ড. সোয়েব (সাবেক শিল্পসচিব) এবং আশার পরিচালক শফিকুল কে চৌধুরী প্রমুখ। দুর্বল রাষ্ট্রপতি ও দুর্বল উপদেষ্টা পরিষদ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সঠিক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়। ক্রমান্বয়ে পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। প্রশাসন ভেঙে পড়ে এবং ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও পুলিশ বাহিনীকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের উপদেষ্টা পরিষদ। তিনি সত্যিকার অর্থেই অথর্ব ও মেরুদণ্ডহীন এক ব্যক্তি ছিলেন। তার তেমন কোনো রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও ছিল না।

www.pathagar.org

তাকে রাষ্ট্রপতির মতো দায়িত্বে বসানোটাই ছিল বিএনপির বড়ো ভুল। পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। দেশের মানুষ বিরক্ত হয়ে ওঠে। রাস্তায় রাস্তায় সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক সংকট নিয়ে আলোচনা করতে থাকে। এমনকি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে কোনো ধারা বিবেচনা না করেই ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তাও রাস্তাঘাটে আলোচনা হতে শুনেছি। এমন সংবিধান চর্চা আমার জীবনে কোনোদিন দেখিনি।

(রাত ০১:৩০ টা; ১১ জানুয়ারি, ২০১৪)

পুনশ্চ : আবদুল কাদের মোল্লা ভাইকে অন্যায়ভাবে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে খুন করার পর বেশ কিছুদিন এ লেখাটা বন্ধ রেখেছিলাম বা লিখতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলাম। অনেক দিন পর আবার শুরু করেছি।

www.pathagar.org

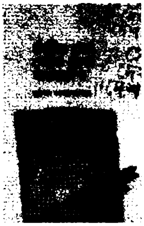

২৮ অক্টোবর ২০০৬-এর ট্র্যাজেডি : হাসিনার লগি-বৈঠার তাণ্ডব ও বর্বরতা

আমি আজও জানি না, মেয়াদের শেষটায় এসে বিএনপি ও জামায়াত কেন শোডাউন করে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আর যদিও-বা সিদ্ধান্ত নিল, তাহলে চারদলীয় জোটের সমাবেশ না করে একই দিন রাজধানীতে আলাদা আলাদা জনসভার সিদ্ধান্তই-বা কেন নেওয়া হয়। বিএনপি নয়াপল্টন অফিসের সামনে আর জামায়াত বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে সমাবেশের আয়োজন করে।

ওদিকে ২৮ অক্টোবর একই দিনে পল্টনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দলের সমাবেশ ডাকা হয়। সারা দেশ থেকে শেখ হাসিনা নেতাকর্মীদের লগি-বৈঠা নিয়ে ঢাকার পল্টনে হাজির হওয়ার ঘোষণা দেন। অথচ পল্টন থেকে নিকটেই জামায়াত জনসভার ঘোষণা দেয়। এজন্য জামায়াতের যথাযথ প্রস্তুতিও ছিল না। তিনটায় সভা অথচ সকালেই ১৪ দলের নেতাকর্মীরা জড়ো হতে শুরু করে। ১১ টায় পল্টন মোড়েই জামায়াতের সামান্য কিছু স্বেচ্ছাসেবকের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। জামায়াতের পক্ষে ধারণা করাও কঠিন ছিল যে, এত সকালেই সংঘর্ষ শুরু হবে। প্রস্তুতি নিয়ে শেখ হাসিনার নির্দেশে উত্তর গেটগামী বিভিন্ন সড়ক ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে জামায়াতের ওপর হামলা শুরু হয়। হামলার সময় পল্টন মোড়ে দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মকর্তাকে সেখান থেকে প্রত্যাহার করে অন্যত্র দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেখানে কমান্ড দেওয়ার মতো কোনো কর্মকর্তা ছিল না। প্রায় দুই শতাধিক পুলিশ সেখানে উপস্থিত ছিল। তারা যদি পল্টন মোড়ের রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করত, তাহলেও সেখানে সংঘর্ষ হওয়ার সুযোগ হতো না। কিন্তু পুলিশ ফুটপাথে উঠে গিয়ে কমান্ডহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। আর ১৪ দলের সন্ত্রাসীরা ইচ্ছামতো নিরস্ত্র জামায়াত কর্মীদের ওপর দফায় দফায় হামলা চালাতে থাকে। এই হামলা ১১ টা থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত একটানা অব্যাহত ছিল।

www.pathagar.org

সেদিন বিনা প্রস্তুতিতে জামায়াত বিশেষ করে শিবিরের তরুণ কর্মীরা শেখ হাসিনার লগি-বৈঠাধারী সন্ত্রাসীদের যে পৈশাচিক হামলার শিকার হয়, তা দেশবাসী ও বিশ্ববাসী স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে দেখেছেন। পল্টন মোড়ে জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়, যেভাবে মানুষ সাপ পিটিয়ে মারে। হত্যার পর তার বুকের ওপর দিয়ে লাফানোর ছবিও দেশবাসীকে দেখতে হয়। ঘটনাস্থলেই সাতজন এবং হাসপাতালের নেওয়ার পর আরও ছয়জন শাহাদাতবরণ করেন। এরা সবাই শিবির বা জামায়াতের নেতাকর্মী। প্রতিভাবান কতগুলো প্রাণ ঝরে যায়!

হত্যাকাণ্ড উপেক্ষা করেই তিনটায় উত্তর গেটে জামায়াতের জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই জনসভার সময় বিপুল পরিমাণ শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। সেদিন জামায়াতের আমীর মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা আবদুস সুবহান, মাওলানা সাইদী, সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুজাহিদ ও আমি ওই জনসভায় বক্তৃতা করি। মতিউর রহমান নিজামীর বক্তৃতার সময় মুহুর্মুহু বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। আকাশ-বাতাস বোমার শব্দে প্রকম্পিত হচ্ছিল। শিবির-জামায়াত কর্মীরা মানবপ্রাচীর তৈরি করে ১৪ দলের আক্রমণ প্রতিহত করেন। ইতোমধ্যে আহতদের রক্তে পল্টন মোড়, বায়তুল মোকাররম উত্তর গেট ও সংলগ্ন এলাকা এবং ঢাকা মহানগরী জামায়াতের অফিস প্রাঙ্গণ লাল হয়ে যায়। শত শত কর্মীকে আহত অবস্থায় বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়। আমরা কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ মহানগর জামায়াত অফিসে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ি। সামান্য পুলিশ প্রটেকশন পর্যন্ত আমাদের জনসভায় ছিল না।

পুলিশের আইজির সাথে যোগাযোগ করেও কাজ হয়নি। কেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বা তদানীন্তন সরকার আওয়ামী লীগের আক্রমণের মুখে জামায়াতকে অরক্ষিত অবস্থায় ঠেলে দিয়েছিল, তা স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরই বলতে পারবেন। তখন পুলিশের আইজি দায়িত্বে অবহেলা করেছেন, এটা স্বতঃসিদ্ধ। ঘটনার পর একটি লিখিত অভিযোগ নিয়ে জামায়াতের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে আমি পুলিশের আইজি আনোয়ার ইকবালের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। তিনি ভালো জবাব দিতে পারেননি। তবে আকার-ইঙ্গিতে বাবর সাহেবকেই দায়ী করেছেন। ২৮ অক্টোবরের ওই ঘটনার দিন আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা ছিল জামায়াতের জনসভা ভেঙে মঞ্চ পুড়িয়ে দিয়ে নয়াপল্টনে বিএনপির জনসভা ভাঙার জন্য তারা অভিযান চালাবে। কিন্তু মানবপ্রাচীর তৈরি করে শাহাদাতের বিনিময়ে জামায়াত-শিবির তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়। রক্তের বিনিময়ে, চড়ামূল্য দিয়ে ১৪ দলের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে জামায়াত

www.pathagar.org

কর্মীরা দীর্ঘ সাত ঘণ্টা বুক চিতিয়ে লড়াই করেন; এরপর সন্ধ্যা ৬ টার দিকে বিডিআর ঘটনাস্থলে এলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। আমরাও পর্যায়ক্রমে আট-নয়টার দিকে যার যার অবস্থানে ফিরি।

এদিকে স্যাটেলাইট টিভির বদৌলতে পল্টন মোড়ের নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং হত্যার পর লাশের ওপর লাফানোর ছবি বারবার দেখানোতে সারা দেশে তোলপাড় শুরু হয়। এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপির অনেক নেতা ঘটনার নিন্দা করেন এবং জামায়াতের প্রতি সহমর্মিতা জানান। অনেক বিদেশি রাষ্ট্রদূত জামায়াত কার্যালয়ে এসে দুঃখ প্রকাশ করেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিউটেনিস জামায়াত অফিসে এসে ঘটনার ভিডিও ফুটেজ দেখে কেঁদে ফেলেন এবং জামায়াত নেতাদের সান্ত্বনা দেন। এরপর আমরা হোটেল সোনারগাঁওয়ে ঢাকাস্থ সকল রাষ্ট্রদূতকে দাওয়াত করে ২৮ অক্টোবরের লগি-বৈঠার বর্বর ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের ভিডিও ফুটেজ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করি। সবাই হত্যাকাণ্ডের বর্বরতা দেখে বিস্মিত হন, ব্যথিত হন এবং জামায়াতের প্রতি সহানুভূতি জানান। এই ঘটনায় আমাদের পক্ষ থেকে মামলা করা হয়। বিপরীতে আওয়ামী লীগ আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করে; জামায়াত আমীরসহ আমাদের অনেক নেতার নাম দেওয়া হয় এফআইআরে। আমাকেও আসামি করা হয়। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর এই খুনের প্রত্যক্ষভাবে দায়ী আওয়ামী নেতাদের মামলা তুলে নেয়। আমাদের নেতাকর্মী নিহত হলো; অথচ আমাদের বিরুদ্ধে এখনও ঝুলে আছে সেই মামলা!

চারদলীয় জোটের একসাথে জনসভা করাই স্বাভাবিক ছিল। অথচ জামায়াতকে আলাদাভাবে জনসভা করতে বাধ্য করে এমন ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডের মুখে ঠেলে দেওয়ার ঘটনায় আমাদের অনেক কর্মী অসন্তুষ্ট ছিলেন। আর জামায়াতই-বা কেন শেষ বেলায় ভালোভাবে চিন্তাভাবনা ও প্রস্তুতি না নিয়ে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে সভা করতে গেল? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রস্তুতি নিয়ে যদি জামায়াত সভা করতে যেত, তাহলে হয়তো-বা এতটা বিপর্যয় ঘটত না। বিএনপি কেন জামায়াতকে আলাদাভাবে সভা করতে বাধ্য করল, তা ভাবতেও আমার বুদ্ধিগতভাবে খুব খারাপ লাগে। যাহোক, জামায়াত যেহেতু বিএনপির সাথে ভাগ্য জড়িয়ে ফেলেছে, তাই আমরা মানিয়ে নিলাম এবং পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতিও জোটবদ্ধভাবে নেওয়া শুরু করলাম।

(রাত ১:৩৫ টা; ১২ জানুয়ারি, ২০১৪)

www.pathagar.org

জরুরি আইন জারি : বদলে গেল দৃশ্যপট

আমার নির্বাচনী এলাকায় সকাল থেকেই গণসংযোগে ব্যস্ত ছিলাম। বিকেল তিনটার দিকে আমার নিজ ইউনিয়ন বাজিতখিলায় বাজারের সামনে একটি পথসভায় বক্তৃতা করার সময় আমার মোবাইল ফোনে জানতে পারলাম, দেশে জরুরি আইন জারি হয়েছে এবং নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। সংক্ষেপে বক্তব্য শেষ করে শহরে আমার শ্বশুরবাড়ি চলে এলাম এবং দ্রুত প্রস্তুতি নিয়ে ঢাকার পথে রওনা করলাম।

শেরপুর শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার পথ আসার পর অর্থাৎ নকলা বাজার অতিক্রম করে প্রায় চার কিলোমিটার আসার পর জামায়াতের আমীর মতিউর রহমান নিজামী সাহেবের সাথে মোবাইলে কথা বললাম। তিনি বললেন— 'ঢাকায় কারফিউ দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যার পর থেকে কারফিউ।' গাড়িচালকের সাথে আলাপ করে হিসাব করে দেখলাম, ঢাকায় পৌঁছতে পৌঁছতে আমরা কারফিউয়ের মধ্যে পড়ে যাব। তাই ড্রাইভারকে বললাম গাড়ি ঘেরাতে। ফিরে এলাম শেরপুর। সিদ্ধান্ত হলো আগামীকাল সকালে ঢাকায় রওনা করব।

রাতে টিভিতে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের ভাষণ শুনলাম। ঢাকায় ফোন করে অনেকের কাছ থেকে সেদিন ঘটে যাওয়া বঙ্গভবনের ঘটনা জানতে পারলাম। সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদ ও লে. জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীসহ একদল সেনা কর্মকর্তা বন্দুকের মুখে অসুস্থ রাষ্ট্রপতির হাতে একটি লিখিত কাগজ দিয়ে জরুরি আইন জারি করতে বাধ্য করেন। রাষ্ট্রপতির প্রেস উপদেষ্টা মুখলেসুর রহমান চৌধুরী ভাষণটিতে দুয়েক জায়গায় পরিবর্তন করেন। এজন্য মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী তাকে শারীরিকভাবে অপদস্থ করেন এবং মুখলেসুর রহমান চৌধুরী গভীর রাতে হেঁটে কোনোমতে জীবন নিয়ে তার বাসভবনে ফিরে আসেন।

ভাষণে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ এবং ২২ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেন।

www.pathagar.org

পরদিন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ফখরুদ্দীন আহমদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। তিনি একটি নতুন উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন, হাসান আরিফ, গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী, ইফতেখার আহমদ চৌধুরী, প্রফেসর হোসেন জিল্লুর রহমান, মেজর জেনারেল আবদুল মতিন, রাশেদা কে চৌধুরী, আনোয়ারুল ইকবাল, মির্জা আজিজুল ইসলাম, মে. জে. মতিউর উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। শপথ অনুষ্ঠানে বিএনপি ও জামায়াত নেতারা অংশগ্রহণ করেননি। শেখ হাসিনা দলবল নিয়ে শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং উল্লাস প্রকাশ করেন। বঙ্গভবনেই সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি বলেন—'এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমাদের আন্দোলনের ফসল।'

(রাত ১২:৩০ টা; ১৪ জানুয়ারি, ২০১৪)

www.pathagar.org

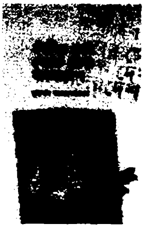

সেনাসমর্থিত সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযান ব্যর্থ হলো

আওয়ামী লীগের লগি-বৈঠার সন্ত্রাসী আন্দোলনে ত্যক্তবিরক্ত জনগণ প্রথম দিকে সেনাসমর্থিত সরকারকে সমর্থন জানায়। দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে অভিযানেও মানুষ সন্তুষ্ট ছিল। অনেকে দামি দামি গাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ফেলে পলায়ন করে। এমনকি টাকার বস্তাও একটি মসজিদে রেখে যায় কেউ একজন। সেনাসমর্থিত সরকার দুই প্রধান দলের কিছু নেতা ও নামকরা কিছু ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে।

এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু পাইকারিভাবে ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার শুরু করল সেনাবাহিনীর তথাকথিত টাস্কফোর্স। দুর্নীতি কমিশনের দায়িত্বে আনা হলো সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল হাসান মশহুদ চৌধুরীকে। অবৈধ সম্পত্তি উদ্ধারের নামে রাস্তার দুইধারের দোকানপাট, স্থাপনা ও সরকারি সম্পত্তির লিজ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত গ্রাম-গ্রামান্তরের অনেক পুরোনো বাজারের ছোটো ছোটো দোকানদারের একমাত্র উপার্জনের ব্যবস্থা ওইসব দোকানপাট বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো। ভেজালবিরোধী ও মজুতদারদের বিরুদ্ধে অভিযানের নামে সামান্য কারণে বা এক-দুই বস্তা খারাপ মাল দোকানে রাখার অপরাধে সাধারণ মাঝারি ব্যবসায়ীদেরও গ্রেফতার ও নির্যাতন শুরু হলো। এমনভাবে দুর্নীতিবাজদের কথিত তালিকা তৈরি করা হলো, যা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সংবলিত। এই তালিকা ধরে গ্রেফতার ও হয়রানি করা হলো। অথচ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এসব অ্যাজেন্ডা ছিল না। খুব অল্প সময়েই এই সরকার জনসমর্থন হারাতে শুরু করল। এসব কাজ না করে নির্দিষ্ট তিন মাসের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করলে ফখরুদ্দীনের সরকারের প্রতি মানুষ রুষ্ট হতো না।

'মাইনাস টু' ফরমুলা ও সংস্কারের রাজনীতি

ডিজিএফআইকে ব্যবহার করে বিশেষভাবে প্রধান দুই দলের কিছু নেতাকে প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে রাজনীতিতে সংস্কারের আওয়াজ তুলে সরকার।

www.pathagar.org

ফখরুদ্দীন আহমদ তার ভাষণে পরিবারতন্ত্র ও ব্যক্তিতন্ত্রের রাজনীতির বিরুদ্ধে অত্যন্ত সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেন। ফখরুদ্দীনের সেনাসমর্থিত সরকার তাদের ক্ষমতাবহির্ভূত অ্যাজেন্ডায় জড়িয়ে পড়ায় জনমনে সংশয়ের সৃষ্টি হয় যে, এ সরকার হয়তো-বা দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকবে।

একপর্যায়ে সেনাসমর্থিত সরকার মনে করে, তাদের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে দুই নেত্রী প্রধান বাধা। যদিও-বা শেখ হাসিনা, মইন ইউ আহমেদ ও হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আঁতাতের ফসল ছিল জরুরি আইন এবং সেনাসমর্থিত সরকার, কিন্তু তারপরও একপর্যায়ে লোকদেখানো ভারসাম্যের জন্য শেখ হাসিনাকে প্রথমে এবং তারপরই তাদের আসল টার্গেট বেগম খালেদা জিয়াকে আটক করা হয়। দুই নেত্রীকে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের বাসভবনে রাখা হয় ভবন দুটিকে সাবজেল ঘোষণা করে। স্পিকারের বাসভবনে খালেদা জিয়া এবং ডেপুটি স্পিকারের বাসভবনে শেখ হাসিনাকে রাখা হয়। সংসদ ভবনে আদালত স্থাপন করা হয় রাজনৈতিক নেতাদের বিচারের জন্য। বিচার বিভাগ সম্পূর্ণভাবে সেনা কর্মকর্তাদের অঙ্গুলি নির্দেশে পরিচালিত হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা মেজর জেনারেল আবদুল মতিন ও জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীসহ ৩০-৩৫ জন সদস্য নিয়ে দুর্নীতিবিরোধী টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্সের ছিল সর্বময় ক্ষমতা। তারা একটি তালিকা প্রণয়ন করে এবং তদনুযায়ী রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার ও বিচারকাজ শুরু হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন টাস্কফোর্সের ইঙ্গিতেই পরিচালিত হতো।

বিএনপি-আওয়ামী লীগের অনেক নেতা গ্রেফতার হলেও জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ না পাওয়ায় তারা গ্রেফতারের বাইরে থেকে যান। একপর্যায়ে জামায়াতের সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরী, মিজানুর রহমান চৌধুরী ও ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরকে গ্রেফতার করা হয়। শাহজাহান চৌধুরীর বিরুদ্ধে কিছু না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তার গাড়ি কেনা-সংক্রান্ত একটি মামলা দেওয়া হয়। মিজান চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি কিছু সিআই শিট বদল করে নিয়ে নিজের বাড়িতে ব্যবহার করেছিলেন। এটাই তার মতো একজন সরল-সহজ সংসদ সদস্যকে হয়রানি করার কারণ। পরে অবশ্য অভিযোগটি টেকেনি। সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরকে ইন্টারোগেশন সেলে নিয়ে কয়েক দিন জিজ্ঞাসাবাদের পর কোনো অভিযোগই পায়নি। তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

(ভোর ২:৩০ টা; ১৫ জানুয়ারি ২০১৪)

www.pathagar.org

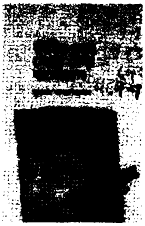

মতিউর রহমান নিজামীকে গ্রেফতার : জামায়াতের তীব্র প্রতিক্রিয়া

বিভিন্ন মহল থেকে জামায়াত নেতাদের গ্রেফতার করার জন্য প্রচারণা চালানো হয়। মন্ত্রিসভার এক কমিটির সদস্য হিসেবে ঠুনকো অভিযোগে মতিউর রহমান নিজামীকে গ্রেফতার করা হয়। নিজামীকে গ্রেফতারের পর জামায়াত ব্যাপক প্রতিক্রিয়া জানায় এবং বিক্ষোভ প্রকাশ করে। উল্লেখ্য যে, এর আগে যখন বিএনপির চেয়ারপারসন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করা হয়, তখন জামায়াত এমন প্রতিক্রিয়া জানায়নি। জামায়াতের এই ভূমিকা স্বাভাবিকভাবেই বিএনপি ভালোভাবে নেয়নি এবং না নেওয়ারই কথা। বেগম খালেদা জিয়ারও এটা ভালোভাবে নেওয়ার কথা নয়।

যাহোক, এই পরিস্থিতিতে বেগম জিয়া ও নিজামীর মুক্তির দাবিতে জামায়াত খুবই সক্রিয় আন্দোলন শুরু করে। এজন্য সারা দেশে জামায়াত স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চালায়। সেই অভিযানে খালেদা-হাসিনা-নিজামীসহ সবার মুক্তি দাবি করা হয়। প্রায় ৫০ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে তা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে জমা দেওয়া হয়। রাজনৈতিকভাবে সকলের গ্রহণযোগ্যতার জন্যই অত্যন্ত উদারভাবে জামায়াতের স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর মুক্তির দাবি সন্নিবেশিত করা হয়। যদিও-বা আওয়ামী লীগ এর কোনো মূল্যায়নই করবে না। হাইকোর্টের রিটে জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী মুক্তি পাওয়ার পর জামায়াত তাকে একটি বিশাল রিসিপশন দিয়ে পিজি হাসপাতাল থেকে মগবাজার তার বাসভবনে নিয়ে আসে শোভাযাত্রাসহ।

চারদলীয় জোট চাঙা হলো

বিশেষ করে জামায়াত আমীর বন্দি হওয়ার পরই মূলত চারদলীয় জোটের তৎপরতা চাঙা করতে আমরা সক্রিয় হই। যেহেতু বিএনপির অধিকাংশ নেতা

www.pathagar.org

বন্দি ছিলেন অথবা গ্রেফতার এড়িয়ে চলছিলেন এবং রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতেও বিধিনিষেধ ছিল, তাই তৎপরতা চালানোর সুযোগও কম ছিল। এ সময় জামায়াত বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে গোলটেবিল আলোচনা এবং ঘরোয়া নানা কর্মসূচি পালন শুরু করে। এক্ষেত্রে আমি অবশ্যই স্বীকার করব যুব কমান্ডের নেতা আবু নাসের রহমতুল্লাহর বলিষ্ঠ ভূমিকা। স্বাধীনতা ফোরামের নামে নিয়মিত জাতীয় প্রেসক্লাবে গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন শুরু হয়। এসব আলোচনায় বিএনপি, জামায়াত ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল ছাড়াও বিশিষ্ট আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, পেশাজীবী, সাংবাদিক নেতা, সমাজকর্মীকে আমন্ত্রণ জানাতে হতো।

ন্যাশনাল ইয়ুথ ফোরামসহ আরও অনেকগুলো সংগঠন নিয়মিত জাতীয় প্রেসক্লাবকেন্দ্রিক গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন অব্যাহত রাখে। এসব অনুষ্ঠানে প্রায়ই যারা অতিথি হিসেবে আসতেন—ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ, খন্দকার মোশাররফ হোসেন, বাবু গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, অ্যাডভোকেট জয়নাল আবেদীন, ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, উইং কমান্ডার হামিদুল্লাহ, ইসমাইল হোসেন বেঙ্গল, শফিউল আলম প্রধান, শওকত হোসেন নিলু, মাওলানা আবদুল লতিফ নেজামী, অ্যাডভোকেট আবদুল মুবিন, মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, আহমদ আবদুল কাদের প্রমুখ।

এসব প্রোগ্রামে জামায়াতের পক্ষ থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি উপস্থিত থাকতাম। তা ছাড়াও ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, অ্যাডভোকেট জসিম উদ্দিন সরকার, রফিকুল ইসলাম খান অতিথি হতেন। আইনজীবীদের মধ্য থেকে অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম অনেক আলোচনায় অংশ নিয়ে চমৎকার বক্তব্য রেখে খুবই প্রশংসিত হয়েছেন। শহীদ আবদুল কাদের মোল্লাও অনেক আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ গোলটেবিল বৈঠকে ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক অংশ নিতেন। তবে পেশাগত ব্যস্ততার কারণে তিনি সময় দিতে পারতেন না।

সিরডাপ মিলনায়তনেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে বিশিষ্ট বরেণ্য ব্যক্তিদের সাথেও অনেক আলোচনায় আমি অংশ নিয়েছি। এসব আলোচনায় অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, আবুল হাসান চৌধুরী, বদিউল আলম মজুমদার, আবদুল মুঈদ চৌধুরী, শাহ আবদুল হান্নান, ড. মুনিরুজ্জামান মিয়া, জাফরুল্লাহ চৌধুরী প্রমুখ অংশ নিতেন।

www.pathagar.org

জাতীয় প্রেসক্লাবে আমার ওপর আওয়ামী গুন্ডার হামলা

একটি গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নিতে আমি জাতীয় প্রেসক্লাবে যাই। আমার আলোচনাস্থল ছিল প্রেসক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে। কিন্তু আমি ভুলক্রমে ভিআইপি লাউঞ্জের দিকে অগ্রসর হই। সেখানে সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের একটি অনুষ্ঠান চলছিল। আমাকে চিনতে পেরে সেখানকার এক আওয়ামী গুন্ডা আমার ওপর হামলা চালানোর জন্য চিৎকার করতে করতে সামনে তেড়ে আসে। আমার সাথে ছিল আমার একজন নিরাপত্তা সহকারী কামাল নামের এক যুবক। সে এগিয়ে গিয়ে সেই গুন্ডাকে প্রতিহত করে। হামলাকারী গুন্ডা একটি বলপেন হাতে নিয়ে তার ধারালো দিক দিয়ে কামালের পেটের দিকে আঘাত করে। সেটা ফেরাতে গেলে বলপেন নিব তার হাতে লাগে, এতে সে বেশ আহত হয়। ইতোমধ্যে প্রেসক্লাবে অবস্থানরত সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের অনেকে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। আমি আমাদের আলোচনাস্থল প্রেসক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে চলে আসি।

প্রেসক্লাবে তখন একইসাথে তিন-চারটা সংগঠনের কর্মসূচি চলত পাশাপাশি। সিনিয়র সাংবাদিক নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিবেশ শান্ত হয়। ইতোমধ্যে আবু নাসের রহমতুল্লাহসহ গোলটেবিলে আয়োজকরাও চলে আসেন। ইসমাইল হোসেন বেলালসহ অন্যান্য আলোচকরাও পৌঁছে গেলে যথারীতি আলোচনা শুরু হয়। আমি তীব্র ভাষায় আমার ক্ষোভ প্রকাশ করি। অন্যান্য আলোচকরাও আমার ওপর হামলার এই হীন প্রচেষ্টার নিন্দা জানান।

পরদিন সংবাদপত্রে এটা বড়ো খবর হিসেবে প্রকাশিত হয়। *Daily Star*-এর শিরোনাম ছিল *Painful mistake* অর্থাৎ আমি যে ভুলক্রমে সেক্টর কমান্ডার ফোরামের কর্মসূচির স্থলে চলে গিয়েছিলাম, তারা সেটারই বর্ণনা করে। পরে জেনেছি, আমার ওপর হামলাকারী ব্যক্তির নাকি পরিকল্পনা ছিল, সেখানেই আমাকে হত্যা করা। কিন্তু সে সুযোগটি হাতছাড়া হওয়ায় সে নাকি অনেক আফসোস করেছে। বুঝতে পারলাম, আমাদের বিরুদ্ধে মিডিয়ায় ক্রমাগত মিথ্যা প্রচারণায় মানুষ কতটা বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়েছে। তা ছাড়া আমাদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে, তার ফলে অনেকে না জেনেই আমাদেরকে জঘন্য অপরাধী বিবেচনা করে। তবে এরপরও প্রেসক্লাবে বা অন্য কোথাও কোনো কর্মসূচিতে যোগদান করা আমি বন্ধ করিনি।

www.pathagar.org

একদিন কুমিল্লা থেকে শ্রমিকনেতা মুজিব আমাকে টেলিফোন করে বলল— 'বিটিভির স্ক্রলে দেখেন, আপনার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা হয়েছে।' বিটিভি খুলে দেখলাম, জাতীয় প্রেসক্লাবের একটি প্রোগ্রামে আমার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে হাইকোর্টে আদালত অবমাননার মামলাটি করা হয়। আমরা তা মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। তবে আদালতে মামলাটি এই বলে প্রত্যাহার করা হয় যে, কে কী বলল, তা আমলে নিয়ে তাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

আইডিবি ভবনে একটি সেমিনারের ঘটনা

আইডিবি ভবনে বেশ কয়েকটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে কয়েকটি এনজিওর উদ্যোগে। সেসব সেমিনারে দেশের নামিদামি ব্যক্তিরা অংশ নিয়েছেন। আমিও অংশ নিয়েছিলাম আলোচক হিসেবে। মজার ব্যাপার হলো, আলোচকদের পারিশ্রমিক হিসেবে দুই হাজার করে টাকাও দেওয়া হয়। সেই আইডিবি ভবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল, যার মডারেটর ছিলেন *Daily Star* সম্পাদক মাহফুজ আনাম। চ্যানেল আলোচক হিসেবে ছিলেন ড. কামাল হোসেন, ড. রেহমান সোবহান, ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, আওয়ামী লীগের এমপি ডা. এস এম আকবর এবং জামায়াতের পক্ষ থেকে আমি। এই আলোচনায় লাঞ্চের ব্যবস্থা ছিল। তবে টাকা-পয়সা দেওয়া হয়নি আলোচকদের।

যাহোক, আইডিবি অডিটোরিয়ামে আলোচনা শুরু হলো। বিষয়বস্তু ছিল গণতন্ত্রে সুশীল সমাজের ভূমিকা জাতীয় একটা কিছু। আমি আগেই মনে মনে ঠিক করেছিলাম, সুশীল সমাজের দলবাজ ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করব। ড. কামাল হোসেনের বক্তব্যের পর আমাকে আলোচনার জন্য আহ্বান জানানো হলো। আমি আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী বলতে শুরু করলাম—একটি গণতান্ত্রিক সমাজে সুশীল সমাজ মূল্যবান অবদান রাখতে পারে এবং জাতি তাদের কাছে সেটাই প্রত্যাশা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের দেশের সুশীল সমাজ বলতে সত্যিকার অর্থে যাদের বোঝায়, তা নেই; বরং তারা দারুণভাবে পলিটিক্যাল। সুশীল সমাজ নামধারী গুণী ব্যক্তিদের দলীয় পক্ষপাতমূলক ভূমিকা তাদের দলীয়করণ ও রাজনীতিকীকরণের ফলে তারা কাঙ্ক্ষিত নিরপেক্ষ ও ভারসাম্যপূর্ণ কোনো ভূমিকা রাখতে পারছেন না।

www.pathagar.org

এ কথাগুলো বলে শ্রোতাদের উদ্দেশে বললাম—'কই আমি তো সত্যিকারার্থে কোনো সুশীল সমাজের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি না, আপনারা কী মনে করেন?' আমার এ কথার সাথে সাথে পুরো হলে তুমুল করতালি পড়ল। আমি খুব আস্থার সাথে আর কিছু কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম এবং আবার হাততালি পড়ল।

বক্তব্য শেষ করে মঞ্চের আসনে ফিরে এসে বসার পর মাহফুজ আনাম হাসিমুখে আমাকে ধন্যবাদ জানালেন এবং বললেন—'আমি আসলে খুব উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলাম যে, আপনি কী না কী বলেন, তা নিয়ে আবার কোনো সমস্যা হয় কি না। কারণ, এর আগে আপনারা কোনো বক্তব্য শোনার সুযোগ আমার হয়নি।'

লাঞ্চের জন্য যখন বিরতি হয়, তখন অনেকে এসে আমার হাত মেলান এবং সঠিক কথা বলার সাহসের জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানান। আমিও উৎসাহ বোধ করি। এই অনুষ্ঠানটির কথা আমার অনেক দিন স্মরণ থাকবে। আমার পর যারাই বক্তব্য রেখেছেন, তারা সুশীল সমাজের দলীয়করণ যাতে না হয়, সে ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। অনেকে বলেছেন, আমি নাকি সেদিনকার আলোচনার ট্রেন্ড ঘুরিয়ে দিয়েছি। এটা হয়তো তারা বেশি বলেছেন। তবে অনেকের মনের কথা আমার ভাষায় প্রতিফলিত হওয়ায় তারা খুশি হয়েছিলেন, এটা ঠিক।

(সকাল ১০:০০ টা; ১৫ জানুয়ারি, ২০১৪)

www.pathagar.org

'মাইনাস টু' ফরমুলা : ডিজিএফআইয়ের কারসাজি

আওয়ামী লীগে শেখ হাসিনার বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য কয়েকজন নেতাকে ব্যবহার করার উদ্যোগ নেয় ডিজিএফআই। তোফায়েল আহমদ, আমির হোসেন আমু, আব্দুর রাজ্জাক ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে পরিবর্তন আনার জন্য আলাদা আলাদাভাবে সংবাদ সম্মেলন করে সংস্কার কর্মসূচি পেশ করেন। আওয়ামী লীগের আরও অনেক নেতাই সংস্কারের পক্ষে ছিলেন—সাবের হোসেন চৌধুরী, অধ্যাপক আবু সাঈদ, মাহমুদুর রহমান মান্না, মুকুল বোস, এম জাহাঙ্গীর, আসাদুজ্জামান নূর, আখতারুজ্জামান, আবুল হাসান চৌধুরী, সুলতান মনসুরসহ অনেকেই।

ওদিকে ডিজিএফআই বিএনপির কয়েকজন সদস্যকে জোরপূর্বক বাসা থেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে সাইফুর রহমানের নেতৃত্বে আলাদা বিএনপি গঠনের ঘোষণা দেওয়ায়। দুঃখজনকভাবে মান্নান ভূঁইয়া সেনাসমর্থিত সরকারের ফাঁদে পা দিয়ে তথাকথিত সংস্কারপন্থিদের নেতৃত্ব দান করেন। তিনি মুক্ত ছিলেন, গুলশানে তার ফ্ল্যাটে প্রতিদিন সকল-বিকাল সংস্কারপন্থি বিএনপি নেতাদের ভিড় লেগে ছিল। কয়েক দিন আমি নিজেও গিয়েছি পরিস্থিতি বোঝার জন্য এবং তার সাথে আলোচনার জন্য। দলীয় ব্যাপারে কোনো আলাপ আমার সাথে হয়নি। তবে তিনি সেনাসমর্থিত সরকারের প্রতি নমনীয় ছিলেন। তার তৎপরতায় খালেদা জিয়া অসন্তুষ্ট ছিলেন, এজন্য তিনি গ্রেফতার হওয়ার প্রাক্কালে মান্নান ভূঁইয়াকে মহাসচিবের পদ থেকে অপসারিত করেন।

কয়েকজন স্থায়ী কমিটির সদস্য নিয়ে সাইফুর রহমানের নেতৃত্বে যে বিএনপি গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়, তাতে মেজর হাফিজ উদ্দিনকে মহাসচিব ঘোষণা করা হয়। ওদিকে বেগম জিয়া গ্রেফতারের প্রাক্কালে খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে বিএনপির মহাসচিব নিয়োগদান করেন। অনেক প্রলোভন, ভীতি ও নির্যাতন উপেক্ষা করে খোন্দকার দেলোয়ার দলের হাল ধরেন এবং সাহসিকতার সাথেই দায়িত্ব পালন করেন।

www.pathagar.org

এর মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, বিএনপির কয়েকজন স্থায়ী কমিটি সদস্যকে জোর করে ঘোষণা দিতে বাধ্য করা হয়েছে। আর এতে মেজর হাফিজসহ অন্য সকলেই বিব্রত হন। বিএনপির সংসদ সদস্যদের মধ্যে মফিকুল হাসান তৃপ্তি, সাখাওয়াত হোসেন বকুল, রেজাউর করিম ডিনা, কলিমুল্লাহ, জহিরুদ্দিন বাবর এবং আরও অনেকেই মান্নান ভূঁইয়ার সাথে আলাদা দল গঠনের চেষ্টা করেন। মিডিয়ায় প্রচারণা ছিল শতাধিক বিএনপি সংসদ সদস্য মান্নান ভূঁইয়ার সাথে আছে। তবে মজার ব্যাপার হলো—সংস্কারবাদী হিসেবে পত্রপত্রিকায় যাদের নাম প্রচারিত হয়, তারা কিন্তু নিজ নির্বাচনী এলাকায় যেতে পারেননি। অনেকে পালিয়ে ঢাকায় চলে এসে আত্মগোপন করেন। আবার কেউ কেউ দুই দিকের চাপ থেকে নিজেদের বাঁচাতে বিদেশে চলে যান।

এ সময় এটিএম শামসুল হুদার নির্বাচন কমিশন খুব একটা খারাপ কাজ করে এবং সেটা তারা কারও চাপে করেছিল বলে আমার জানা নেই। সেটা হলো—বিএনপিকে নির্বাচন কমিশন সংলাপে যোগদানের জন্য যে চিঠি দেয়, তা মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার নামে দেওয়া হয়। অথচ বেগম জিয়া আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে মহাসচিব পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে খন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে মহাসচিব নিয়োগ দিয়েছিলেন। বিএনপিকে ভাঙার জন্যই এ কাজটি করা হয়েছিল; কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে বিএনপির কর্মীরা সারা দেশে বেগম জিয়ার পেছনে শক্তভাবে দাঁড়িয়েছিলেন।

তারেক রহমানের ওপর অকথ্য নির্যাতন

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানকে গ্রেফতার করার পর তার ওপর অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন করা হয়। একপর্যায়ে তাকে দুই তলা ভবনের ছাদ থেকে ফেলে দিলে তিনি মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত পান। তাকে পিজি হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। এদিকে তার বিরুদ্ধে ১৫টি মামলা দেওয়া হয়। চাঁদাবাজি, ক্ষমতার অপব্যবহার, মানি লন্ডারিং ইত্যাদি অভিযোগে এসব মামলা করা হয়। অনেক দিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অধীনে চিকিৎসার পর তাদের সুপারিশে তারেক রহমানকে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্যারোলে বিদেশে পাঠানো হয়। তিনি রাজনীতি করবেন না বা কোনো রাজনৈতিক পদ গ্রহণ করবেন না—এই ধরনের একটি ঘোষণাও দেওয়ানো হয়। যাহোক, শেষ পর্যন্ত চিকিৎসার জন্য তিনি লন্ডন যান।

www.pathagar.org

এই লেখাটি যখন লিখছি (১৫ জানুয়ারি, ২০১৪) তখন পর্যন্ত তারেক রহমান লন্ডনেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন। তার বিরুদ্ধে মামলাগুলোর তিনি জামিন পেয়েছেন এবং হাইকোর্টের আদেশেই তা স্থগিত আছে। অবশ্য অনুসন্ধান করে তেমন কোনো প্রমাণাদি দুদক বা পুলিশ তার বিরুদ্ধে পায়নি বলেই মামলাগুলো চলছে না। তবে তারেকের বন্ধু গিয়াসউদ্দিন আল মামুনের সাথে একটি মানি লন্ডারিং মামলায় তাকে আসামি করা হয়। সেই মামলা দীর্ঘদিন চলার পর গত মাসে রায়ে তারেক রহমান বেকসুর খালাস পেয়েছেন। সরকারপক্ষ নিম্ন-আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের প্রস্তুতি নিয়েছে এবং আপিল করেছে।

তারেক রহমানের ছোটো ভাই আরাফাত রহমানও চিকিৎসার জন্য প্যারোলে থাইল্যান্ড যান। একটি মানি লন্ডারিং মামলায় তার সাজা হয় এবং তিনি এখনও বিদেশেই আছেন। ওদিকে জিয়া ট্রাস্টের একটি মামলায় এতিমখানার ফান্ড আত্মসাৎ করার অভিযোগে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে আরেকটা মামলা চালু আছে। তারেক রহমান নিজে কোনো সম্পদের মালিক হননি বা তার উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যাংক ব্যালেন্স বা অর্জিত অবৈধ সম্পদ নেই। ফলে তাকে মামলায় আটকিয়ে শাস্তি দেওয়া খুব সহজ হবে না। ব্যাপারটা সহজ হলে বিগত পাঁচ বছরে আওয়ামী সরকার অবশ্যই মামলাগুলো চালু করে তাকে সাজা দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করত না।

অনেক দিন নিশ্চুপ থাকার পর অতি সম্প্রতি একটি ভিডিও বার্তায় এবং একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক বক্তব্য রেখেছেন তারেক রহমান। সেই বক্তব্য তিনি অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলনের ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তার দল, ১৮ দলীয় জোট ও দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এতে আওয়ামী লীগ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়ায় মনে হয়, তারা তারেক রহমানের নেতৃত্বকে ভয় করে।

এটা ঠিক যে, তারেক রহমানের ভাবমর্যাদা নষ্ট করতে আওয়ামী লীগ সব কিছুই করেছে। তার একটা নেতিবাচক ভাবমর্যাদা গড়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা তারা চালালেও সাধারণভাবে দলের মধ্যে তারেক রহমানের জনপ্রিয়তা বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। তারেক রহমান দেশে প্রত্যাবর্তন করলে বিএনপি চাঙা হবে, এটা নিশ্চিত বলা যায়।

www.pathagar.org

সম্প্রতি আওয়ামী লীগের মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের বিগত পাঁচ বছরের আকাশচুম্বী দুর্নীতি (অনেকের সম্পদ বেড়েছে আট হাজার শত ভাগ পর্যন্ত), পদ্মা সেতু দুর্নীতি, হলমার্ক, শেয়ার বাজার, রেলওয়ে, বিমান, কুইক রেন্টাল, সরকারি ব্যাংকে লুটপাট এবং এসব দুর্নীতিতে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিদের জড়িত থাকার ফলে তারেক রহমানের দুর্নীতি সম্পর্কে যা কিছু প্রচার করা হয়েছে, তা অনেকটাই তলে পড়ে গিয়েছে। উপরন্তু সরকারি দল ও তার বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, চাকরি ও ঘুসবাণিজ্য, জমি দখল, বাড়ি দখল, নদী দখল, সরকারি সম্পত্তি দখল ও আত্মসাৎ ইত্যাদি দেশব্যাপী এতটাই ব্যাপকতা লাভ করেছে যে, বিএনপি বা চারদলীয় জোটের সময়কার দুর্নীতির কথা মানুষ ভুলেই গিয়েছে।

আওয়ামী সরকার কার্যত দুর্নীতির অভিযোগ স্বীকারও করে নিয়েছে। সম্পদের হিসাব দেওয়া হবে বলে নির্বাচনী অঙ্গীকার করেছিল আওয়ামী লীগ। কিন্তু তাদের সম্পদ এতটাই অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সম্পদের হিসাব প্রকাশে তারা সাহস করেননি। বরং সম্প্রতি পাঁচ জানুয়ারির একতরফা নির্বাচনের সময় তারা মনোনয়নপত্র জমাদানকালে সম্পদের যে হিসাব দিয়েছিলেন, তা পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর আরেক দুর্নীতিবাজ আওয়ামী লীগ নেতা মখা আলমগীর আওয়ামী প্রার্থীদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ না করতে নির্বাচন কমিশনে গিয়ে ধরনা দিয়েছিলেন। দুর্নীতি ও লুটপাটের মাধ্যমে অস্বাভাবিক সম্পদ বৃদ্ধি করার কারণে শেখ হাসিনা প্রায় ৩০ জনকে মন্ত্রিসভায় স্থান দিতে পারেননি। এরপরও বেশ কয়েকজন অস্বাভাবিক সম্পদের মালিক নতুন মন্ত্রিসভাতেও স্থান পেয়েছেন। ফলে আওয়ামী লীগারদের পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতি তখন জাতির কাছে দৃশ্যমান।

জামায়াত সেক্রেটারি জেনারেলের মন্তব্য : যুদ্ধাপরাধী ইস্যু নিয়ে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া

ফখরুদ্দীনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নির্বাচন কমিশনের সাথে আরপিও সংশোধন সম্পর্কে জামায়াতের সংলাপ ছিল। সংলাপ শেষে নিচে নেমে আসার পর অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বলেন—'বাংলাদেশে কোনো যুদ্ধাপরাধী নেই। যুদ্ধাপরাধী ইস্যুটা আওয়ামী লীগের উদ্ভট প্রচারণা।'

www.pathagar.org

তিনি অন্যায় কিছু বলেননি। যে ১৯৫ জনকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে তালিকাভুক্ত করা হয়, তাদেরকে ক্ষমা করে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিয়েছিল শেখ মুজিব সরকার। দেশের অভ্যন্তরে দালাল আইনে যাদের গ্রেফতার করা হয়, প্রথমে তাদেরকে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব সাধারণ ক্ষমা করেন এবং যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল, তাদের বিচার হয়েছিল এবং বাকি যারা ছিল তাদের মামলাগুলো প্রমাণের অভাবে চলছিল না। এমন পরিস্থিতিতে ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট সায়েম দালাল আইন বাতিল করে দেন। এরপর যারা আটক ছিল, তাদের বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগও ছিল না। কিন্তু বৈরী মিডিয়া মুজাহিদ সাহেবের উক্তিটিকে এমনভাবে তুলে ধরেছে, পরদিন সারা দেশে সেটাই টক অব দ্য কান্ট্রি হয়ে যায় এবং জামায়াতের দুশমন ধর্মহীন উগ্র বামগোষ্ঠী এর পুরো সুযোগ গ্রহণ করে নতুন করে জামায়াতের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ক্যাম্পেইন শুরু করে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যেকোনো কারণেই হোক, উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদ যুদ্ধাপরাধ ইস্যুটিকে শুরু থেকেই চাঙা করার জন্য নানা কৌশল গ্রহণ করেন। ভারত সফরকালে তাকে একজন রাষ্ট্রপ্রধানের মতো সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রায় সপ্তাহকালব্যাপী তার এই সফরে কয়েকটি বিষয়ে গোপন চুক্তি হয়। সে চুক্তিগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল—শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় বসানো এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা। ভারত মইন ইউ আহমেদকে ছয়টি ঘোড়া উপহার দিয়েছিল।

পরবর্তী স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দাবি তোলা হলো—'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই। সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদ বললেন—'বিষয়টি আমি সরকারকে লিখব।' সম্ভবত এ সময়েই বা তার আগে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার উদ্যোগে সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম গঠন করা হলো। সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের জন্য একটি অত্যাধুনিক গাড়িও দেওয়া হয়। জামায়াতকে টার্গেট করেই কাজটা নতুন উদ্যমে শুরু করা হয়েছিল।

মইন ইউ আহমেদ, ভারতীয় হাইকমিশন, সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম এবং জামায়াতবিরোধী ও ইসলামবিরোধী মিডিয়া জামায়াতের বিরুদ্ধে জনমত গঠন শুরু করে। তারা একযোগে জামায়াতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে। এজন্য দূতাবাসের কর্মকর্তারা স্যাটেলাইট চ্যানেলে টকশোর আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কিছু লোককে নগদ অর্থ দিয়ে এই ইস্যুতে জামায়াতের বিরুদ্ধে কথা বলতে

www.pathagar.org

উদ্‌বুদ্ধ করেন। এজন্য রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী ও সাবেক বিচারপতিদের তারা অর্থের বিনিময়ে ব্যবহার করেছেন। আমাদের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মহলে ব্যাপক যোগাযোগ থাকায় কোথায় কীভাবে কী হচ্ছে, তা আমরা জানতাম এবং খবর পেয়ে যেতাম।

একজন রাজনীতিক আমাকে বলেছেন—একবার ভারতীয় হাইকমিশনার তাকে ও একজন সাবেক বিচারপতিকে দাওয়াত করে এবং ডিনারের পর নগদ অর্থের প্রস্তাব করেন টকশোতে অংশ নেওয়ার জন্য। কিন্তু তারা দুজনই সেদিন নানা অজুহাত দেখিয়ে হাইকমিশনারের প্রস্তাব এড়িয়ে যান। ভারতীয় হাইকমিশনের আরও কর্মকাণ্ড আছে, যা পরবর্তী সময়ে বলার চেষ্টা করব আশা রাখি।

(রাত ১:১৫ টা; ১৫ জানুয়ারি, ২০১৪)

www.pathagar.org

বিএনপি ভাঙার চেষ্টা ডিজিএফআইয়ের : প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

ফখরুদ্দীন-মইন উদ্দিন সরকার তথা সেনাসমর্থিত সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ফখরুদ্দীন আহমদ টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে যে ভাষণ দেন, তাতে দেশে পরিবারতন্ত্রের রাজনীতির কঠোর সমালোচনা করা হয়। রাজনৈতিক দলে সংস্কারের জন্য ডিজিএফআইয়ের মাধ্যমে চাপ দেওয়া হয়। এজন্য নানামুখী প্রচেষ্টা চালানো হয়।

এর মধ্যে একটি ছিল সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করে একটি ভারসাম্য আনার উদ্যোগ। এ উদ্দেশ্যে সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদ একটি সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ করে কিছু সংস্কার প্রস্তাব দেন। বলা হয়ে থাকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. আতাউর রহমানসহ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি এসব প্রস্তাবের ব্যাপারে সমর্থন জুগিয়েছেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা খুব বেশি দূর অগ্রসর হয়নি।

জাতীয় নেতৃত্ব প্রশ্নে বিভাজনের অবসানের জন্য শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জেনারেল জিয়াউর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী—এ সকল জননেতাকে জাতীয় নেতা হিসেবে ঘোষণা করে একটি জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়।

শেখ হাসিনার বিকল্প হিসেবে আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের দিয়ে একটি সংস্কার উদ্যোগ নেওয়া হয় ডিজিএফআইয়ের পক্ষ থেকে। আমীর হোসেন আমু, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত আলাদাভাবে সংবাদ সম্মেলন করে দলের মধ্যে সংস্কারের প্রস্তাব করেন। তাদেরকে বড়ো পদ দেওয়ারও প্রস্তাব করা হয় বলে শুনেছিলাম। তবে এ প্রচেষ্টাও শেষ পর্যন্ত খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি।

www.pathagar.org

বিএনপির সিনিয়র নেতা সাইফুর রহমান, ড. আর এ গণি, মান্নান ভূঁইয়া, জেনারেল মাহবুবুর রহমান ও মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিনকে নিয়ে আলাদা বিএনপি গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়। জোর করে বন্দুকের নলের মুখে উল্লিখিত নেতাদের ঘর থেকে তুলে নিয়ে এ কাজটি করে ডিজিএফআই। এ ক্ষেত্রে আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি প্রশ্নবিদ্ধ। তাকে কেন্দ্র করেই এসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে গ্রেফতারের প্রাক্কালে বেগম খালেদা জিয়া দলের মহাসচিবের দায়িত্ব থেকে আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে অপসারিত করে খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের দায়িত্ব প্রদান করেন।

এ সময় সবচেয়ে আপত্তিকর কাজটি করে নির্বাচন কমিশন। রাজনৈতিক দলের সাথে কমিশনের আলোচনার জন্য বিভিন্ন দলের মহাসচিবকে চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিএনপির আমন্ত্রণ পাঠানো হয় মেজর হাফিজ উদ্দিনের নামে। হাফিজ উদ্দিনকে ডিজিএফআইয়ের উদ্যোগেই বিএনপির মহাসচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বেগম খালেদা জিয়া সুস্পষ্টভাবে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের দায়িত্ব অ্যাডভোকেট খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে দেওয়ার পরও নির্বাচন কমিশন মেজর হাফিজের নামে বিএনপিকে আমন্ত্রণপত্র পাঠায় সংলাপের জন্য। বিএনপি এর প্রতিবাদে সংলাপ প্রত্যাখ্যান করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে ডিজিএফআইয়ের পক্ষ থেকে অনেক ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। বিভিন্ন মহল নির্বাচন কমিশন ও ডিজিএফআইয়ের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করে। বিশেষ করে নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতদুষ্টতার তীব্র নিন্দা করা হয়। ড. আর এ গণি ও সাইফুর রহমান প্রকাশ করেন, ডিজিএফআই জোরপূর্বক তাদের একটি বৈঠকে বসায় এবং সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেয়। এ সময় বিএনপির তরুণ নেতাকর্মীরা বেগম খালেদা জিয়ার পাশে দাঁড়ায় এবং দলকে ভাঙন থেকে রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে শেষ পর্যন্ত বিএনপির ভাঙার অপচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিএনপির সংসদ সদস্যদের একটি বড়ো অংশ সংস্কারের নামে বিএনপি ভাঙার প্রক্রিয়ার সাথে, প্রলোভনেই হোক আর ভয়েই হোক, জড়িয়ে পড়েছিল। আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা সংস্কার প্রক্রিয়ায় জড়ালেও দ্বিতীয়-তৃতীয় স্তরের নেতারা খুব একটা বেশি সংখ্যায় জড়িত হয়নি।

www.pathagar.org

ড. মুহাম্মদ ইউনুসের রাজনৈতিক দল 'নাশ' প্রসঙ্গ

শোনা গিয়েছে, ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সেনাবাহিনী ক্ষমতা গ্রহণের আগে প্রথমে ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি সম্মতি দেননি। তবে তার পরামর্শেই ড. ফখরুদ্দীন আহমদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের দায়িত্ব নেওয়া হয়।

ফখরুদ্দীন আহমদ বিশ্বব্যাংকে কাজ করেছেন। তিনি একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। বিদেশ থেকে ডেকে এনে তাকে বিএনপির পক্ষ থেকেই বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুসের প্রতি পশ্চিমাদের আস্থা ছিল এবং হয়তো-বা তারা বাংলাদেশে রেজিম চেইঞ্জের এই ঘটনায় তাকে সামনে আনতে চেয়েছিলেন। আর এজন্যই দেখা গেল, আকস্মিক তাকে নিয়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য তোড়জোড় শুরু হলো। জনগণের মতামত গ্রহণ করার জন্য অনেকগুলো টেলিফোন নাম্বার এবং অনলাইনে আলাপের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় নাগরিক শক্তি; সংক্ষেপে 'নাশ'।

এই উদ্যোগে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কেউ কেউ ড. মুহাম্মদ ইউনুসের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আবার কেউবা তার উত্থানে ভীত হয়ে তার রাজনৈতিক দল গঠনের বিরোধিতা করেন। ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদসহ অনেকেই শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ থেকে ড. ইউনুসকে বিরত করেন বা তিনি নিজেও উপলব্ধি করেন যে, এভাবে রাজনীতির ময়দানে তার না আসাই সমীচীন। ফলে সেখানেই থেমে যায় এই উদ্যোগ।

একজন নোবেল বিজয়ী হিসেবে দলমতের ঊর্ধ্বে থাকাটাই ছিল ড. মুহাম্মদ ইউনুসের জন্য ভালো। তবে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর থেকেই আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি তাকে সুদখোর ও গরিবের রক্তচোষা আখ্যায়িত করেও বিবৃতি দিয়েছিলেন।

ডিজিএফআই এই উদ্যোগের পেছনে ছিল কি না, তা পরিষ্কারভাবে আমার জানা নেই। তবে পশ্চিমারা যে ড. মুহাম্মদ ইউনুসের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিল, তাতে সংশয় নেই। রুপসী বাংলা হোটেলের হলরুমে কোনো একটি

www.pathagar.org

অনুষ্ঠানে তখন একজন পশ্চিমা কূটনীতিক আমাকে সরাসরি প্রশ্ন করেন— 'তোমাদের দেশের লোকেরা এমন কেন! তারা একজন নোবেল বিজয়ীকে রাজনীতিতে আসতে সমর্থন করছে না!'

আমি সরাসরি তার প্রশ্নের কোনো জবাব দিইনি। তবে এটা বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি যে, তাদের একটি উদ্যোগ বিনষ্ট হওয়ায় তারা অসন্তুষ্ট ছিল। যেহেতু এক/এগারোর জরুরি অবস্থা জারি এবং সেনাসমর্থিত সরকার গঠনে জাতিসংঘকে ব্যবহার করে পশ্চিমা কয়েকটি দেশ সরাসরি জড়িত ছিল, তাই হয়তো-বা একটি নতুন পলিটিক্যাল প্লাটফরম তারা দাঁড় করাতে চেয়েছিল। পৃথিবীর আরও অনেক দেশেই নোবেল বিজয়ীকে সামনে এনে রাজনীতিতে ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমনটি চেষ্টা করা হয় মিশরে নোবেল বিজয়ী মুহাম্মদ আল বেরাদিকে নিয়ে। মিশরে গণ-আন্দোলনের মুখে প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পতনের পর মুহাম্মদ আল বেরাদিকে সামনে আনার চেষ্টা করা হয়। আল বেরাদি তখন নিজের অবস্থান বুঝতে পেরে নির্বাচনে আসেননি। কিন্তু মিশরের ইতিহাসে প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মুসলিম ব্রাদারহুডের মুহাম্মদ মুরসিকে কৌশলে সেনাবাহিনী দিয়ে পতন ঘটানোর পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে আল বেরাদি যোগদান করেন। পরে অবশ্য সেনাবাহিনী কর্তৃক মুসলিম ব্রাদারহুডের হাজার হাজার নেতাকর্মী হত্যা ও গ্রেফতার করার প্রতিবাদে আল বেরাদি সরকার থেকে পদত্যাগও করেন।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পরও ডিজিএফআই একটি কিংস পার্টি গঠনের আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায়। বিভিন্ন দলের কিছু নেতাকে বা দলছুট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি দল গঠনের নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সাবেক বিএনপি নেতা ড. ফেরদৌস কোরেশী অনেক দিন থেকে রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় ছিলেন। ড. কোরেশী এবং সামরিক কর্মকর্তা ও মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমসহ বেশ কিছু লোক নতুন দল গঠনে এগিয়ে আসেন।

প্রগ্রেসিভ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নামে ড. ফেরদৌস কোরেশীর গঠিত একটি দলের পেছনে ডিজিএফআই অনেকটা প্রকাশ্য সমর্থন জোগানোর ফলে কিংস পার্টি গঠনের বিষয়টি জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়ে যায় এবং এ নিয়ে নানা সমালোচনার সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে ডিজিএফআই বুঝতে পারে, এই উদ্যোগ

www.pathagar.org

সফল হবে না; ফলে তারা পিছিয়ে যায়। এ ব্যাপারে ফেরদৌস কোরেশী নিজেই সমালোচনা করেছেন। আসলে তাকে যে সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তা রক্ষা না করায় তিনি নিজেও অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, তার দলে বেশ কিছু যুবক অংশগ্রহণ করে, যাদের মধ্যে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিত একজন ছিল। এই যুবকের শ্বশুরের বাসভবনে আমাকে ও ড. ফেরদৌস আহমদ কোরেশীকে খাবারের আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদের মধ্যে একটি আলাপ-আলোচনা বা মতবিনিময়ের সুযোগ করে দেয় সেই যুবক। আমার আগ্রহও ছিল এতে। অনেক কথা হয় এবং অনেক কিছু জানতে পারি। যেহেতু একটি দল গঠনের জন্য তিনি কিছু লোককে সমবেত করে একটি অফিস খুলে তৎপরতা চালাচ্ছিলেন, তাই ডিজিএফআই পিছিয়ে গেলেও ড. ফেরদৌস কোরেশী সেই দলের তৎপরতা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেন। ড. কোরেশীর ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল দুটো কারণে; এক. তিনি পড়াশোনা করেন, যা অনেক রাজনৈতিক নেতার মধ্যেই ইদানীং লক্ষ করা যায় না। দুই. তিনি সমানুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচনব্যবস্থা চালু করতে বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার সাধনে একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যার সমর্থক আমি নিজেও। তাই অনেকটা ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকেই আমি তার সাথে উল্লিখিত সেই আমন্ত্রণে যোগদান করি এবং মতবিনিময় করি।

সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম কল্যাণ পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তেমন কোনো পরিচিত ব্যক্তি তার সাথে যোগদান না করা সত্ত্বেও তিনি তার দলের কাজ শুরু করেন। তার ছোটো ভাই সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক মরহুম আমাদের সাথে সাংবাদিকতার কাজ করতেন এবং সেই সুবাদে তার সাথেও আমাদের পরিচয় ছিল। সৈয়দ ইসহাক ছিলেন একজন অত্যন্ত মেধাবী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে সৈয়দ ইসহাক ইন্তেকাল করলে সেনাছাউনিতে তার জানাযায় আমরা অনেকেই শরিক হই। সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমের ক্যান্টনমেন্টের বাসভবনেও আমি গিয়েছি।

এ সময় পাঁচ দিনব্যাপী ভারত সফর থেকে ফিরে এসে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ইস্যুটিকেও ব্যাপকভাবে সামনে আনেন সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদ। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে আমি সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমের সাথে আলাপ করার

www.pathagar.org

প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। আমিই ফোন করে সময় নিই। অবশ্য আমি ফোন করায় তিনি খুবই আগ্রহের সাথে আমাকে তার বাসায় অথবা মৌচাকে তার অফিসে দাওয়াত দেন। আমি মৌচাকে তার ব্যাবসায়িক অফিসে যাই এবং কথা বলি। আলাপ শেষে তিনিই বলেন—'চট্টগ্রাম থেকে ফিরে এসে আরও বিস্তারিত কথাবার্তা হবে।'

সেদিন নানা কারণে আমাদের কোনো কোনো নেতার ব্যাপারে তার ক্ষোভের কথাই বেশি জানান। বিশেষ করে যে মীর কাসেম আলীর সাথে তার বেশি সখ্য ছিল, তার প্রতিই তিনি বেশি রুক্ষ কথা প্রকাশ করলেন। অবশ্য বড়ো কারণটা ছিল ইসলামী ব্যাংক থেকে তার চাহিদা মোতাবেক লোন না পাওয়া এবং একটি গবেষণা সংস্থায় কাজ নিয়ে তার সাথে মীর কাসেম সাহেবের দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া। তার ক্ষোভের কারণ জানতে পারলাম। ফলে তার ভূমিকা সম্পর্কেও আমার কিছু উপলব্ধি হলো। তবে সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম তার কল্যাণ পার্টির কার্যক্রম এখনও অব্যাহত রেখেছেন এবং অবশেষে চারদলীয় জোট যখন সম্প্রসারিত করে আঠারো দলীয় জোট করা হয়, তখন আঠারো দলীয় জোটে যোগদান করেছেন। তিনি টিভি টকশোতে ভালো বলেন এবং পত্রপত্রিকায় বেশ লেখালিখি করেন, যা আমি পছন্দ করি। তার আলোচনা ও লেখায় মনে হয়েছে, তিনি গুছিয়ে কথা বলায় বেশ পারদর্শী একজন দেশপ্রেমিক এবং ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী লোক।

যাহোক, ডিজিএফআইয়ের 'মাইনাস টু' ফরমুলা বা কিংস পার্টি গঠন অথবা ড. মুহাম্মদ ইউনুসের রাজনীতিতে আসা—এসবের কোনো প্রকল্পই শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। বরং শেষ পর্যন্ত এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে যেকোনো কারণেই হোক, দুই মহিলার অবস্থান সেনাসমর্থিত সরকারের নানা কৌশলের পর মনে হয় আরও যেন শক্তিশালী হয়েছে। পরিবারতন্ত্রের রাজনীতির বিরুদ্ধে যে শক্ত অবস্থানের কথা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ তার প্রথম ভাষণে বলেছিলেন, তাও টেকে নাই। ব্যক্তিতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্র বাংলাদেশের রাজনীতির মাঠে কঠিনভাবে সম্পৃক্ত আছে।

যেদিন ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে সেনাসমর্থিত সরকার শপথ গ্রহণ করে, সে অনুষ্ঠানে বেগম জিয়া বা বিএনপি-জামায়াত অংশ না নিলেও শেখ হাসিনা দলবল নিয়ে অংশ নেন এবং এই বলে উল্লাস করেন—'এই সরকার আমাদের আন্দোলনের ফসল।'

www.pathagar.org

সেনাসমর্থিত সরকার যেসব অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে, তাতে তারা সফল না হলেও শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগের সাথে আঁতাঁত করেই তাদের এক্সিট বা বহির্গমন স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করতে হয় এবং আন্তর্জাতিক শক্তিও এতে মদত জোগায়। এ প্রসঙ্গে অন্যত্র আরও বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইল।

(সকাল ৬:৫০ টা; ১৫ এপ্রিল, ২০১৪)

www.pathagar.org

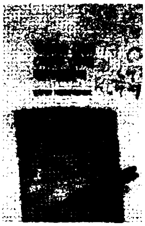

ফখরুদ্দীন সরকারের ব্যর্থতা

আন্তর্জাতিক শক্তির সহায়তার উচ্চাকাঙ্ক্ষী মইন ইউ আহমেদের জরুরি আইনের ছদ্মাবরণে সেনা-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত হয় তথাকথিত সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নিজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত নেন। সে প্রক্রিয়াটাও স্বচ্ছ ছিল না।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য সর্বশেষ অপশন ছিল রাষ্ট্রপতি নিজে দায়িত্ব নেওয়া। কিন্তু আগের তিনটি স্তর পার হওয়ার পরই তা হতে পারে। কিন্তু ড. ইয়াজউদ্দিন তিনটি স্তর পার না করেই দায়িত্ব নিয়ে সংকটকে জটিল করে ফেলেন। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাবে তিনি নবগঠিত উপদেষ্টা পরিষদ নিয়ে কাজ করতে পারছিলেন না। উপদেষ্টা পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিপরীত কাজ করে বসতেন অথবা উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করতেন। তিনি তার নিয়োগদাতা দলের ওপর নির্ভর করতেন বা সেখান থেকে নির্দেশ পাওয়ার অপেক্ষায় থাকতেন। ফলে সংকট আরও জটিলতর হতে থাকে।

রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের দুর্বলতার পুরো সুযোগ গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ। এর আগে নির্বাচন কমিশন গঠন প্রশ্নে বিএনপি যথেষ্ট অপরিপক্বতার পরিচয় দেয়। বিএনপির প্রস্তাব দেওয়া উচিত ছিল, আওয়ামী লীগ কাদেরকে নির্বাচন কমিশনের সদস্য করতে চায়, তার একটি তালিকা পেশ করুক এবং সেই কয়েকজনকে নিয়ে অর্থাৎ, বিরোধী দলের পছন্দ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠন করলে সংকট উত্তরণ অনেক সহজ হতো।

এরপরও জোড়াতালি দিয়ে ২২ জানুয়ারি, ২০০৭ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছিল। আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টিসহ শেষ পর্যন্ত সকল দলই নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করে। কিন্তু এ সময় মনোনয়নপত্র

www.pathagar.org

বাছাই করলে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পাঁচটি মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। তিনি নির্বাচন কমিশনে আপিল করেন। নির্বাচন কমিশনও নাকি একটি টেলিফোনের চাপে এরশাদের আপিল নাকচ করে দেয়। ফলে তিনি নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন।

যদি এরশাদের মনোনয়নপত্র বাতিল না করা হতো, তাহলে তিনি নির্বাচনে যেতেন এবং তিনি নির্বাচনে গেলে আওয়ামী লীগও যেতে বাধ্য হতো। এভাবে শেষবেলায় এসে আওয়ামী লীগ নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে প্রার্থিতার আবেদন প্রত্যাহারের দিন আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি তাদের প্রার্থীদের প্রত্যাহার করে নেয়। এ পরিস্থিতিতে একতরফা নির্বাচনের প্রশ্নে আন্তর্জাতিক মহলেও তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। তারা পর্যবেক্ষক দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ওদিকে জাতিসংঘের একটি চিঠিতে নির্বাচন নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়। শুনেছি, সেই চিঠিতে শান্তি মিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের যোগদান অনিশ্চিত হয়ে যাবে—এ মর্মে দুটি বাক্য সংযোজন করে সেনাবাহিনীতে আতঙ্ক ছড়ানো হয়।

জেনারেল মইন ইউ আহমেদ এই চিঠিটাকেই ক্ষমতা দখলের মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। যেহেতু সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা শান্তি মিশনে আর্থিকভাবে লোভনীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে আগ্রহী এবং একতরফা নির্বাচনে সরকারকে সহযোগিতা করলে শান্তি মিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের নেওয়া হবে না, তাই নির্বাচন বন্ধ করতে মইন ইউ আহমেদ এগিয়ে আসেন। এতে মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীসহ অন্যান্য সেনা কর্মকর্তাগণ মইন ইউ আহমেদকে সহযোগিতা করেন এবং স্বাভাবিকভাবেই সেনাবাহিনীর সদস্যরাও মইন ইউ আহমেদের পদক্ষেপ সমর্থন করে।

ফখরুদ্দীনের উপদেষ্টা পরিষদে যাদের নেওয়া হয়, তাদের মধ্যে সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল হাসান আরিফ, ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের গ্রহণযোগ্যতা ভালোই ছিল। ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন ও জেনারেল আবদুল মতিনকে মনে করা হতো বিএনপিপন্থি। তা ছাড়াও ছিলেন ইফতেখার আহমদ চৌধুরী, পুলিশের সাবেক আইজি আনোয়ার ইকবাল, গীতিআরা সাফিয়া ও রাশেদা কে চৌধুরী। প্রথম ভাষণে ফখরুদ্দীন আহমদ অনেক নীতিকথা বলেন। পরিবারতন্ত্র, দুর্নীতি, অসুস্থ রাজনীতির কথা বলা হয়। ব্যাপক সংস্কার ও দুর্নীতি দমন ইত্যাদির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

www.pathagar.org

এক. শুরুতেই সেনাসমর্থিত এই সরকার দুর্নীতি দমনের নামে কতিপয় রাজনীতিক ও বেশ কিছু ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে। দুর্নীতিবিরোধী টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। দুর্নীতিবাজ বলে বিভিন্ন দলের নেতা ও ব্যবসায়ীদের যে তালিকা তৈরি করা হয়, তাতে দুর্নীতিবাজ লোক যেমন ছিলেন, আবার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার ভালো লোকের নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অভিযানের ফলে কিছু দুর্নীতিবাজ তাদের অবৈধ অর্থ ও দামি গাড়ি ইত্যাদি নিয়ে বেসামাল অবস্থায় পড়েন। কেউ কেউ গাড়ি রাস্তায় ফেলে যান এবং সেসব দামি গাড়ি পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়। আবার টাকার বস্তা মসজিদে রেখে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে। পৃথিবীর আর কোনো দেশে এমন ঘটনা ঘটেছে কি না আমার জানা নেই।

অনেক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। গোটা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় আতঙ্কিত ও বিক্ষুব্ধ হন। ফলে অর্থনীতির ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। অনেকে দেশ ছেড়ে লম্বা সময়ের জন্য বিদেশে আশ্রয় নেন। ওদিকে সেনাবাহিনীর লোকেরা সামরিক আইন জারি করা হলে যেমন রাস্তাঘাটে তল্লাশি এবং সেনাবাহিনীর সদস্যদের টহল ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে সন্ত্রস্ত করা হয়, ঠিক তেমনটি শুরু করে। ভেজালবিরোধী অভিযানের নামে সামান্য কারণে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মনোহারী দোকানের মালিকদের পর্যন্ত সেনাবাহিনী আটক করে জেলে পাঠায় এবং আটকের সময় নির্যাতন চালায়।

এমন ঘটনার কথা আমি জানি, মফস্বলের ছোটো বাজারে মনোহারী দোকানে মেয়াদোত্তীর্ণ পানীয়ের বোতল পাওয়ার কারণে সেই দোকানের মালিকের ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়। দোকানদার আপত্তি জানায় যে, ওসব মেয়াদোত্তীর্ণ বোতল রেখে দেওয়া হয়েছে কোম্পানির লোকেরা এসে নিয়ে যাবে বলে। কিন্তু কোনো কথাই আমলে না নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়। এমনও শুনেছি, খাওয়ার অনুপযুক্ত কিছু ডাল পেয়েছে এক দোকানে, সেজন্য তাকেও গ্রেফতার করা হয়। দোকানির দাবি যে, ওসব ফেলে দেওয়ার জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছে। বিক্রয় করার উদ্দেশ্য থাকলে তো আলাদা না রেখে ভালো ডালের সাথে মেশানো হতো। কিন্তু অভিযানে যেসব সৈনিক ছিল, তারা কোনো যুক্তি মানতেই রাজি ছিল না। মোটামুটিভাবে সারা দেশেই অল্প সময়ের মধ্যে গোটা ব্যবসায়ী সমাজ সেনাবাহিনীর এই অভিযানের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

www.pathagar.org

দুই. দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে নেমে সেনাবাহিনী, র‍্যাব ও পুলিশের তথা গোটা প্রশাসনের সুযোগসন্ধানীরা নিজেরাই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাপ দিয়ে নগদ টাকা ঘুস হিসেবে নিতে শুরু করে। খুব অল্প দিনের মধ্যেই এসব কেলেঙ্কারি ছড়িয়ে পড়ে এবং সেনাসমর্থিত সরকারকে জনগণ প্রথমদিকে যেভাবে সমর্থন করেছিল, তা পালটে যেতে থাকে।

তিন. অবৈধ জমি উদ্ধারের নামে রাজপথের দুই ধারের স্থাপনা বুলডোজার দিয়ে ধ্বংস করা হয়। গ্রামেগঞ্জে সরকারি পতিত জমির ওপর যেসব হাট-বাজার শতবর্ষ ধরে চলে আসছিল, সেখানকার ছোটো ছোটো দোকান পর্যন্ত বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। স্বল্প আয়ের লক্ষ লক্ষ ছোটো দোকানের মালিক সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসে যায়। ফলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে জনগণ শুধু হতাশ নয়; বরং সেনাসমর্থিত সরকারের ওপর বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

চার. সেনাসমর্থিত সরকারের ছত্রছায়ায় সরকারের বা সেনাবাহিনীতে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ব্যবসায়-বাণিজ্য বা ব্যাংক থেকে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা নেওয়া থেকে শুরু করে ফ্ল্যাট, প্লট ও জমিজমা যে যেখানে পেরেছে হাতিয়ে নিয়েছে। নিজের নামে, বেনামে ও আত্মীয়স্বজনদের নামে রাতারাতি এদের অনেকে টাকার কুমির বনে যায়, বিপুল বিত্তের মালিক হয়ে যায়।

পাঁচ. দুই নেত্রীকে গ্রেফতার করে শেষ পর্যন্ত সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়। সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে যেভাবে গ্রেফতার করে জাতীয় সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের বাসভবনে সাব-জেল বানিয়ে আটক রাখা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে যেসব মামলা দেওয়া হয়, স্বাভাবিকভাবেই দুই নেত্রীর দলের লোকেরা তা মেনে নিতে পারেনি। এ সময় ছড়িয়ে পড়ে 'মাইনাস টু' ফরমুলার কথা। 'এই দুই নেত্রীই সব অনিষ্টের মূলে, তাদের রাজনীতি থেকে বিদায় নেওয়া উচিত'—এমন একটি প্রচারণা অবশ্য কমবেশি দুই দলের অভ্যন্তরেও ছিল। কিন্তু বিদেশিদের ইঙ্গিতে সেনাবাহিনীর উচ্চাভিলাষীরা দেশকে নেতৃত্বশূন্য করছে, এমন একটা কথাও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, দুই দলের অনেক নেতাকে গ্রেফতার করে জাতীয় সংসদে আদালত বসিয়ে যে প্রক্রিয়ায় বিচারকাজ শুরু হয় এবং জুনিয়র সেনা কর্মকর্তারা বিচারকাজে যেভাবে হস্তক্ষেপ করছিল, তা মেনে নেওয়া দেশবাসীর জন্য কঠিন ছিল।

www.pathagar.org

ছয়. সংবিধানে নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচনের কথা থাকলেও ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরির পর নির্বাচন হবে বলে সময়ক্ষেপণের কৌশল নেওয়ায় জনমনে সংশয় সৃষ্টি হয় যে, তথাকথিত সেনাসমর্থিত সরকার দীর্ঘস্থায়ীভাবে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার পথে অগ্রসর হচ্ছে। সেনাপ্রধানের নানা রাজনৈতিক বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড জনমনে প্রশ্নের সৃষ্টি করে। মইন ইউ আহমেদ নিজে রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য একটি সেমিনারে নিবন্ধ উপস্থাপন করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সংবিধানে ভারসাম্য সৃষ্টির প্রস্তাব করেন। এমন গুরুতর রাজনৈতিক ইস্যুতে দায়িত্বরত সেনাপ্রধানের বক্তব্য প্রদান জনগণের সংশয়-সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দেয়। আবার সেনাপ্রধানের ত্রাণতৎপরতার ব্যাপক প্রচার এবং ত্রাণ তহবিলে অর্থ ও ত্রাণসামগ্রী গ্রহণের ঘটনা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি তো সরকারের দায়িত্বরত কেউ নন। অথচ ভূমিকা পালন করছেন এমন যে, তিনিই সবকিছু।

সাত. সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদ আরও কতিপয় বিষয়ে উদ্যোগ নেন। জাতীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ঐকমত্য সৃষ্টির জন্য জাতীয় নেতাদের স্বীকৃতি এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার ইস্যুটিকে তিনি সামনে নিয়ে আসেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীকে জাতীয় নেতা হিসেবে ঘোষণার কথা বলেন। শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে তারা খুব একটা অগ্রসর হতে পারেননি।

আট. ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে রাজনীতিতে নামানোর একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়। নোবেল বিজয়ী এই ব্যক্তিকে রাজনীতিতে নামানোর পেছনে কারা উৎসাহ প্রদান করেন তা সুনির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও এ ব্যাপারে পশ্চিমা আন্তর্জাতিক শক্তির যে জোরালো সমর্থন ছিল, তা বলাই বাহুল্য। নাগরিক শক্তি (নাশ) নামক সংগঠন করার ঘোষণা দিয়ে একপ্রকার হইচই শুরু করে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই ড. মুহাম্মদ ইউনূস এ উদ্যোগ থেকে পিছু হটেন। আমার মতে কাজটা তিনি ভালোই করেছেন। কারণ, এটি একটি ভুল পদক্ষেপ হতো।

তথাকথিত সেনাসমর্থিত সরকারের পক্ষ থেকে বিএনপিতে ভাঙন সৃষ্টির চেষ্টা এবং নির্বাচন কমিশনকে এ কাজে ব্যবহার করে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। ওদিকে আওয়ামী লীগের রাজ্জাক, আমু, তোফায়েল, সুরঞ্জিত (সংক্ষেপে RATS) দলে

www.pathagar.org

সংস্কারের পক্ষে পৃথক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন। এর পেছনেও ছিল ডিজিএফআই। ফজলুল করিম সেলিম ও দলের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিলের মাধ্যমেও শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়ানো হয়। ফজলুল করিম সেলিম শেখ হাসিনার অনেক দুর্নীতির কথা তুলে ধরেন। ফজলুল করিম সেলিম ও আবদুল জলিলের বক্তব্যের ভিডিও-অডিও রেকর্ড বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং রাজনীতিতে এসব নানা চমক সৃষ্টি করে। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে সেনাসমর্থিত সরকারের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়। আবার রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ দুই নেত্রীর হাতেই চলে যায়। আরও কিছু লোক দিয়ে একটি Kings Party গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। উদ্যোক্তাদের ধারণা ছিল, এতে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের তরুণ নেতারা অংশগ্রহণ করবেন, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। কিছু ব্যর্থ ও দলছুট লোককে সমবেত করতে সক্ষম হলেও কোনো কার্যকর রাজনৈতিক দল গঠন করতে ব্যর্থ হয় সেনাসমর্থিত সরকার।

নয়. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে খেলা দেখার সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেনাসদস্যদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের সংঘর্ষ হয়। এ সংঘাত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররা বিশাল বিক্ষোভের আয়োজন করে এবং তা দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও ছড়িয়ে পড়ে। সরকার কারফিউ জারি করতে বাধ্য হয়।

একজন জেনারেলের গাড়ি এলিফ্যান্ট রোড এলাকার বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররা অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেয়। জেনারেলের ছেলে গাড়ি নিয়ে সেখানে গিয়েছিল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. হারুনর রশিদ ও আনোয়ার হোসেনসহ বেশ কজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে ও কতিপয় ছাত্রকে গ্রেফতার করলে পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সরকার একপর্যায়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের মুক্তি দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের অঙ্গীকার করে কোনোমতে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় সেনাসমর্থিত সরকারের ভিত নড়ে যায়।

দশ. যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জাতিসংঘের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি Regime Change-এর পরিকল্পনা করেছিল, তারাই একটি বোঝাপড়া করে শেখ হাসিনাকে তথা আওয়ামী লীগকেই ক্ষমতায় বসানোর নীলনকশা তৈরি করে।

www.pathagar.org

শেখ হাসিনা চিকিৎসার জন্য বিদেশ গিয়েছিলেন এবং সে সময়ই আমেরিকার সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিচার্ড বাউচারের সাথে তার বৈঠকের পর তিনি দেশে ফিরে আসেন।

সেনাসমর্থিত সরকার একপর্যায়ে দুই নেত্রীকেই মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। মুক্তি দেওয়ার আগে তারা দুই নেত্রীর সাথেই আলাদাভাবে আলোচনা করে। বলা যায়, সেনাসমর্থিত সরকারের অপরিণামদর্শিতার কারণে কার্যত দুই নেত্রী আরও শক্তিশালী হয়েই রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় সেনাবাহিনীর প্রধান মইন ইউ আহমেদ খালেদা জিয়ার সাথেও যোগাযোগের চেষ্টা করেন; কিন্তু বেগম খালেদা জিয়ার অনমনীয় মনোভাবের কারণে তা সম্ভব হয়নি।

আমরা কেউ কেউ চেয়েছিলাম যে, এই বৈঠকটি হওয়া উচিত। আমরা অনুভব করেছিলাম, সেনাবাহিনীর সাথে হয়তো-বা আওয়ামী লীগের একটি সমঝোতা হয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত সেনাবাহিনীর ভেতর থেকে মইন ইউ আহমেদ একটা চাপের কারণেই খালেদা জিয়ার সাথে বৈঠক করতে চেয়েছিলেন। এ বৈঠক হলেও তা আদৌ কোনো ফলদায়ক কিছু হতো নাকি একটি লোকদেখানো ব্যাপার ছিল, তা বলা মুশকিল।

ও দিকে মইন ইউ আহমেদের ছয় দিনের ভারত সফরে বিপুল সংবর্ধনা এবং সেটা যে একটি বড়ো ধরনের মিশন ছিল বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য, সে বার্তাও আমরা পাচ্ছিলাম। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যেভাবে মইন ইউ আহমেদকে রেড কার্পেট সংবর্ধনা দিয়েছেন, তা নজিরবিহীন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারি, ভারত সফরকালে কতিপয় বিষয়ে মইন ইউ আহমেদের সাথে সেখানকার সংশ্লিষ্টদের একটি চুক্তি হয়। এ চুক্তির প্রধান শর্ত ছিল—আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসতে সহায়তা করা। দ্বিতীয় শর্ত ছিল—বাংলাদেশে ইসলামী শক্তির উত্থান রোধ করতে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করা এবং তথাকথিত যুদ্ধাপরাধের বিচার শুরু করা। বিনিময়ে মইন ইউ আহমেদকে রাষ্ট্রপতি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ভারত।

এগারো. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যে আয়োজন করা হচ্ছিল, সেটা ছিল মূলত শেখ হাসিনাকে ক্ষমতার বসানোর একটি নীলনকশা। ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তিকে খতম করে ধর্মনিরপেক্ষতার দাবিদারদের ক্ষমতায়

www.pathagar.org

বসানোর এ সাজানো নির্বাচনের পেছনে পশ্চিমাশক্তি ও ভারত একযোগে কাজ করেছে। যেকোনো কারণেই হোক, বিএনপি বিশেষ করে পশ্চিমা শক্তির আস্থা হারিয়েছিল এবং বিএনপিকে তারা পুনরায় ক্ষমতায় দেখতে চায়নি।

নবম সংসদ নির্বাচনে বিএনপি যে ক্ষমতায় ফিরতে পারবে না এবং বিএনপিকে পার্লামেন্টে একটি নগণ্য দলে পরিণত করে সংবিধান সংশোধন করার মতো দুই-তৃতীয়াংশ আসনে ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগকে জিতিয়ে আনার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন, তার সব পদক্ষেপই নেওয়া হয়েছিল। বেগম খালেদা জিয়ার কাছে এ খবর ছিল যে, কোনোমতেই নির্বাচনে বিএনপিকে ভালো করতে দেওয়া হবে না এবং ৩০-৪০টি আসন দেওয়া হবে মাত্র। তিনি চারদলীয় জোটের এক বৈঠকে এ ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে এ কথা বলেছিলেন। তিনি নির্বাচনে যেতে চাননি। আবার তিনি নির্বাচনবিরোধী এমন দায়দায়িত্বও নিতে দ্বিধান্বিত ছিলেন।

জামায়াত নির্বাচনে যাওয়ার পক্ষে ছিল। জামায়াতের সিদ্ধান্ত ছিল—জামায়াত নির্বাচনে যাওয়ার পক্ষে, যদি বিএনপিকে সাথে নেওয়া যায়। নির্বাচনে যাওয়ার পক্ষে জামায়াতের শক্ত অবস্থান দেখার পরও তিনি বলেছিলেন—'দেখুন, এটা নীলনকশার নির্বাচন। তারা বিএনপিকে হয়তো কয়েকটা আসন দিয়ে এবং জামায়াতকে একটি আসনেও বিজয়ী হতে দেবে না।' যাহোক, বেগম খালেদা জিয়ার ধারণা ছিল—জামায়াত বিএনপিকে ছাড়াই নির্বাচনে চলে যেতে পারে। মনে করা হয়, শেষ পর্যন্ত বেগম খালেদা জিয়া এসব বিবেচনা করেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ কারণে বিএনপির পক্ষ থেকে জামায়াতকে দোষারোপ করা হয়ে থাকে। তবে ডিজিএফআইয়ের এটা সাফল্য যে, বিএনপি ও জামায়াতকে নীলনকশার নির্বাচনে নিতে পেরেছে।

দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে এ নির্বাচন অংশ নেওয়ার ফলে হাসিনা-এরশাদ- মইন ইউ আহমেদের আঁতাতের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন সহজ হয়ে যায়। ফখরুদ্দীন-মইন ইউ আহমেদ তাদের তথাকথিত দুই বছরের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আয়ু দীর্ঘায়িত করতে না পারলেও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানোর পরিকল্পনায় শতভাগ সফল হন। এভাবে ত্রিমুখী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়াটা ছিল বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের জন্য এক ঘনঘোর অশনিসংকেত।

www.pathagar.org

নবম সংসদ নির্বাচনে বিএনপির কৌশলগত ত্রুটি

নির্বাচনটা ছিল বিএনপি বনাম আওয়ামী লীগ। অন্যকথায় চারদলীয় জোট বনাম মহাজোট। আসন বণ্টনে আওয়ামী লীগ যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়ে শরিকদের দাবি অনুযায়ী অনেক আসন ছেড়ে দেয়। পক্ষান্তরে বিএনপি শরিকদের আসন ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কৃপণতার পরিচয় দেয়। যদিও আসন ছেড়ে দেওয়াটা দয়ার ব্যাপার ছিল না; বরং রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশের ব্যাপার ছিল। বিশেষ করে জামায়াতের ভালো ভোট আছে—এমন অনেক জেলার জামায়াতকে একটিও আসন না দেওয়ায় জামায়াতের সমর্থকদের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

জামায়াতকে মাত্র ২৯টি আসনে ছাড় দেয় বিএনপি। ৬টি আসন নিয়ে জামায়াত অনেক বেশি অনুরোধ করে। জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের জন্য ফরিদপুরের কামাল ইবনে ইউসুফের আসন ছেড়ে দিলেও বিএনপি এটা ভালোভাবে নেয়নি। এর প্রতিক্রিয়াতেই জামায়াতের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত ৬টি আসন বিএনপি নেত্রী বিবেচনা করেননি। জামায়াত নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের চাপে কয়েকটি আসনে জোটের সিদ্ধান্তের বাইরে প্রার্থী দেয়। এটাও বিএনপিকে ক্ষুব্ধ করে।

তা ছাড়া প্রার্থী মনোনয়নে বিএনপির যে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল, তা হয়নি। ক্ষমতায় থাকার কারণে যেসব মন্ত্রী বা এমপির বিরুদ্ধে দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অভিযোগ ছিল, তাদেরকে মনোনয়ন না দিয়ে সেসব আসনে নতুন মুখের ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নেওয়া রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচায়ক হতো; কিন্তু তা করা হয়নি। অথচ আওয়ামী লীগ কিন্তু এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতার পরিচয় দিয়েছিল।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল আওয়ামী লীগের সাথে। কিন্তু বিএনপির নির্বাচনী অভিযানে ফখরুদ্দীন-মইন ইউ আহমেদের সরকারের সমালোচনাই প্রাধান্য পায়। ফলে আওয়ামী লীগের জন্য সুবিধা হয়ে যায়। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরে এলে যে গণতন্ত্রের সংকট হবে, এ বিষয়টি আড়ালে চলে যায়। আওয়ামী লীগের ফ্যাসিস্ট চরিত্র জনগণের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। একদলীয় শাসন, বাকশাল, মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিশেষ দেশের প্রতি আনুগত্য, সংবাদপত্র দলন, জনগণের অধিকার হরণ—এসব বিষয়ে প্রচারাভিযানে জোর দেওয়ার পরিবর্তে

www.pathagar.org

ফখরুদ্দীনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নানা ব্যর্থতা এবং সেনাপ্রধান তথা সেনাবাহিনীর ভূমিকার সমালোচনা প্রাধান্য পায়। এই প্রচারাভিযানের ফলে মইন ইউ আহমেদরা সশস্ত্র বাহিনীকে এটা বোঝাতে সক্ষম হয় যে, বিএনপি ক্ষমতায় এলে জরুরি আইন জারি এবং দুই বছর অবৈধ ক্ষমতায় থাকার জন্য তাদের বিচার হবে। ফলে নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেই তারা নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করার সিদ্ধান্ত নেয়। নির্বাচনী প্রচারকৌশলের এই মারাত্মক ভুলের কারণে বিপুল জনমত বিএনপির পক্ষে থাকা সত্ত্বেও সেনাপ্রশাসন নির্বাচনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে এবং তাদের নীলনকশা বাস্তবায়ন করে।

নবম সংসদ নির্বাচন ও জামায়াতের ভুল

নবম সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারে জামায়াতের হিসাব-নিকাশও সঠিক ছিল না । প্রথমত নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে অত বেশি জোর দেওয়া ঠিক হয়নি। জামায়াতের সঠিক সিদ্ধান্ত খালেদা জিয়ার কাছে না পৌছানো বা জামায়াতের সিদ্ধান্ত বুঝতে তার ভুল হওয়ার দায় জামায়াত এড়াতে পারে না। জামায়াতের সিদ্ধান্তের মূলকথা ছিল, বিএনপিকে ছাড়া জামায়াত নির্বাচনে যাবে না। সহজ ভাষায় এ কথাটা খালেদা জিয়ার কাছে পৌছায়নি। যে কারণে তিনি ধারণা করেছেন, জামায়াত বিএনপিকে ছাড়াই নির্বাচনে চলে যাবে। দ্বিতীয়ত, ফরিদপুরে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেলের আসন নিয়ে দরকষাকষি করা জামায়াতের একটি ভুল কাজ ছিল। কামাল ইবনে ইউসুফকেই সেই আসনটিতে মনোনয়ন দেওয়া উচিত ছিল অর্থাৎ, জামায়াতের উচিত ছিল সেই আসনটি ছেড়ে দিয়ে সম্ভাবনাময় কয়েকটি আসন নিয়ে দরকষাকষি করা। এতে মনে হয় বিএনপিও নমনীয় হতো।

২০০১ সালে নির্বাচনের মতো জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচন না করে বেগম খালেদা জিয়ার সাথে নির্বাচনী অভিযানে সংযুক্ত থাকতেন, তাহলে ভালো হতো। ডিজিএফআইয়ের চক্রান্তও জামায়াত আঁচ করতে পারেনি। জামায়াতকে যে শূন্য আসনে নামানোর পরিকল্পনা করা হয়, তা জামায়াত বুঝতে পারেনি। ডিজিএফআই কার্যত জামায়াতকে ধোঁকা দিয়েছে খুব চাতুরীর সাথে। এখানে উল্লেখ্য যে, ডিজিএফআই কর্মকর্তারা কয়েক দফা জামায়াত নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে আস্থা লাভের চেষ্টা করেন এবং নির্বাচনের পক্ষে

www.pathagar.org

যাতে জামায়াত শক্তভাবে থাকে, এ ব্যাপারে জামায়াতকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেন। সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচন করবে, এমন ধারণা দিতে তারা সচেষ্ট ছিলেন। জামায়াত নিজে যেহেতু প্রতারণার রাজনীতি করে না, তাই অন্য কাউকেও সেভাবে সন্দেহ করে না। জামায়াতও ভাবতে থাকে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যেই দেশের কল্যাণ রয়েছে।

জামায়াত আদৌ বুঝতেই পারেনি যে, একটি নীলনকশার নির্বাচন হতে যাচ্ছে। ফলে নির্বাচনে বড়ো ধরনের বিপর্যয় হলো। সাতকানিয়া-লোহাগাড়া আসনে শামসুল ইসলাম ও মহেশখালী-কুতুবদিয়া আসনে হামিদুর রহমান আযাদ— এই দুজন মাত্র বিজয়ী হন জামায়াত প্রার্থীদের মধ্য থেকে। আমি আগের নির্বাচন থেকে ৪৫ হাজার ভোট বেশি পাই। অথচ আমাকেও পরাজিত দেখানো হয়। সবই ছিল সেনাবাহিনী, ডিজিএফআই ও ফখরুদ্দীনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কারসাজি।

ও দিকে সারা দেশে বিএনপিকে মাত্র ৩০টি আসনে বিজয়ী দেখানো হয়। এ নির্বাচনে জনমতের প্রতিফলন ঘটেনি। খালেদা জিয়ার প্রতিটি জনসভায় ছিল লাখো জনতার ঢল। আমার নির্বাচনী এলাকাতেও নির্ধারিত সময়ের কয়েক ঘণ্টা পর হাজির হওয়া সত্ত্বেও লক্ষাধিক মানুষ ধৈর্য ধরে বেগম জিয়ার বক্তব্য শোনেন। খালেদা জিয়ার আগমন পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করেছেন এবং তার কথা না শুনে কেউ চলে যাননি। নির্বাচনে চার দলের পক্ষে ভালো জনমত থাকা সত্ত্বেও হাসিনা-মইন-এরশাদের আঁতাতের কারণে এবং আন্তর্জাতিক শক্তির সমর্থনের ফলে নির্বাচনের ফলাফলে সূক্ষ্মভাবে হস্তক্ষেপ করে শেখ হাসিনার বিপুল বিজয় নিশ্চিত করা হয়। বিএনপি মাত্র ৩০টি এবং জামায়াত মাত্র ২টি আসনে জয়ী হয়। এ বিস্ময়কর ফলাফলের ব্যাপারে খোদ আওয়ামী লীগের নেতারাই হতবাক হয়ে যান। সেনাবাহিনী ও প্রশাসন যে আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে নির্বাচনকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে, তার দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের নবম সংসদ নির্বাচন; ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৮।

এ নির্বাচনের ফলাফলে বিএনপি ও জামায়াতের নেতারা এতই অপ্রস্তুত ও হতবাক হয়ে যান যে, নির্বাচনে কারচুপি ও অনিয়মের ব্যাপারগুলো তারা মিডিয়া ও পর্যবেক্ষকদের সামনে তুলে ধরার কোনো উদ্যোগ নিতেও ব্যর্থ হন। প্রিসাইডিং অফিসারগণ প্রকৃত ফলাফল কীভাবে উলটিয়ে দিয়েছিলেন, তার দৃষ্টান্ত ২০০৮-এর এই নবম সংসদ নির্বাচন। ভোটকেন্দ্র পর্যায় থেকে প্রাপ্ত

www.pathagar.org

নির্বাচনী ফলাফলে আমরা এগিয়ে থাকলেও প্রিসাইডিং কর্মকর্তারা রিটার্নিং অফিসারের কাছে যে ফলাফল জমা দেন, তাতে নিশ্চয় ফারাক ছিল। অনেকে উপজেলা কেন্দ্রে যেখানে ফলাফল গ্রহণ করা হয়, সেখানে এসেও ফলাফল পরিবর্তন করেছেন। আমার নির্বাচনী এলাকায় তাৎক্ষণিকভাবে এমন কয়েকটি কেস ধরে পুলিশে হস্তান্তর করার পরও কোনো প্রতিকার হয়নি। জয়লাভ করা নির্বাচন আমি কীভাবে প্রশাসনিক ষড়যন্ত্রের কাছে হেরে গেলাম, তা নিজেও বুঝতে পারিনি। গ্রাম থেকে আমার ভোটার ও সমর্থকগণ যাতে শহরে ঢুকতে না পারে, সেজন্য সন্ধ্যা থেকে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও র‍্যাব লোকদের বাধা দিচ্ছিল এবং তাদের ওপর লাঠিচার্জ করছিল। সেনা কর্মকর্তার সামনে আওয়ামী লীগের গুন্ডারা আমার ছেলেদের ওপর হামলা চালালেও তারা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। অবশ্য নির্বাচনের কয়েক দিন পর সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তা আমার কাছে ফোন করে ক্ষমা চেয়েছিলেন তাদের অসহায়ত্বের কথা উল্লেখ করে। তাদের প্রতি ওপর থেকে নির্দেশ ছিল, যেকোনো মূল্যে আমাদের পরাস্ত করতে হবে। আর এ কারণেই আমরা যেসব আসনে জয়লাভ করার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম, যেসব আসনেও আমাদেরকে পরাজিত দেখানো হয়।

দুই-তৃতীয়াংশ আসনে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করার জন্য সেনাসমর্থিত ফখরুদ্দীন আহমদের সরকার বহুমুখী কৌশল অবলম্বন করে। প্রশাসনকে অর্থাৎ, ডিসি, এসপি ও ওসিকে ব্যবহার এবং নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসার ও প্রিসাইডিং অফিসারদের ব্যবহার করে আওয়ামী লীগের বিজয় নিশ্চিত করা হয়। ওদিকে ডিজিএফআই নির্দিষ্টসংখ্যক নির্বাচনী আসনের অতিরিক্ত ব্যালটপেপার ছেপে তা নির্বাচনের আগের রাতেই ব্যালট বাক্স ভরতি করে রাখাটা নিশ্চিত করে। ফলে কোনো কোনো নির্বাচনী আসনের ভোটকেন্দ্রে মাত্রাতিরিক্ত ভোট পড়ে। বিশেষ করে বিএনপি-জামায়াতের অনেক নিশ্চিত বিজয় লাভের মতো আসনে ৯০ থেকে শতভাগ এবং কোনো কোনো কেন্দ্রে শতভাগেরও বেশি ভোট কাস্ট দেখানো হয়। অতিরিক্ত সতর্ক ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যাতে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। সেনাবাহিনীর লোকদের চারদলীয় জোটের বিরুদ্ধে যে মোটিভেট করা হয়, তার একটি প্রমাণ ঢাকা সেনানিবাস ভোটকেন্দ্র। এই ভোটকেন্দ্রে সব ভোট এরশাদের বাক্সে পড়ে। মহাজোটকে বিজয়ী করানোর যে মিশন মইন ইউ আহমেদের ছিল, তারই অংশ হিসেবে এটা করা হয়।

www.pathagar.org

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে নির্বাচনের ফলাফল ভিন্ন হতে পারত। আওয়ামী জোট টেনেটুনে ১৫০ আসনের বেশি পেলেও পেতে পারত; কিন্তু বিএনপি মাত্র ৩০ এবং জামায়াত ২টি আসনে জয়লাভ করার মতো ফলাফল হতো না। হঠাৎ করে দেশের মানুষ আওয়ামী লীগের দিকে এত বিপুলভাবে ঝুঁকে পড়েছে, এমন কোনো বড়ো কারণ ঘটেনি। প্রতিবেশী দেশ থেকে নির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগ বিপুল ফান্ড পেয়েছে, এটাও সত্য। তবে নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য অর্থই সবকিছু নয়। বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে সেনাবাহিনী ও পুলিশ এবং সিভিল প্রশাসনের বড়ো একটা প্রভাব রয়েছে। তা ছাড়া যে দল যেখানে শক্তিশালী বা জনসমর্থন যাদের যে এলাকায় খুব বেশি, সেখানে কিন্তু সংশ্লিষ্ট দলের লোকেরা ভোটকেন্দ্রে শক্তি প্রয়োগ করে এবং দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বীদের হটিয়ে দিয়ে ব্যালট পেপারে কমবেশি সিল মারে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী কর্মীরা এ কাজে অন্যদের চাইতে অনেক বেশি পারদর্শী, এ কথা সবাই স্বীকার করবেন।

নতুন প্রজন্ম দিন বদলের স্লোগানের কারণে অথবা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে অনুপ্রাণিত হয়ে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে বলে যে প্রচারণা চালানো হয়, তা একেবারেই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। কারণ, নেতারা তাদের বক্তব্যে কোথাও যুদ্ধাপরাধীর বিচারের বিষয়টি হাইলাইট করেননি। এটা ঠিক যে, বেশ কিছু জায়গায় সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের পক্ষ থেকে আমাদের কিছু নেতার নির্বাচনী আসনে প্রচারণা চালানো হয়েছে। যেমন, আমার আসনে সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম ঢাকা থেকে শিল্পী নিয়ে গিয়ে এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত ভিডিও প্রোগ্রাম দেখিয়ে গণসঙ্গীতের আসর বসিয়ে দশ দিনব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছিল। তাদের প্রচারে যদি নতুন প্রজন্ম বা ভোটারগণ সাড়া দিতেন, তাহলে তো আমার ভোট অনেক কমে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমি আগের বারের চেয়ে ৪৫ হাজার ভোট বেশি পেয়েছি। আগেরবার পেয়েছিলাম ৬৫ হাজার ভোট আর ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে পেলাম এক লাখ দশ হাজার। প্রিসাইডিং অফিসারদের মাধ্যমে ফল জালিয়াতি করে সেনাবাহিনী ও প্রশাসন মিলে আমাকে হারিয়ে দেয়। নির্বাচনের কয়েক দিন পর একজন সেনা কর্মকর্তা ফোন করে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন শেরপুর-১ আসনের নির্বাচনে যা ঘটেছিল, তার জন্য।

*****

www.pathagar.org

ফাঁসির সেল থেকে দেখা বাংলাদেশ রাজনীতিবিদ, সংগঠক ও সাংবাদিক কামারুজ্জামানের শেষ রচনা। লেখাটি শুরু হয়েছে পলাশির যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মাধ্যমে বাংলা অঞ্চলের পরাধীনতার সূচনাকালের বিবরণ দিয়ে। তারপর তিনি সংক্ষেপে ধারাবাহিকভাবে বিবরণী টেনেছেন ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলমানদের স্বাধিকার আন্দোলনগুলোর। এরপর ব্রিটিশ শাসনামলের শেষ দিক থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত মোটামুটি কোথাও সংক্ষিপ্ত কোথাও বিস্তৃতভাবে জাতীয় রাজনীতির একটি স্কেচ এঁকেছেন।

একাত্তর-পরবর্তী সময় থেকে বইটির সবচেয়ে প্রাণবন্ত অংশের বর্ণনা শুরু হয়েছে। কেননা, এর আগ পর্যন্ত যে বয়ান লেখক দিয়ে আসছিলেন, সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে নিছক একজন ইতিহাসপাঠকের পাঠের নির্যাস। কিন্তু একাত্তর-পরবর্তী সময় থেকে যে বর্ণনা শুরু হয়েছে, সেখানে লেখক কেবল একজন পাঠক বা গবেষক নন; বরং তিনি নিজেই সেই ইতিহাসের প্রত্যক্ষদর্শী এবং নিজেই একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারও বটে। একজন মেধাবী ছাত্রনেতা থেকে প্রাজ্ঞ জাতীয় নেতার বিবরণীতে দীর্ঘ চার দশকের জাতীয় রাজনীতি ও জামায়াতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির একটি সামগ্রিক ধারণা আমরা এই বইয়ে পেয়ে যাই, যা ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য দলিল বিবেচিত হওয়ার উপযুক্ত।

ঠিক আত্মজীবনী না হলেও *ফাঁসির সেল থেকে দেখা বাংলাদেশ* আত্মজীবনীর যে রস, রূপ, গন্ধ; তার কিছু কিছু আমাদের পাইয়ে দেয়। আবার আত্মজীবনীর যে আত্মবয়ান কিংবা বারবার 'আমি' শব্দ উচ্চারণের শ্রুতিকটুতা, তা থেকেও বইটি অনেকাংশে মুক্ত। সব মিলিয়ে এটি একাধারে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির ইতিহাস পুস্তক, রাজনৈতিক বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থ ও আত্মজীবনীমূলক বইয়ের স্বাদ পাইয়ে দেবে পাঠককে।

www.pathagar.org

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান রাজনীতিবিদ, সংগঠক ও সাংবাদিক। জন্ম ১৯৫২ সালের ৪ জুলাই শেরপুর সদরের বাজিতখিলা ইউনিয়নের মুদিপাড়া গ্রামে। শেরপুর থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। ১৯৭২ সালে মোমেনশাহী নাসিরাবাদ কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে ১৯৭৬ সালে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন।

মাধ্যমিকে পড়াকালেই কামারুজ্জামান ছাত্ররাজনীতিতে সক্রিয় হন। ছাত্রশিবির ও জামায়াতে ইসলামী উভয় অঙ্গনেই তিনি শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসেবে জাতীয় রাজনীতিতে সরব ছিলেন। ১৯৭৮-৭৯ সালে ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি, ১৯৮২-৯২ সাল পর্যন্ত জামায়াতের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক এবং ১৯৯২-২০১৫ সাল পর্যন্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্বপালন করেন।

কর্মজীবনে মুহাম্মদ কামারুজ্জামান *ঢাকা ডাইজেস্ট*-এর নির্বাহী সম্পাদক, *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*-এর সম্পাদক এবং *দৈনিক সংগ্রাম*-এর নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। রাজনীতি ও সাংবাদিকতার পাশাপাশি একজন বুদ্ধিজীবী ও লেখক হিসেবেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে *আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম, আধুনিক যুগে ইসলামী বিপ্লব, ইসলামী নেতৃত্ব, বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী এবং তুরস্ক, ফাঁসির সেল থেকে দেখা বাংলাদেশ* প্রভৃতি।

২০১০ সালে জামায়াতের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সাথে কামারুজ্জামান কারাবরণ করেন। ২০১৫ সালের ১১ এপ্রিল রাত সাড়ে দশটায় তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

www.pathagar.org

প্রচ্ছদ
প্রকাশন

978-984-99232-7-5